এলবার্ট আইনস্টাইন : সঙ্গ ও নিঃসঙ্গ

সাধন দাশগুপ্ত

পরিবেশক ঃ ঈস্টার্ণ বুক এজেন্সি
২ সি, ট্যামার লেন, কলিকাতা-৯

ALBERT EINSTEIN : SANGA O NIHSANGA

এলবার্ট আইনষ্টাইনের জীবন ও কালের কথা

প্রথম প্রকাশ :1958

প্রশ্ন প্রকাশনের পক্ষে : নীহারকনা ব্যানার্জী, শ্যামনগর, ২৪ পরগনা।

মুদ্রাকর : গোবিন্দ চৌধুরী, স্যাঙ্গুইন প্রিণ্টার্স, ছিদামমুদি লেন, কলিকাতা-৬

অনুসরণী

চিত্রসূচী

(শিল্পী ঃ সমীর আইচ)

এই লেখকের বই :

বিজ্ঞানের কথকতা :

আলো আরও আলো ; রোমাঞ্চকর রসায়ন ; ভাষাগণিত

আপেক্ষিকতাবাদ :

এলবার্ট আইনস্টাইন ; সঙ্গ ও নিঃসঙ্গ ; দেশকাল ও আপেক্ষিকতা

পরমাণুবিজ্ঞান ও কণা পদার্থবিদ্যা :

এটমের সংসার (১ম পর্ব) ; এটমের সংসার (২য় পর্ব)

সনাতন বিজ্ঞানের ধারা :

ফিনিক্সের নবজন্ম ; হাতিয়ার থেকে যন্ত্র ; যন্ত্র নিয়ে, থালিসের গাধা

বিজ্ঞান ভাবনা:

এই বিজ্ঞান (যন্ত্রস্থ)

অন্যান্য লেখা:

মির্জাগালিব ; অন্যকুঠার (ডঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের সহযোগিতায়

সম্পাদিত বই :

সমুদ্রভাবনা : লেখক—ডঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়

ডক্টর সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় ডি. এস-সি.

বিংশশতাব্দীর বিজ্ঞানচিন্তার ক্ষেত্রে আইনস্টাইন একপরম বিস্ময়। বিস্ময়ের কারণ বহু। তিনি যে কয়টি প্রবন্ধ লিখলেন তারা একদিকে যেমন ছিল যুগান্তকারী, অন্যদিকে সেগুলিই বিজ্ঞানচিন্তার জগতে নবদিগন্তের পথনির্দেশ করলো। বিশ্বসৃষ্টির অপার রহস্যের সন্ধান বিজ্ঞান-সাধনার প্রধানতম লক্ষ্য। শিল্পী, দ্রষ্টা ও কবির সম্মুখে বিশ্বের অনন্ত সৌন্দর্য ও অপার সুষমা প্রতিভাত হয়—তবু তার সামগ্রিক উপলব্ধি নিরন্তর কঠিন সাধনার দ্বারাই সম্ভব; যে মনে ঐ সৌন্দর্যের ছোঁয়া লাগে, তাকে আনুষ্ঠানিক অনুশীলনের সীমার মধ্যে ধরে রাখা যায় না। হয়তো এজন্যই, বিদ্যায়তনের নিরানন্দ শিক্ষা-পদ্ধতি আইনস্টাইনের মনে সায় পায় নি।

বিশ্বজগতে যা ঘটে তার হেতু নির্দেশ করতে নিউটনীয় চিন্তাধারা সেকালীন বিজ্ঞানীদের একমাত্র হাতিয়ার ছিল। তা' সত্বেও এই পদ্ধতিটির ত্রুটি ও অসুবিধা নিয়ে বিতর্ক যে ছিল না, তা নয়;—কিন্তু সঠিক বিকল্পটি খুজে পাওয়া যাচ্ছিল না। কতগুলো প্রাথমিক স্বতঃসিদ্ধ থেকে বিকলন পদ্ধতিতে বিশ্বরহস্যের ব্যাখ্যা করাই প্রচলিত পন্থা;—কিন্তু যদৃচ্ছ স্বতঃসিদ্ধ কল্পনা করা নিরর্থক এবং অবান্তর। এই অবস্থায় সম্পূর্ণ নতুন করে চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন হয়। আইনস্টাইন বিশ্বাস করতেন যে প্রাথমিক সংজ্ঞা ও প্রত্যয়গুলির সঙ্গে মানুষের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যে থাকতেই হবে এমন কোন কারণ নেই। এই প্রত্যয় ও স্বতঃসিদ্ধান্তগুলিকে জানতে হলে বহির্জগতের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করলেই চলবে না,—চাই অন্তর্নিহিত অনুপ্রেরণার। তারই ফলে যে প্রত্যয়গুলির আবির্ভাব হবে, তাদের বাহ্য জগতের প্রকৃতির সঙ্গে তুলনা করে, অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে যাচাই করে নিতে হবে। তা হলেই প্রত্যয়গুলির যাথার্থ্য প্রমাণিত হতে পারে। আইনস্টাইন দেখলেন যে প্রকৃতির নিয়মাবলী ও তার মূল সূত্র কেবল শুদ্ধ চিন্তা পথে আবিষ্কার করা সম্ভব। নিছক চিন্তার সঙ্গে যোগ রয়েছে গণিতের সুনির্দিষ্ট রীতি ও পরিভাষার। তবুও কোন পরীক্ষালব্ধ তথ্যকে গাণিতিক সমীকরণের মধ্যে ধরে রাখাকে তিনি পছন্দ করেন নি; বরং ঘটনার পিছনে যে বাস্তবতা থাকে তাকে হৃদয়ঙ্গম করতে চাইতেন। বিমূর্ত চিন্তাপ্রসূত ফল সুকঠিন সুসংবদ্ধ পরীক্ষার নিরিখে বিচার ও প্রমাণ না করা পর্যন্ত তিনি নিরস্ত হতেন না। কালের পরিকল্পনা, দর্শক নিরপেক্ষ আলোকের অপরিবর্তিত গতিবেগ, বেগনির্ভর ভর-সংখ্যা, দেশবর্ণনায় ইউক্লিডীয় জ্যামিতির

এই কারণেই কালের পরমতত্ত্বের ধারণা ধূলিসাৎ করে পদার্থবিদ্যার নতুন দিগন্ত উৎসারিত করা আইনস্টাইনের পক্ষেই সম্ভব ছিল। দেশ-কাল ও গতি সম্পর্কে চিরাচরিত ধারণায় বিপ্লব ঘটাতে পারলেন। তবু তিনি সন্তুষ্ট নন; কারণ বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদে একটি সীমাবদ্ধতা আছে। সব গতি সম ও সরলরৈখিক। অথচ বাস্তব অভিজ্ঞতায় পাওয়া অধিকাংশ গতি অসম ও ঘূর্ণ্যমান। নিউটনীয় চিন্তায় ঘূর্ণনগতি পরম—অথচ তাঁর মতে সব গতি আপেক্ষিক। এই বিষয়ে মাকের চিন্তা আইনস্টাইনের ভাবনাকে পরিচালিত করে। দূরের নক্ষত্র কি ভাবে পৃথিবীর বস্তুকে প্রভাবিত করে—অর্থাৎ ঘূর্ণ্যমান নক্ষত্ররাজি কি ভাবে পৃথিবীর উপর কেন্দ্রাতিগ বল প্রয়োগ করে? কেন্দ্রাতিগ বল এবং মহাকর্ষ বল উভয়ে কেবল ভরের সঙ্গে সম্পর্কিত—সুতরাং তারা এক। আইনস্টাইন বললেন, ঘূর্ণ্যমান নক্ষত্ররাজির মহাকর্ষ বলই কেন্দ্রাতিগ বলরূপে প্রতিভাত হচ্ছে। কী অসাধারণ ও অব্যর্থ গভীর চিন্তা! তাঁর এই সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের ভিত্তিতে মহাজাগতিক সম্পর্কটির বিচার করে তিনি সমগ্র বিশ্বজগতের গঠন ও ইতিবৃত্ত রচনা করলেন।

ইনফেল্ড ও হোফম্যানের সঙ্গে রচিত একটি প্রবন্ধ তিনি দেখান যে সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ কেবলমাত্র মহাকর্ষতত্ত্বই প্রকাশ করে না—এতে কণার গতিও প্রকাশ পায়। নিউটনের গতি-সূত্র এবং মহাকর্ষ—দুটি পৃথক চিন্তা। এদের তিনি আপেক্ষিকতাবাদের ভিত্তিতে গড়া একটি সমীকরণে প্রকাশ করতে পারলেন; কারণ তিনি স্পিনোজার সর্বেশ্বরবাদে বিশ্বাসী!

ফিলড্-এর ধারণাকে আইনস্টাইন অনেক গভীরে নিয়ে গেলেন। ফিলডের বৈশিষ্ট্য থেকে বস্তুর বৈশিষ্ট্য বা গুণ সম্পর্কে ধারণা করা যায়। কণা হলো ফিলডের ঘণীভূত প্রকাশ যেন! দুটি ফিলড্ সমীকরণ, যথা বিদ্যুৎ-চুম্বক-তত্ত্ব এবং সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ, এই দুটিকে মিলিয়ে-মিশিয়ে একটি সুপার ফিলড্ কি হতে পারে যার ভিত্তিতে সমগ্র ভৌত অস্তিত্ব প্রকাশিত হতে পারে? এটি অতি প্রশ্ন নয়। এটি তাঁর চিন্তার রাজ্যের আধাফোটা পদ্মকলি! সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ গঠনকালে তাঁর মনে মহাকর্ষের ফলে লিফটের ধারণাটি ভেসে ওঠে—তত্ত্বগঠন সহজ হয়। একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব চিন্তার কালে অনুরূপ কোন অভিজ্ঞতা বা প্রেরণা তিনি পান নি। তবে আলোচনাকালে তিনি যে ভাবসমুদ্রে ডুব দিতেন তার বিবরণ তাঁর অন্তরঙ্গ শিষ্য ও সহকর্মীদের লেখায় পাওয়া যায়।

ইনফেল্ড ও হোফম্যানের সঙ্গে কাজ করতে করতে যখন সমাধান আর হচ্ছে না, তখন আলোচনা থামিয়ে তিনি বললেন: 'I will a little tink'; তারপর উঠে হাঁটতে হাঁটতে চুলের মধ্যে আঙুল ঘুরিয়ে চক্রাকারে চলতে লাগলেন। সহকর্মী দুজন নীরব, নিশ্চল। কিছু পরে তাঁর মুখে অন্তর্মুখী ভাব ফুটে ওঠে, দৃষ্টি দূরগত, স্বপ্নালু, পরিচিতির বন্ধন ভাঙা; অতিগভীর চিন্তার ভাব তাঁর চোখে মুখে।

হঠাৎ যেন দৃশ্যত দেহ কিঞ্চিৎ শিথিল হলো। মুখে একটুখানি হাসি, চোখ আলোয় উদ্ভাসিত। আর ঘুরছেন না, চুলও টানছেন না; যেন পুরনো পরিবেশে ফিরে এসেছেন। আরেকবার সহকর্মীদের দেখতে পেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বলে দিলেন সমাধানটি। কত সহজ সেই সমাধান—সহকর্মীরা ভাবেন, কেন তারা খুঁজে পেলেন না উত্তর!

ফিলিপ ফ্রাঙ্ককে একদা তিনি বলেছিলেন, 'যে কাজ আমি করি সে তো যে কোন জায়গায় করা যায়! আমার সমস্যার সমাধান চিন্তায় পটসডাম ব্রিজ বা বাড়ীর আরাম কোন ব্যাপারই নয়।' আর অন্য আরেকবার বললেন, 'চরমতম অভিজ্ঞতা আমরা পাই রহস্যের রোমাঞ্চনায়। সার্থক শিল্প ও সার্থক বিজ্ঞানচেতনার ভিত্তিতে রয়েছে এরই মৌলিক অনুভূতিটুকু। যে এটি জানে না, এতে বিস্ময় মানে না, অভিভূত হতে পারে না সে তো মৃত। তার চোখ দৃশ্যত অন্ধ।' সার্থক জ্ঞানের পারাবারে তাঁর বিচরণ—সেখানে তাঁর সাথী তাঁর বোধি, তাঁর মনন, তাঁর চেতনা। আরেকবার তিনি বললেন, 'যদি আমরা অধিকাংশই ছেঁড়া পোশাক আর ভাঙা আসবাব পত্রের জন্য লজ্জা পাই, তবে সংকীর্ণ আইডিয়া বা পঙ্গু দর্শন-চিন্তার জন্য আমাদের আরো লজ্জিত হওয়া উচিত।' নিজ তিনি অগোছাল পোশাক পরে অতি সামান্য আসবাবপত্র নিয়ে কাজ করেছেন—তাঁর চিন্তাতে কিন্তু বিশৃংখলা নেই। নেই উপলব্ধি-দর্শনে পঙ্গুতা।

ফিলিপ ফ্রাংককে আরেকবার বললেন, 'ধর্মের পরিমিতিতে আছে একটি বিশ্বাস—অস্তিত্বময় জগতে যে নিয়মগুলি প্রতিষ্ঠিত তারা যুক্তিসহ; অন্তত যুক্তি দিয়ে এদের বোঝা যায়। এই বিশ্বাস নেই এমন কোন একজন খাঁটি বিজ্ঞানীর কথা আমি ভাবতে পারি না। এই বোধটিকে একটি প্রতীকে বোঝান যেতে পারে—ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান যদি হয় পঙ্গু, তবে বিজ্ঞান চেতনাহীন ধর্ম—সে অন্ধ।' তাঁর এই বিশ্বাসের ফলে পুরনো ভঙ্গুর মানব মূল্যবোধগুলি নতুন সাজে সেজে দাঁড়ায়। আর তাঁর একমাত্র বাসনা—পরম সত্যটিকে জানতে। কোন প্রলোভন, কোন বাধা তাঁকে এই খোঁজা থেকে নিবৃত্ত করতে পারেনি। উপনিষদের বালক নচিকেতার মত মৃত্যুর কাছে তিনি একটি প্রার্থনা রেখেছিলেন, একটি বর চিয়েছিলেন, পরম সত্যকে জানতে দাও! নান্যং তস্মান্নচিকেতা বৃণীতে—এছাড়া নচিকেতার কোন প্রার্থনা নেই। আইনস্টাইনেরও ছিল না। পার্থিব সম্পদ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতি এইসব বহির্বিশ্বের কামনা-বাসনা তাঁর জীবনের তীব্র অনুভূতির চাপে স্তিমিত হয়ে থাকে। মনঃসংযোগ ও সংযমের কঠিনতায় গড়ে ওঠা নৈর্ব্যক্তিক ভাব জিজ্ঞাসাব প্রশ্নচিহ্নের সামনে শিশু ভোলানাথের মধুর বিস্ময় নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

বিজ্ঞানের সাধনার ক্ষেত্রে তাঁকে মনে হয়েছে নিরাসক্ত। এই আসক্তিহীনতা তাঁকে শুষ্ক সন্ন্যাসী হতে দেয়নি, কারণ তাঁর মনের গঠন, তাঁর সৌন্দর্যপিপাসা।

উপনিষদে ব্রহ্মকে বলা হয়েছে, তিনি আনন্দ, তিনি সরস, তিনি কবি। তাঁর নিজস্ব বিজ্ঞানের সত্যের সন্ধানে তিনি সৌন্দর্যরসিক ; কারণ সত্য শুধু অদ্বৈত নয় তাঁর সত্য মঙ্গলময় শিব, সে সুন্দর। কবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনাকালে সেই সর্বব্যাপী এবং মঙ্গলময় সুন্দর-সুকুমার সত্যের কথা বললেন। এই কারণে তিনি মানবতাবাদী, শান্তিবাদী। এখানেও তিনি সৌন্দর্যপিয়াসী।

হিটলারের অভ্যুত্থানে মানব মূল্যবোধের ধ্বংসের সূচনা দেখলেন। আবার মহাযুদ্ধের কালে এবং পরে দেখা গেল চিরায়ত, লোকায়ত মানব মূল্যবোধের অবক্ষয় ; এর জন্য দায়ী বিজ্ঞানের প্রয়োগবিদ্যা, প্রচলিত ধারণাকে বিজ্ঞানের ভেঙ্গে ফেলা—এই তাঁর বিশ্বাস। লোকায়ত বিশ্বাসকে প্রচলিত ধর্ম লোকোত্তরে উত্তীর্ণ করতে পারছে না—কেননা সেখানে নেই মহান চিন্তার মুখরতা; সমানত্বের সাধনা।

চিন্তার এই দিশেহারা কালে ১৯৩৪ সালে তিনি বললেন, 'অহংবোধের মুক্তির চেতনা ও পরিমাণের উপর মুখ্যত মানব মূল্যায়ন স্থির হয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস পৃথিবীর সব সম্পদ উৎসর্গিত-প্রাণ কর্মীদের হাতে এলেও মানব জাতির অগ্রগতি ঘটে না। একমাত্র বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র মহাপুরুষরা আমাদের সৎচিন্তা ও সৎকর্মের পথে নিয়ে যেতে পারে। অর্থ শুধু স্বার্থ সিদ্ধির উপায়, শুধু দুর্দম অপব্যবহারের পথ দেখায়। মুসা যিশু অথবা গান্ধী যে কার্নেগীর টাকার থলি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন একথা কি কল্পনা করা যায়?' তাঁর চিন্তার আড়ালে আছে মৈত্রেয়ীর উক্তি—'যাতে আমি অমৃতা হব না, তা নিয়ে আমি কি করব?' আর আছে মহাভারতীয় ঘোষণা—মহাজনদের পথই পথ। এই মহাজনরা নিঃস্বার্থপর, চিন্তাবিদ, যুক্তিবান; এঁরা স্বতন্ত্র, বিশিষ্ট এঁরা সত্যদ্রষ্টা অথবা সত্যান্বেষী। বিজ্ঞানের সত্যের পথযাত্রীরা সেই মহতোমহীয়ান পথের সূচনার ইঙ্গিত জানতে পারে। এঁরাই সত্যকাম-ব্রাহ্মণ। এঁদের হাতে উপনিষদের নব ব্যাখ্যা গড়ে উঠবে, মানব জাতির নবমূল্যায়ন স্থিরীকৃত হবে। বিজ্ঞানীদের দায়িত্ব অনেক, এই তাঁর বিশ্বাস, তাঁর প্রত্যয়। কারণ বিজ্ঞানই ধর্মের পরিপূরক—যা সমাজকে ধারণ করে তার সহযোগী।

অতীত ভারতের চিন্তাজগতে এ জাতীয় দৃষ্টান্ত বিরল নয়। পাশ্চাত্যের কঠিন যুক্তিনিষ্ঠ বিজ্ঞানশিক্ষার প্রভাবে আমরা সেই ঐতিহ্য ভুলে গেছি। আমাদের মূল্যবোধ আজ অন্য ধরনের। বিজ্ঞানের যে-দিকটি আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দেয় সেখানে নেই আইনস্টাইনের উপনিষদের মর্মবাণীর সিক্তধারা। এটি না জানলে বোধ হয় চিরকালের জন্য আমরা ঘানিকলেই ঘুরব।

যোদপুর পার্ক
কলিকাতা

সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়

উনিশ শতকের শেষভাগে হার্মান আইনস্টাইন তাঁর শিশুপুত্রের ভবিষ্যৎ স্থির করতে স্কুলে হাজির হলেন ; কোন্ পেশাতে ছেলে এলবার্ট উপযুক্ত হবে ? মাস্টার বললেন, এলবার্ট ? যে পেশাই নিক না কেন কোন তফাত হবে না—কোথাও সফল হবে না সে।

আরও কিছুদিন পরে ১৮৯৪ সালে লুইটপোল্ড জিমনাসিয়ামের ছাত্র এলবার্টের জীবনে একটা ঘটনা ঘটে। বাবা, মা আর ছোট বোন বেড়াতে গেছেন আলপস্ পাহাড়ের ওপারে, ইটালিতে। ছেলের মিউনিকে থাকার এবং পরীক্ষা দেবার ঘোরতর অনিচ্ছা। এলবার্ট ডাক্তারের সার্টিফিকেট জোগাড় করলেন—তার নার্ভাস ব্রেকডাউন, বিশ্রামের দরকার, দরকার স্থান পরিবর্তনের। এ ছাড়াও এলবার্ট পেশ করলেন, আরেকটি সার্টিফিকেট ; তাঁর অঙ্কের মাস্টার মশাই লিখে জানালেন, ছেলেটি অঙ্কে ভাল, পরীক্ষা দিলে পাস করবে। সার্টিফিকেট দাখিল করতে না করতে স্কুলের কর্তৃপক্ষের কঠিন হাত এলবার্টের আশা চূর্ণ করে। অমনোযোগিতা, অনিয়মানু-বর্তিতা আর সহছাত্রদের উপর তার উপস্থিতির বিষময় ফলের কথা ভেবে, এলবার্ট কৈশোরে, পনের বছর বয়সে, স্কুলের এক্সপেল করা ছাত্র হলেন। অবাধ্য, এঁচোড়পাকা, হামবড়াই, সবজান্তা ছেলের জায়গা মিউনিকের জিমনাসিয়াম নয়—অঙ্কে সে যত ভালো হোক না কেন, অন্য বিষয়ে কাঁচা, পড়ার ইচ্ছে নেই। আছে তর্ক করার প্রবৃত্তি।

১৯০০ সাল। সুইজারল্যানডের বিদ্যাপীঠ (সুইস ফেডারেল পলিটেকনিক স্কুল) থেকে স্নাতক হয়ে বেরিয়ে এলেন এলবার্ট আইনস্টাইন। পূর্ণ সংখ্যা ৬·০০ এর মধ্যে পেলেন ৪·৯১ নম্বর, গড়পড়তা প্রায় ৮২% ভাগ। ফিজিক্স-এর প্রফেসর ওয়েবারের সঙ্গে তাঁর বনিবনা পাঠজীবনে হলো না। মাস্টার মশাইকে হের প্রফেসর না ডেকে এলবার্ট ছাত্র-জীবনে ডেকে এলেন হের ওয়েবার। ডাকটা প্রফেসরের কাছে সুখকর ঠেকেনি। এলবার্ট বুদ্ধিমান, চালাক, তবু তাঁর একটা দোষ, মারাত্মক দোষ, কেউ তাঁকে কিছু জানাতে বলতে পারবে না। সে সবজান্তা। সবজান্তা ছেলেটি গ্রেজুয়েট হয়ে বেরিয়ে এলেও E T H তে কোন পদে নিয়োগ পেল না। প্রফেসর ওয়েবার তাঁর সহকারী হিসেবে সে বছর দু জন মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়ার নিলেন, তবু নিলেন না পদার্থবিদ্যার ছাত্র এলবার্ট আইনস্টাইনকে। দুষ্টু গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল।

১৯১১ সাল। প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হয়ে এলবার্ট আইনস্টাইন এলেন ; তাঁর

আত্মকেন্দ্রী আচরণ, অসামাজিকতা, অন্যমনস্কতা আর সবার উপর সাধারণ মানব অনুভূতি দুঃখ সুখ শোক বেদনায় নিস্পৃহতা তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহজ সরল চিরাচরিত ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখল। চারপাশের মানুষ সম্পর্কে নিস্পৃহ অবহেলা, চারপাশের ঘটনায় দূরত্ব, এক চিন্তা, এক ধারণায় মগ্ন থেকে যন্ত্রের মতো তাঁর পদচারণ – সে যেন এক উপন্যাসের বিষয়। যে নায়ক সমাজে থেকেও বিচ্ছিন্ন, সত্যের অন্বেষণে যে অনুভূতির শিহরন বিসর্জন দিয়ে যন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছেন। ম্যাকস্ ব্রড (Max Brod) একটি উপন্যাস লিখলেন The Redemption of Tycho Brahe। ব্রাহে তাঁর শিষ্য কেপলারের বিজ্ঞানের জগতে উত্তরণ দেখেন, বিস্মিত হয়ে দেখেন তাঁর সংসারে নিস্পৃহতা, আর অন্বেষণের জন্য কঠোর সাধনা। ওয়াল্টার নার্ন্স্ট (Welter Nernst) বইটি পড়ে আইনস্টাইনকে বলেন, "এই কেপলার তুমি।"—যে দুঃখে শোকে অনুদ্বিগ্নমনা, বিগতস্পৃহ, সমাজ সংসার সম্পর্কে নিস্পৃহ, বিচেতন অথচ একমনা, সত্যান্বেষী, দুরূহ পথের সাধক।

১৯১৭ সাল। সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্ব প্রকাশের দু বছর পরের ঘটনা, মহাকর্ষ আর জাড্য বা Inertia-র সমন্বয় আইনস্টাইন করেছেন, করেছেন মহাকাশে ত্বরণ বা Acceleration এবং মহাকর্ষের সাদৃশ্য ঘোষণা। আলোর রূপে কণা আকৃতি আর তরঙ্গভঙ্গিমার দ্বৈতসত্তার উপস্থাপনা, সেও তিনি করেছেন। তেজস্ক্রিয়তার ক্ষয়ের কারণ জানতে গিয়ে আইনস্টাইন বিকিরণের আরেক ধারার কথা বললেন ; বললেন, Stimulated emission বা প্ররোচিত নির্গমনের দিক নির্দেশিত এবং এই নির্দেশনা আকস্মিকতা বা "chance"-এর উপর নির্ভরশীল। তত্ত্বের সেকালীন ধারণায় "চান্স"-কে মেনে নিতে হবে। আইনস্টাইন অত্যন্ত অনিচ্ছায় তার তত্ত্বে "চান্স" শব্দটি ব্যবহার করলেন। তবে এটিকে রাখলেন ইনভার্টেড কমার ভিতরে। সৃষ্টির রাজ্যে আকস্মিকতা থাকবে না এই তাঁর ধারণা। কার্যকারণবাদের নিয়মস্বরূপ তার জগতে আকস্মিকতার স্বাধীনতা তিনি মেনে নিয়েছিলেন সাময়িকভাবে, তবে নিয়মের জগতে এই স্বাধীনতা অন্য কোন নিয়মের বহিঃপ্রকাশ – সেই নিয়ম প্রাথমিক এবং চিরস্থায়ী।

১৯২০ সাল। বার্লিনের কাইজার ভিলহেলম ইনস্টিট্যুটের (Kaiser Wilhelm Institute) ফিজিক্সের প্রফেসার এলবার্ট আইনস্টাইন—যাঁর পোশাক-পরিচ্ছদে ক্রিজ নেই, পায়ে নেই মোজা। ডিনারের নিমন্ত্রণে যোগ দিতে যার প্রচণ্ড অনীহা ; বলেন, ডিনার নয়, এ হলো ট্র্যাপিজের খেলা অথবা জু-তে খাবার দেবার সময়। ডিনার স্যুটের টেল-এ যার আপত্তি। "টেল, টেল কেন ? জন্ম থেকেই তো আমার কোন ল্যাজ বা টেল নেই ; কই, নেই বলে তো কোন কিছু হারাচ্ছি না।" একটা ডিনার জ্যাকেট আলমারিতে রেখে দেন। জিজ্ঞেস করলে বলেন, "আছে, আছে, ডিনার জ্যাকেট আছে। যত্ন করে আলমারিতে তুলে রেখেছি। দেখবে ?"—পোশাকের পারিপাট্য, ভদ্রতার খোলস, প্রোটোকল—সময়ের কি অপব্যবহার। কাজ, সত্যকে খোঁজা, সেই কাজ একমাত্র ধ্যান ধারণা। চারপাশের জগৎ

সম্বন্ধে যাঁর শিশুর মতো কৌতূহল। যে ভোলানাথ, স্বল্পে সন্তুষ্ট, খুশিতে উদ্বেল, হাসিতে উচ্ছল, আবার চিন্তায় ধ্যানে স্থাণু। তাঁর মেজাজ, খেয়াল, যা Idiosyncracy-র নামান্তর, সে তাঁকেই মানায়—সেই তাঁর বৈশিষ্ট্য। বিজ্ঞানী লরেন্স বলতেন, "আইনস্টাইনের সব কিছু মেনে নেয়া যায়। তাঁর ভুল ভ্রান্তি, চটজলদি জবাব, তার দুষ্টুমি নষ্টামি, তার শিশুসুলভ ব্যবহার, সবই তাঁর ন্যস্ত অধিকার —আইনস্টাইন হলেন আইনস্টাইন।"

১৯২৭ সাল, পঞ্চম সলভে কংগ্রেসে কণাতরঙ্গবাদ, বোরের সম্পূরকতত্ত্ব আর হাইসেনবার্গের অনিশ্চয়তাতত্ত্বের উপর আলোচনা। সব কটি তত্ত্বের বীজ আইনস্টাইনের প্রকাশিত তত্ত্বে নিহিত ; তবু আইনস্টাইন অনিশ্চয়তাতত্ত্বকে স্বীকার করতে পারেন না। সাব-এটমিক জগতে অনিশ্চয়তার বোধ থাকছে,—বোঝা যায় না এটমের উপকরণ কণা না তরঙ্গ, একটিকে জানতে গেলে আরেকটি অনিশ্চিত হবে ; এই দ্বৈত ধারণা মেনে নেওয়া হবে সাময়িকভাবে, এটি সত্য নয়। যে সাংখ্যায়নিক স্ট্যাটিসটিকেল গণিতের প্রয়োগ করে আইনস্টাইন কোয়ানটাম তত্ত্বের ভিত তৈরি করেছিলেন সেটি পূর্ণ জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ রূপ পাবে। আরো তথ্য আরো ধারণা, নিয়মকে প্রতিষ্ঠা করবে। সৃষ্টির রাজ্যে বেনিয়ম নেই। থাকতে পারে না—যাকে অনিশ্চয়তা ভাবা যাবে, ঘটনার কার্যকারণের সেই স্বাধীনতা কোন নিয়মের প্রকাশ মাত্র। অনিশ্চয়তা নিয়ম নয়। ফিলিপ ফ্রাঙ্ক বললেন, অনিশ্চয়তা সংশয়ের রীতিনীতির বীজ তার নিজের তত্ত্বের ক্ষেত্রেই উপ্ত।—তিনি সেই অনিশ্চয়তার প্রবক্তা, তিনিই বপ্তা। আইনস্টাইন বললেন, "ঠিক, আমি এটির সূচনা করেছি। তবু, আমার ধারণায় ছিল এটি সাময়িক। অন্যেরা যে আমার চেয়েও সিরিয়াসলি এটিকে এত গুরুত্ব দেবে আমি কখনো তা ভাবিনি।" ম্যাকস্ বোর্নকে চিঠিতে লিখলেন, কোয়ানটাম তত্ত্বের সম্ভাবনা প্রচুর, তবু তার বিশ্বাস "ভগবান পাশার দান ফেলছেন না" (God did not throw dice)। আইনস্টাইনের এই পাশার দানের উপমা পরবর্তীকালে প্রচলিত হলো—ভগবান এই জগৎকে নিয়ে পাশা খেলছেন না (God does not play dice with the world)। দানের অনিশ্চয়তা তিনি মানতে পারেন না—তার ধারণা বিশ্বের মূলনীতিতে পাশার দানের ফলাফল মহাভারতের শকুনির মতো চালের আগেই ঘোষণা করা যাবে। অনিশ্চয়তা-জয়ের পূর্বাভাষ মৌলিক নিয়মে জানা যাবে—জয়-পরাজয় তখন অনিশ্চয় নয়। এই তাঁর প্রত্যয়, তাঁর Conviction, তাঁর ধর্ম।

১৯৩৩ সালে ইংল্যানডে আইনস্টাইন এলেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে দিলেন হার্বার্টস্পেনসার লেকচার ও ডিনেক লেকচার। অক্সফোর্ড থেকে রওনা হলেন গ্লাসগোর পথে—প্রথম জর্জ গিবসন লেকচার দেবার জন্য আমন্ত্রিত হয়ে। যেমন চিরকাল ঘটে থাকে, আইনস্টাইন হঠাৎ অসময়ে স্টেশনে হাজির হয়ে এক বিরাট ভিড়ের মধ্যে পড়ে দিশেহারা। সেই ভিড় সিনেমার নায়িকা থেলমা টডের অভ্যর্থনার জন্য হাজির।

দিশেহারা, অসহায় আইনস্টাইনকে চিনতে পেরে স্থানীয় কাগজের প্রতিনিধি উদ্ধার করে নিয়ে গেলেন। আইনস্টাইনকে সেদিন চেনা গেল না ভিড়ে, জনতার মধ্যে। গর্বিণী মিস টড পরে রিপোর্টারদের বললেন, "আগে জানলে, আমার ভিড়ের খানিকটা আইনস্টাইনকে ধার দিতুম।" নির্বিকার, নির্বিকল্প এলবার্ট আইনস্টাইন ভিড় পাশ কাটিয়ে সেদিন সন্ধেবেলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বুট (Bute) হলে একটি ছোট সমঝদার মজলিসে ইংরেজীতে ভাষণ দিলেন। শ্রোতারা তত্ত্বের মনোহারিতে, উপস্থাপনার কারুকার্যে চমৎকৃত মন্ত্রমুগ্ধ হলেন। মিস টডের জনতার উচ্ছ্বাস কালস্রোতে ভেসে গেল।

১৯৪৩ সাল। কোপারনিকাসের মৃত্যুর চতুর্শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন হলো আমেরিকার যুক্তরাজ্যের কার্নেগী হলে। বিদ্রোহী বিজ্ঞানী কোপারনিকাসের স্মৃতিতে বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রিত হলেন সে যুগের প্রখ্যাত আমেরিকাবাসী বিজ্ঞান প্রযুক্তিবিদ্যার বিপ্লবীরা। এলেন হেনরি ফোর্ড, হেলিকপটারের ডিজাইনার ইগর সিকোরস্কি, প্রাণবিজ্ঞানী মর্গন আর এলবার্ট আইনস্টাইন। ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে আইনস্টাইন সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন, তাঁর ভাষণ শেষে শ্রোতারা করতালি আর হর্ষধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠলেন। সামান্য বক্তৃতার অসামান্য সাফল্যে অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের একজন হার্লো শেপলি (Harlo Shapley) শ্রোতাদের তাঁদের উচ্ছ্বাসের কারণটা জানাতে বললেন। তাঁরা বললেন, "কি জানেন আইনস্টাইনের তত্ত্বের মাথামুণ্ডু কোনদিন বুঝিনি। আর আজ স্বয়ং রিলেটিভিটি, আপেক্ষিকতাবাদ ভাষণ দিলেন ; তাঁকে এবং তাঁর বক্তৃতাকেও বুঝতে পারলাম না...তবু...!"

আইনস্টাইন অবোধ্য অথচ প্রতিষ্ঠিত সম্মানিত এবং তাঁকে জানা বোঝা ফেশনেবল। আইনস্টাইন একটি উপকথা যেন। এলবার্ট আইনস্টাইনের জীবনে চরিত্রে তাঁর বিজ্ঞান সাধনায় উপকথার বৈশিষ্ট্য। রবার্ট ওপেনহাইমার আইনস্টাইনের সম্পর্কে এ কথাই বললেন—"উপকথার একটা আকর্ষণ থাকে ; কিন্তু সত্য তার চেয়ে অনেক সুন্দর।" উপকথার নায়ক আইনস্টাইনের সত্যসাধনায়, অন্বেষণায় পথের ঠিকানা অনেক গলিঘুঁজি ভরা। পথ সহজ নয়। সরল তো নয়ই। খোঁজার পথের জটিলতায় সত্যকে জানা বুঝি যায় না—মানুষ দিশেহারা হয় ; তার চেয়ে সহজ অন্বিষ্ট মানুষটিকে উপকথার নায়ক করে নেওয়া—সে তখন মহান মহত্তর, গালগল্পের নায়ক, একজন মহাপুরুষ, দেবপদবাচ্য। এলবার্ট আইনস্টাইনের জীবনতৃষ্ণায়, সত্যের অন্বেষণে পথ খোঁজার জটিলতা, বৈপরীত্যেভরা ; পিতৃপুরুষের ঐতিহ্যে এবং জন্মসূত্রে জার্মান এলবার্ট সব কিছুই জার্মানের বিরুদ্ধে ; পনের বছর বয়সে জার্মান নাগরিকত্ব ত্যাগ করে সুইজারল্যান্ডের নাগরিকত্ব নিলেন। আবার, সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের গঠনের জন্য বার্লিনের অধ্যাপক পদ নিয়ে হাজির হলেন ; সেখানকার বিজ্ঞানীদের পরিমণ্ডল তাঁর চিন্তাকে শাণিত করবে, তাঁকে স্থিতধী হতে সাহায্য করবে—এনে দেবে সাংসারিক ও মানসিক

স্থৈর্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মান নাগরিকত্ব আবার তিনি গ্রহণ করলেন আর হিটলারের আবির্ভাবের পর সেই নাগরিকত্ব ত্যাগ করেন। মনেপ্রাণে ইউরোপীয় আইনস্টাইন, আমেরিকার সাধারণ জনজীবনকে পছন্দ করেননি, অথচ শেষ জীবনে তিনি আমেরিকার নাগরিক। জন্মে ইহুদি এবং ধর্মে অবিশ্বাসী ; অথচ জিনোয়িজম, ইহুদি জাতিত্বে বিশ্বাসী। তাঁর ইহুদি জাতীয়তাবাদ তাঁর নিজস্ব—বিশ্বমানবতার অংশ। অথচ শেষ জীবনে ইহুদি-আরবের সংঘর্ষ যে এড়ানো যাবে না তা তিনি বুঝলেন ; ইহুদিদের টিঁকে থাকতে হবে—সংগ্রাম করে, যুদ্ধ করে, অস্ত্র নিয়ে লড়াই করে। প্রচণ্ড শান্তিবাদী আইনস্টাইন হিটলারের অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে ইংলনড্ ফ্রান্সকে রণসজ্জায় সাজতে বললেন। রুজভেল্টকে চিঠি লিখলেন পারমাণবিক বোমা তৈরির জন্য সচেষ্ট হতে। যুদ্ধকে ভীষণ থেকে ভীষণতম করে তোলার পথ জানালেন এই শান্তিবাদী। বিজ্ঞানে পরম সত্যের পরিবর্তে আনলেন আপেক্ষিক সত্য ; প্রতিষ্ঠা করলেন উপলব্ধিকে, স্বীকার করলেন এই জগতে আছে আকস্মিকতা ; অনিশ্চয়তার বিরুদ্ধে জেহাদ করে গেলেন—বিশ্বসংসারের চরম বিশৃঙ্খলার মধ্যে খুঁজতে চাইলেন পরম শৃঙ্খলাকে। যে ঈশ্বর জীবনের বা মৃত্যুর ভয় থেকে সৃষ্টি, যে ঈশ্বর অন্ধ বিশ্বাসে গড়া, সে ঈশ্বর তিনি চাননি। "একান্ত বা ব্যক্তিগত ঈশ্বর যে নেই সেই প্রমাণ আমি দিতে পারব না—কিন্তু এ সম্বন্ধে যদি কথা বলতে হয়, তবে সে আমার মিথ্যে কথা বলা।" "মানুষের সৌভ্রাতৃত্বে, বিশ্বভ্রাতৃত্বে আর ব্যষ্টির অনন্যতায় আমার বিশ্বাস তবু এই বিশ্বাসের প্রমাণ আমি দিতে পারিনে। আমি জানি এরা সত্য, তবু সারা জীবন চেষ্টা করেও তুমি এদের প্রমাণিত করতে পারবে না। যা দেখা যায় তাকে প্রমাণ করা যাবে,—মনের গতি সে পর্যন্ত নির্বাধ। তার পরেও থাকে মনের অগ্রগতি যা জ্ঞানরাজ্যের উচ্চ স্তরে নিয়ে যায়—সেখানে প্রমাণ স্তব্ধ।" "মানুষের অস্তিত্বের অনুষঙ্গে আছে কৌতূহল। অসীমত্বের রহস্য, জীবন ও বাস্তবের মনোহারিত্ব যখন ভাবা যায়, তখন তার বিশালতায় অবাক নির্বাক হয়ে দাঁড়ান ছাড়া আর কী বাকি থাকে ? প্রতিদিন যদি এই রহস্যের কিছুটা বোঝার চেষ্টা করা যায় সেই তো যথেষ্ট। এই বিশুদ্ধ কৌতূহলের নিবৃত্তি কেন চাইব।"

এই কৌতূহলের আকর্ষণে, বিশ্বের রহস্যের উদ্‌ঘাটনে তাঁর যাত্রা। সেখানে চেনা-অচেনার দ্বন্দ্ব ; জানা অজানার হাতছানি। মেনে নেওয়া বা না মেনে নেওয়া এরই বাছ-বিচার। "ঈশ্বর আছে কিনা আছে, জানি না। জানতে চাই না কি ভাবে এ জগৎ সৃষ্টি; বর্ণালীর গুপ্ত রহস্য বা আর কিছু। যা জানতে চাই তা তার সৃষ্টির প্রাথমিক চিন্তা ; বাকি সবই ডিটেলস্।"

জীবনের শেষভাগে, বিজ্ঞান, শান্তিবাদ বা মানবতাবাদের যে ঐতিহ্যের তিনি ধারক ছিলেন, সেই ঐতিহ্য তাকে হতাশ করেছিল। ওপেনহাইমার বললেন, "এই ব্যর্থতায় তাঁর অধিকার ছিল।" আইনস্টাইনের সৃষ্টিকালের মধ্যাহ্নে তাঁর আচার-আচরণে

কথাবার্তায় পাগলামো অসঙ্গতি দেখে বিজ্ঞানী লরেন্স বলেছিলেন, "সব কিছু আইন-স্টাইনকে মানায়।" অসঙ্গতি তাঁর জীবনে, চরিত্রে, বিজ্ঞানচর্চায়, শান্তিবাদের প্রচারে; তবু অসঙ্গতির মূল কারণ তাঁর সমন্বয় বোধ, অখণ্ড তত্ত্বের ধারণা। নিরবচ্ছিন্নতাবোধ আর কার্যকরণ সম্পর্ক বিজ্ঞানে তিনি ভাঙলেন, অথচ এগুলি ত্যাগ করা তার পছন্দ নয়। "এদের পরিবেশেই তিনি বড় হয়ে উঠেছেন। এদের তিনি রক্ষা করলেন, প্রভূত পরিমাণে বাড়িয়ে তুললেন। আবার এদের আততায়ীদের হাতে তিনি অস্ত্র জুগিয়ে দিয়েছিলেন, তবু এগুলিকে নষ্ট হতে দেখা তাঁর কাছে বড় দুঃখের, বড়ই কঠিন কঠোর সেই ব্যাপার।" (ওপেনহাইমার)

সত্যের এই খণ্ডিত অনিশ্চয় রূপ তাঁর কাছে বড় বেদনার। নিজের বিশ্বাসের কথা একটি সংহত লাইনে বললেন, "ঈশ্বর (বা প্রকৃতি) জানি সূক্ষ্ম, তবে তিনি বিদ্বেষ-পরায়ণ নন।" নিজের কথা বলতে গিয়ে আইনস্টাইন একদা বললেন, "মধুর বা তিক্ততা এসব বাইরের; কঠিনের আবির্ভাব ভিতর থেকে; মানুষের কাজই এই কঠিনের স্রষ্টা। আমার স্বভাব আমাকে যে কাজ করতে প্রবৃত্ত করে সেই সব কাজই আমি প্রধানত করে থাকি। তার জন্য এত শ্রদ্ধা আর ভালবাসা কেন যে পাই, বড় বিব্রত বোধ করি আমি! আমার দিকে ঘৃণার বাণও অবশ্য ছোঁড়া হয়েছে, তাকে আমি আঘাত হানিনি। কি জানি কেন মনে হয় ওসব অচেনা এক রাজ্যের জিনিস, আমার সঙ্গে যার কোন সম্বন্ধ নেই। আমি এক নিঃসঙ্গতার রাজ্যে বাস করি। এই নৈঃসঙ্গ্য যৌবনে বড়ই কষ্টের, কিন্তু পরিণত বয়সে বড়ই মধুর।"

তাঁর এই মানসিক একাকিত্বের কথা বললেন ম্যাকস্ বোর্ন, ওপেনহাইমার, রাইন-ফেল্ড। অথচ জীবনের শেষভাগে তিনি মানুষের বিবেক হয়ে দাঁড়িয়েছেন, হয়েছেন বিশ-শতাব্দীর উপদেশক (Ecclesiastes)। অন্যদিকে সক্রেটিসের মৃত্যুর ২৫০০ বছর পরে একমাত্র মানুষ তিনি যিনি বলতে পারতেন, আমি জানি যে আমি কিছুই জানি না। আর বললেন, "যে নিজের আর তার সমগোত্রীয় প্রাণীদের জীবন অর্থহীন মনে করে, সে যে দুর্ভাগা তা নয়, সে বেঁচে থাকার অযোগ্য।"

নিঃসঙ্গ লোকটি সকলের জীবনের অনুভূতি পেতে চেয়েছিল, চেয়েছিল মহাবিশ্বের সব অনুভূতির নিয়মটিকে জানতে।

ওপেনহাইমার বললেন, "যে রহস্যময় উপকথার মেঘমালার আড়ালে সেই বিরাট মহিমময় পর্বতশিখর ঢাকা, তাকে অপসারণ করে গিরিচূড়ার দর্শন লাভ করা দরকার। আমার বিশ্বাস রহস্যের যবনিকা অপসারণের এই প্রয়াস আদৌ ত্বরিত হয়নি। আমাদের যুগের পক্ষে সম্ভবত অতি বিলম্বিত হলো এই প্রচেষ্টা।"

সত্যকে যে বিজ্ঞানী খুঁজেছিলেন তিনিও উপকথার গল্পগাথার কুহেলীতে ঘেরা। ওপেনহাইমার বললেন, অপবৃণু—আবরণ মুক্ত কর।

সময়কালের মাত্রায় সে আবরণ ঢাকা—তার উন্মোচন সেও সময়ের হাতে। সেখানে আইনস্টাইনের বিজ্ঞানের তত্ত্বের মূল্যবিচারে হয়তো বা অসঙ্গতি ধরা পড়ে।

আইনস্টাইনের তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা হয়েছে, হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। তাঁর আপেক্ষিকতাবাদের স্বয়ংসম্পূর্ণতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হতে পারে। তবু এই তত্ত্বের মৌলিকত্বটি নতুন আবিষ্কারের জ্যোতিতেও ভাস্বর, তর্করহিত। একালের শক্তি ও মেটারের নতুন দিগন্ত আইনস্টাইনের জীবিতকালে প্রকাশিত হয়নি। কোয়ার্ক, কোয়াসার, পালসার বা ব্লেকহোল—এইসব অতি আধুনিক তত্ত্ব জানা থাকলে হয়তো বা তিনি একীভূতক্ষেত্রতত্ত্ব নিয়ে নতুন উদ্যমে কাজে লাগতেন। 'বিধাতা যাঁদের আলাদা করে রেখেছেন, তাঁদের একত্রীভূত করা মানুষের অসাধ্য'—উলফগাংগ পাউলির এই ঘোষণা আজ আর বিশ্বাস নয়। আধুনিক মানুষ মনে করে পারমাণবিক জগৎ আর মহাবিশ্ব-লোকের কার্যকারণ সম্বন্ধ আছে। আইনস্টাইনের বাক্য উদ্ধৃতি দিয়ে বিজ্ঞানীরা বলেন, জানার পরিধি এখনো ফাঁক-ফোকরে ভরা। একদিন সব শূন্য ভরাট হবে। দুটি ভিন্ন জানালা দিয়ে দুটি জগৎকে জানতে হবে, দেখতে হবে, এটিতে অসঙ্গতি আছে। কাজ দিয়ে এই শূন্যটিকে পূর্ণ করতে হবে, অসঙ্গতিটির সুষমা আনতে হবে।

কাজটি তিনি চিনেছিলেন, তাকেই দোসর মেনেছিলেন। বলেছিলেন, "ব্যক্তিসত্তার উপর প্রশংসার নষ্টামি মুছে ফেলা যায় একটিমাত্র পথে—সেটি কাজের পথ।... শুনতে ভাল লাগে, হয়তো লোভও জেগে ওঠে, তবু প্রশংসাকে এড়িয়ে কাজে মগ্ন হতে হবে। কাজ—এছাড়া কিছু নেই।"

১৯৩৫ সালে প্রিন্সটনে একটি পুরোনো বাড়ি কিনেছিলেন। নিজের ও এলসার রুচিমত কিছু অদল-বদল করা এই ১১২ নম্বর মেরসার স্ট্রিটের বাড়িটিতে জীবনের শেষ বিশ বছর কাটালেন। এই বাড়িটি তাঁর সন্ধ্যার নীড়। বাড়িটি এখনো আছে ; আইনস্টাইনের স্মৃতি নিয়ে দেড় শ বছরের পুরোনো বাড়িটি কোলাহলের কলরোল থেকে দূরে শব্দহীন দাঁড়িয়ে আছে। আর আছেন বাড়িতে দুটি প্রায় অশীতিবর্ষীয়া বৃদ্ধা, তাঁর সৎ মেয়ে মার্গট এবং তাঁর সেক্রেটারি হেলেন ডুকাস। মিস ডুকাস এখনো আইনস্টাইনের সেক্রেটারি যেন—প্রিন্সটনে তাঁর লেখা, চিঠি, বক্তৃতার খসড়া, পত্রপত্রিকা নিয়ে কাজ করে চলেছেন। আইনস্টাইনের শেষ জীবনের এই দুটি স্বজন-পরিজন, দুটি মহিলা তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লেখেন নি। হয়তো কখনো বা ফিসফিস করে এঁরা বলেছেন, "জানেন, মন খারাপ হলে চুপ করে বসে থাকতেন ; ঝুলো গোঁফের নীচে ঠোঁট দুটি একটু ফুলে উঠতো অভিমানে, দুঃখে বা বেদনায়। আর আনন্দে আবার হই হই করে হেসে উঠতেন কিছু পরে। একেবারে ছেলেমানুষ।" মার্গট বলেছেন, একদম শিশু। আর মিস ডুকাস বলবেন, "প্রতি মুহূর্ত তাঁর কাজে ভরা ছিল। ছোট শিশুর মতো তাঁর চোখমুখে ফুটে উঠতো কাজের একাগ্রতা আর মজা পাওয়ার আনন্দের উঁকি-ঝুঁকি। কী ছিল তাঁর কাজের

উপকরণ, সামান্য পেন্সিল আর কাগজ। নিজের কাজের ঘরে আরাম কেদারায় বসে হাঁটুর উপরে প্যাড বা খাতা নিয়ে চলতো তাঁর অবিরাম কাজ-কাজ খেলা। …বড় ছেলেমানুষ ছিলেন প্রফেসর। বৃষ্টির দিনে মাথা থেকে টুপি খুলে পকেটে রেখে একমাথা চুল ভিজিয়ে বাড়ি ফিরতেন। বলতেন, "চুল ভিজলে মুছে ফেললে তো শুকিয়ে যাবে, কোন চিহ্ন থাকে না। আর বৃষ্টিতে টুপি ভিজলে ওযে নষ্ট হয়ে যায়!—কি যে ছেলেমানুষ!"
কখনো কখনো কাজে মিল খুঁজে না পেয়ে হতাশায় চুপ করে বাড়িতে বসে থাকতেন। হয়তো বা মার্গটকে বলতেন, বেড়াতে যাবে? দুজনে হেঁটে বেড়াতেন বাড়ির আঙিনাটুকু, কখনো বা ছায়া-পাদপ ঘেরা সামনের পার্কে। ছোট ছোট কথা দিয়ে নৈঃশব্দ্যটিকে পূর্ণ করে তুলতেন। বলতেন, "আমার কোন প্রতিভা নেই, বুঝলে। আছে শুধু এক অদম্য কৌতূহল।" "সুন্দরতম আর গভীরতম অনুভূতির অভিজ্ঞতা পাওয়া যায় রহস্যের রোমাঞ্চকতায়। বিজ্ঞানের সর্বক্ষেত্রে এটি বীজমন্ত্র।" বৃদ্ধ বয়সে বেহালায় সুর ঠিকমতো আসে না। তার প্রিয় মোৎসার্টের সুর শাস্ত্রসম্মতভাবে বাজাতে পারেন না। তবু নিভৃত অবসরে কখনো বেহালা তুলে আপন মনে সুর তুলতেন। কাঁপা কাঁপা হাতে ভেসে আসতো বাখ, মোৎসার্ট, ভিভালডি। জীবনের শেষ দিকে কোন একটি ক্রিসমাসের সন্ধ্যায় যখন ছোট ছেলেমেয়েরা তাঁর দরজায় ক্যারল গাইছিল, তিনি বেহালা নিয়ে তাদের গানে সঙ্গত করলেন। ঠাণ্ডা ঝিরঝিরে বরফঝরা হাওয়ায় তাঁর সাদা চুল এলোমেলো হয়ে কাঁপে, কপালে আর চোখের কোণের নানা দাগের আলপনায় জল আর স্বেদ জমা হয়, আর গোঁফের নীচে ফুটে ওঠে আনন্দময় হাসি। "জানেন, ছেলের দল থেকে তাঁকে ভিন্ন মনে হয়নি সেদিন।" মিস ডুকাস বলবেন, আর মাথা নেড়ে সম্মতি জানাবেন মার্গট।

স্পিনোজা, দার্শনিক স্পিনোজা তাঁর বড় প্রিয় ছিল। লিঙ্কন বারনেটকে মিস ডুকাস বললেন, স্পিনোজার উদ্দেশে একজনের লেখা একটি কবিতা প্রফেসর প্রায়ই আবৃত্তি করতেন। তারপর মন্ত্রের মতো গম্ভীর মন্দ্র সুরে মিস ডুকাস সেই কবিতাটি শোনালেন;

"অসীম তার শুরুতে এবং তার শেষে।
মহাবিশ্ব তার একমাত্র চিরকালের ভালবাসার ধন।
পবিত্র সরলতা আর গভীর বিনয় নিয়ে চিরপ্রবহমান
জগতের আরশি হয়ে নিজেকে সেজে দাঁড়াতে দেখলেন তিনি।
আর দেখলেন, তার আরশি কত উজ্জ্বল, কত স্পষ্ট।
সেইখানে, সব মাথা ছাড়িয়ে তিনি একা ঊর্ধ্বে দাঁড়িয়ে আছেন;
—নিজের কর্মজগতে একচ্ছত্র সম্রাট যিনি!
আবার সব তুচ্ছ অশ্লীল ইতরতাকে স্বমহিমায় ঢেকে দিয়ে
চিরকালের দিগ্‌দর্শী যে আলোকশিখা—সেও তিনি।"

মিস ডুকাস বললেন, প্রফেসরও তাই। কত ছেলেমানুষ, কত সুন্দর, কত গভীর, রহস্যময়; কত মর্যাদাবান মহিমান্বিত, আবার কত যে পবিত্র ও সরল !

দেয়ালে ঝুলন্ত আইনস্টাইনের ফটোর চোখ দুটি বিস্ময়ে সেদিনও বলে উঠতো, oh, weh !

… সেকি ?

শূককীট

উত্তর জার্মানীর সোয়াবিয়ান আল্পস পর্বতশ্রেণীর তরাই অঞ্চলের একটি ছোট্ট শহর বুচাউ (Buchau), কনস্টান্স হ্রদের কাছাকাছি ডানিয়ুব নদীর অববাহিকায় একটি ছায়াঘেরা সুন্দর নিসর্গীয় অঞ্চল। এই শহরে খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জ্যু বা ইহুদিরা বসতি করে। শতাব্দীর পর শতাব্দী তারা এই শহরটির নাগরিকদের অংশ হয়ে থাকে। অত্যাচার, অবিচার, সিনাগগ বা ধর্মমন্দির পোড়ানো, সব কিছু সয়ে, মেনে নিয়ে জ্যু'রা টিঁকে ছিল ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত। ঐ বছরে বুচাউ-এর শেষ ইহুদির মৃত্যু ঘটে, নাম সিগবার্ট আইনস্টাইন। আইনস্টাইন পরিবার জার্মানির প্রাচীনতম পরিবারের অন্যতম। এদেরই একদল বুচাউ ছেড়ে আরও উত্তরে উলম (Ulm) শহরে হাজির হলো, সন-তারিখ ১৮৬৬ সনের কাছাকাছি। দূরে ডানিয়ুব নদীর সঙ্গে এসে মিশেছে দুটি চপল স্রোতস্বতী—ব্লাউ (Blau) এবং ইলার (Iller)। এই শহরে আইনস্টাইন পরিবারের আব্রাহাম তাঁর ছোট সংসার নিয়ে বাস করতে হাজির হলেন। এঁদের ছেলে হার্মানের বিয়ে হয় ১৮৭৬ সালে পলিন কোশের সঙ্গে, পাত্র পাত্রীর বয়সের তফাত ১১ বছর। বিয়ের পর একবছর নবদম্পতি বুচাউ শহরে বাস করেন। আর তারপর ১৮৭৭ সালে হার্মান উলম শহরে ফিরে আসেন; শ্বশুরের টাকায় ইলেকট্রিক আর ইঞ্জিনিয়ারিং মালপত্রের দোকান আর কারখানা খোলেন। ছোট শহর উলম, ছোট দোকান আর কারখানা, আর একটি অল্প বয়সী সুখী দম্পতি। উলম সেদিনও বিখ্যাত ছিল, শহরের অধিবাসীরা অহঙ্কারে বলতো Ulmense sunt mathematicii—উলমবাসীরা অঙ্ক বোঝেন।

এই শহরে একদিন বসন্ত আসে। উত্তরের পাহাড়ের বরফ গলে, নদীতে স্রোত জাগে, থ্রাস পাখি উড়ে যায়। কোকিল ডেকে ওঠে, নতুন পাতায় সাজা বনস্পতির শাখায়, মাঠে ঘাসে ফোটে ভায়োলেট, জলের ধারে ধারে ঈস্টার লিলি পাতার মুকুটে হাজির হয়, হলুদ ডাফেডিল হাওয়ায় দোলে। ফাল্গুনের শেষ, চৈত্রের আরম্ভ। উত্তর জার্মানীর বসন্ত ঋতু।

এই বসন্তে একটি আগন্তুক পৃথিবীর মুখ দেখলো - তারিখ ১৪ই মার্চ ১৮৭৯ সাল। আগন্তুক উলম শহরের এক নতুন অঙ্কবিদ, এলবার্ট আইনস্টাইন।

বছর কেটে যেতে না যেতে চৈত্রের কালবৈশাখী জাগে। হার্মানের ব্যবসা নষ্ট হয়। ভালোমানুষ দিলদরিয়া কাব্যরসিক হার্মান, ডেভিড কপারফিল্ডের মিকোবারের চরিত্রের মতো আশা নিয়ে স্বপ্ন দেখতেন, স্বপ্ন থেকে জেগে উঠে দেখেন ধারদেনায় দোকান ও কারখানা শেষ। উলম শহর ছেড়ে স্ত্রীপুত্র নিয়ে হাজির হন মিউনিকে। ভাই জেকবের সঙ্গে ইলেকট্রো-কেমিকেলের কারখানা খোলেন; হার্মান দেখেন বিক্রি-বাটরা, জেকব দেখেন কারখানা। মফস্বলের ছোট শহর ছেড়ে বেভেরিয়ার রাজধানীতে বাসা বাঁধেন নতুন ইহুদির দল। দুঃখের মধ্যেও সুখের আলো দেখা যায়; রোজগার বাড়ে, পরিবারও বাড়ে; ১৮৮১ সালে এলবার্টের বোন মাজার জন্ম নেয়।

এলবার্ট আইনস্টাইনের শৈশবের কথা বিশেষ জানা যায় না। আইনস্টাইনের নিজস্ব চিকিৎসক ডাক্তার জানোস প্লেশ (Janos Plesch) তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, "আমার ভাবতে বিস্ময় লাগে, আইনস্টাইনের অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি শুধু যেন বিজ্ঞানের জগতেই সচল, অন্যত্র যেন তাঁর গতি নেই। যে তত্ত্ব তাঁর কাছে ভালো লাগতো, চমক জাগাতো, কোনদিন সেটি তিনি ভুলতেন না। তাঁর শৈশব, তাঁর প্রথম বিজ্ঞানের পথে যাত্রার সূচনা অথবা তাঁর চিন্তা-ভাবনার প্রারম্ভিক চিহ্ন—এসবের স্মৃতি তাঁর নেই। এ নিয়ে তিনি কথা বলেন না, কারণ এরা নেই তাঁর স্মৃতিতে অথবা শ্রুতিতে।" আইনস্টাইন নিজেও তাই বলতেন। শৈশবের স্মৃতি তাঁর ক্ষীণ আর ক্ষীণতর তাঁর চিন্তার ক্রমবিকাশের প্রথম ধাপের ইতিহাস। তাঁর স্মৃতিতে ছিল কৈশোর. ছিল যৌবন বেদনা-রসের উচ্ছল দিনের কথা। উর্বশীর মতো আইনস্টাইন যেন হঠাৎ পূর্ণ বিকাশে উজ্জ্বল হয়ে দাঁড়ালেন।

এই স্মৃতিহীনতার কারণ এলবার্টের কথার আড় ভাঙে দেরীতে, প্রকাশের বাধা ইঙ্গিতে ভঙ্গীতে কাটানো যায়নি। তিনি ছিলেন dyslexia রোগের শিকার। অথচ এই dyslexia-র রুগীদের মধ্যে ভবিষ্যতে দেখা গেছে, দ্যভিঞ্চিকে; হানস ক্রিশ্চিয়ান এনডারসন অথবা নীয়েল বোরকে। শৈশবে কথা দিয়ে চিন্তার প্রকাশের বাধা এঁদের কমবেশি অন্তর্মুখী করে তুলেছিল; আইনস্টাইনের ন'বছর বয়স পর্যন্ত কথার বাধা কাটেনি। অন্তর্মুখিনতা তাকে শৈশবে স্বপ্নিল করে তুলেছিল। সেই স্বপ্নের চিহ্ন তাঁর কাজে আসে। সেই শৈশবের স্মৃতি।

দশ বছর পর্যন্ত আইনস্টাইন কেথলিক স্কুলে পড়লেন। কারণ ইহুদিদের স্কুলের দূরত্ব বেশি, খরচা বেশি। বাবা-মা ধর্ম আঁকড়ে থাকেননি;—জন্মসূত্রে ইহুদি ঠিকই, তবে না যান সিনাগগে, না মানেন আচার-সংস্কার। স্কুলে এলবার্ট সাধারণ ছাত্র, কিছুটা বরং নীচের দিকেই তার স্থান। মুখচোরা, লাজুক, অবোধ ছেলেটির হাতে মা পলিন বেহালা তুলে দিলেন ছ'বছর বয়সে। বেহালাও ভাল লাগে না; খেলাধূলার সঙ্গী শুধু বোন। এই

অবস্থায় নেহাতই যেন মুখ বদলাতে বেহালার চর্চা করেন। আর আশ্চর্য, গানবাজনা ভাল লাগে। বারো-তেরো বছর বয়সে মোৎসার্টের বাজনার আশ্চর্য গাণিতিক কাঠামো চোখে ধরা পড়ে। বেহালা তাঁর আনন্দ অনুভূতি প্রকাশের হাতিয়ার, তাঁর চাপধরা মনের সেফটিভালভ। তবু, সঙ্গীতজগতে তিনি মোটামুটি এ্যমেচার থেকে গেলেন। বেহালা নয়, অঙ্ক তাঁর সুয়োরানী, তাঁর প্রথম প্রেম।

পাঁচ বছর বয়সে বাবার উপহার একটি কম্পাস, ছয় বছরে মা হাতে দিলেন বেহালা। আর কিছু পরে কাকা জেকব দিলেন অঙ্কের বীজমন্ত্র। "বুঝলে, এলজেব্রা হলো মজার খেলা। তুমি শিকার করতে গিয়েছ ; একটা ছোট প্রাণী শিকার করবে যার নাম জানা নেই। তাকে বলা হবে X। আর যখন এটা হাতে এলো তখন জানা গেলো এর আসল নামটা কি।"—অঙ্কে মজা আছে, আছে খোঁজার মজা ; যেটার নাম জানা নেই তাকে খুঁজে নাম দেওয়া। সুরের মজার চেয়ে, কম্পাসের উত্তর দক্ষিণের স্থিরতার চেয়ে অঙ্কের মজা ভিন্নতর। অঙ্কে আছে গতিকে বোঝার চেষ্টা। তবু স্কুলে এলবার্ট সাধারণ, অতিসাধারণ। কথায় জড়তা, চোখে দিশেহারা ভাব, চলনে বলনে স্মার্টনেসের একান্ত অভাব। হেডমাস্টার বলেন, এ ছেলের ভবিষ্যৎ নেই, কিছু হবে না। যদি সকাল জানায় দিন কেমন যাবে, তবে সেদিন অন্ধকার বিষাদে ভরা ; আলো নেই, ঔজ্জ্বল্য নেই।

কেথলিক স্কুল ছেড়ে দশ বছর বয়সে এলবার্ট ভর্তি হলেন লুইটপোল্ড জিমনাসিয়ামে (Luitpold Gymnasium) ; সন তারিখ ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দ। এই মুখচোরা লাজুক ছেলেটির হঠাৎ পরিবর্তন ঘটে। কথার আগল ভেঙে যায়। আর সঙ্গে সঙ্গে জেগে ওঠে বিদ্রোহের বীজ। বিদ্রোহ কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে, শাসনের বিরুদ্ধে, নিয়মানুবর্তিতার বিরুদ্ধে। জিমনাসিয়ামের সব কিছু নিয়ম মাফিক, আঁটসাঁট, প্রায় সৈনিকের চালে গড়া ; সে জগতে এলবার্ট সুস্থ হয়ে নিশ্বাস নিতে পারে না ; সেখানে আছে হাঁফধরা দমবন্ধ করা নিয়মশাসনের চাপ। নেই সহানুভূতি, নেই ভালবাসা, নেই বন্ধুত্ব সখ্যতা, শুধু আছে কর্তব্য, আর শাসন বিচার।

জিমনাসিয়ামে এলবার্ট কথা খুঁজে পেলেন, সে কথায় ব্যঙ্গ-জ্বালা। যুক্তি পেলেন, সে যুক্তি প্রয়োগ হলো তর্কে। আর এ সময়ে তিনি দেখা পেলেন, ম্যাকস্ টালমে নামের এক ইহুদি মেডিকেল ছাত্রের। টালমে আইনস্টাইনকে পড়ালেন বিজ্ঞানের পপুলার বই আর অঙ্কের নানা টেক্সট্ বই। কিছুদিনের মধ্যে এলবার্ট অঙ্ক আর প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে মেট্রিকুলেশন স্টানডার্ডে পৌঁছে গেলেন। টালমের চেয়ে তাঁর জ্ঞান যেন বেশি। শিক্ষকতা ওখানেই শেষ। তারপর দুটি অসম বয়সী বন্ধু পড়তে শুরু করে দর্শন—কান্ট্ বা দেকার্তে, আর পড়েন ডারউইন। বিজ্ঞানের শাঁখের আওয়াজ কানে ভেসে আসে। যে ডাকে রাধা কুল ছাড়ে, সেই ডাক অতি মৃদু সুরে কানে বাজে—কখনো শোনা, কখনো না শোনা। বাইরের জগতের চেনাজানা রূপ অপছন্দ ঠেকে, স্কুলে অস্বাচ্ছন্দ্য ; ইচ্ছে সব

কিছু ভেঙেচুরে বেরিয়ে পড়া ; তবু জানা নেই সেই মৃদু সুরের রহস্য, তার মাদকতা, তার মাধুর্য। এই অশান্ত সময়ে এলবার্ট স্কুলে তার্কিক, বদমেজাজি, হামবড়া। সুযোগ পেলে নিয়ম ভাঙেন, ক্লাসে অমনোযোগী, আবার অঙ্কে-বিজ্ঞানে দুর্ধর্ষ। কোন ছাঁচে এলবার্টকে ফেলা যায় না।

এই বারো বছর বয়সে বিজ্ঞানের দ্বারস্থ হবার পর তাঁর ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে সন্দেহ হতে থাকে। মনে হয় বাইবেলের গল্পগুলি মিথ্যে, অসত্য। ফলে প্রচলিত ধর্মের অনুশাসনের প্রতি তাঁর আস্থা যে গেল তা নয়, যে কোন ধরনের অনুশাসন, কর্তৃত্ব সম্বন্ধে তিনি বীতরাগ হয়ে উঠলেন। জার্মান ভাষায় অনুশাসন বা বিধি নিষেধকে বলা হয় zwang ৎসুয়াঙ। এই ৎসুয়াঙের বিরোধিতার শুরু তাঁর বারো বছর বয়সে। আজীবন তিনি ৎসুয়াঙের বিরোধিতা করলেন আর তাঁর অবচেতন মনে, কী করে না জানি, এ ধারণা গড়ে ওঠে জার্মান মানেই ৎসুয়াঙ। হয়তো জার্মান স্কুলে প্রথাগত পাঠাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে যে মিলিটারি মনোভাবের চর্চা হতো, এলবার্ট আইনস্টাইনের স্বাধীন মন তা মেনে নিতে পারেনি—অন্য দিকে সুইজারল্যানড্ বা ইটালিতে স্কুলের এই আঁটসাঁট মিলিটারি মনোবৃত্তি তিনি দেখেননি। ভবিষ্যতে তাঁর যে ধারণা হয়েছিল, জার্মান মানেই সামরিক শাসন, তার অঙ্কুর গড়ে ওঠে স্কুলে, বারো বছর বয়সে, লুইটপোল্ড জিমনাসিয়ামে।

তের-চোদ্দ বছর বয়সে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান আর কানটের দর্শনের আলোকে এলবার্ট পৃথিবীকে, বিশ্বলোককে বুঝতে চাইলেন। ঈশ্বর বা গড সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন ধারণা নেই, আছে এক বিরাট শৃঙ্খলার আভাস। জিমনাসিয়ামের ব্যক্তিসত্তাহীন শৃঙ্খলা নয়, এক পরিপূর্ণ অনুভূতিময় শৃঙ্খলার বোধ। যার সাহস আছে, আছে ধৈর্য বা কল্পনা, পারে এই শৃঙ্খলা খুঁজতে ; এই খোঁজা অনুসন্ধান হলো পরম, আর সবই এর কাছে তুচ্ছ। বারো থেকে পনের, এই তিন বছর জিমনাসিয়ামে এলবার্ট রইলেন। অঙ্ক, বিজ্ঞান আর দর্শন ছাড়া আর সব বিষয়ে উদাসীন, ইনটারেস্টশূন্য। এই ১৮০৪ সালে মা বাবা বোন গেল ইটালিতে মিলান শহরে বেড়াতে। এলবার্ট রইল বোর্ডিং হাউসে। ছ মাসের মধ্যেই স্কুল থেকে বিতাড়িত হয়ে এলবার্ট চলে এলেন ইটালি।

স্কুল থেকে মুক্তি ; তবুও বিতাড়নের অপমানটা অসহনীয়। অনেকে বলেন, প্রোটেস্টানট্ মিশনের এক সুইস স্কুলে এ সময়ে কিছুদিন তিনি পড়েছিলেন—এ তথ্যের প্রমাণ নেই। সুইস স্কুলে ভর্তির বয়স হলো তেরো, আর আইনস্টাইন তখন পনের পার হয়েছেন।

ঠিক এমনি সময়ে, তাঁর বাবার ব্যবসা আরেকবার ফেল করল, আর আবার আত্মীয় বন্ধুদের সহায়তায় নতুন করে ব্যবসা শুরু হলো ইটালির পাভিয়াতে। বাবা হার্মান একটু কড়া সুরে, ছেলে এলবার্টকে দর্শন-টর্শনের বাজে ব্যাপার ছেড়েছুড়ে কাজের কাজ করতে বললেন। বাবা চাইলেন ছেলে হোক ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ার, পারিবারিক ব্যবসার উন্নতি হবে। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হবার মতো উপযুক্ত শিক্ষা এলবার্টের নেই—জিমন্যা-

সিয়ামের পড়াশোনা অর্ধেক, কোন সার্টিফিকেট নেই। এক উপায়—সুইজারল্যানডের জুরিখ শহরের E T H-এ ভর্তি হওয়া। সেখানেও ঝামেলা—ভর্তি হবার বয়স ১৮ আর আইনস্টাইনের বয়স ১৬। মিসেস আইনস্টাইন ছেলের জন্য এক কাউন্সিলারকে ধরে টরে তো ভর্তি করার চেষ্টা করলেন। আইনস্টাইন ভর্তি হবার পরীক্ষায় বসলেন এবং ফেল করলেন। কেন ফেল করলেন এ প্রশ্নের উত্তরে আইনস্টাইন পরবর্তীকালে জানালেন, এটা তাঁর আরেক কীর্তি—ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার ইচ্ছে তাঁর ছিল না ; পারিবারিক সচ্ছলতার চিন্তা তাঁর মাথায় আসেনি। তিনি চেয়েছিলেন বিজ্ঞানী হতে, পেশাদার হতে নয়।

ফেল করলেও E T H-এর প্রিন্সিপ্যাল আইনস্টাইনের গণিতজ্ঞানে বিস্মিত। তাঁরই সুপারিশে আরাউ (Aarau) শহরের মিশনারী স্কুলে এলবার্ট ভর্তি হলেন। ১৮৯৫ থেকে ১৮৯৬ সাল। এক বছরের কিছু বেশি সময় আরাউ-এর স্কুলের ছাত্র এলবার্ট। আরাউ তাঁর ভাল লাগে—স্কুলের আবহাওয়ায় স্বস্তি ফিরে আসে, নিয়মের বাঁধন নেই, শৈথিল্যও নেই, আর নেই, শাসনের শ্বাসরোধ-করা হুমকি। ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক যেন বন্ধুত্বের। আরাউ-এ অশান্ত বিদ্রোহী আশ্রয় পায়। তবু তখনো কথাবার্তায় অশ্রদ্ধা অবজ্ঞা প্রকাশ পাচ্ছে, আর নিজের বক্তব্য ধারণা প্রকাশে সোচ্চারতা।

এই ১৮৯৫ সালে আইনস্টাইন জার্মান নাগরিকত্ব ত্যাগ করতে চাইলেন। দুটো বিসর্জন ; এক, তাঁর ইহুদি ধর্মমত, ধর্মবিশ্বাস এবং দুই. তাঁর জার্মান হয়ে থাকার অধিকার। প্রথম ইচ্ছাতে বাপ-মায়ের না আছে সম্মতি, না অসম্মতি। ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামানোর ইচ্ছে তাঁদের কোনকালেই ছিল না, এখনও নেই। আর দ্বিতীয় ইচ্ছা, তাঁদের মতে পনের-ষোল বছরের ছেলের পাকামো ; অকালপক্ক ছেলেটির বেহিসাবী আকাঙ্ক্ষা। এলবার্ট কিন্তু তাঁর কর্তব্যে স্থির ; জার্মান সে থাকতে চায় না। অথচ পনের-ষোল বছরের ছেলের নাগরিকত্ব পরিবর্তন আইনে বাধে। তবু এলবার্ট একগুঁয়ে একরোখা হয়ে বাবাকে তোষামোদ করে চলে। নাচার হয়ে হার্মান ১৮৯৬ সালে কর্তৃপক্ষকে এলবার্টের জার্মান নাগরিকত্ব ত্যাগের কথা চিঠিতে জানান। ২৮শে জানুয়ারী ১৮৯৬ সালে চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার করা হয়। এলবার্টের পাসপোর্টের পরিবর্তন ঘটে। চিঠি যায় উলম শহরে—এলবার্টের জার্মান নাগরিকত্ব থাকছে না। জার্মান নাগরিকত্ব নেই, আবার বয়স কম বলে সুইস নাগরিকত্ব পাওয়া গেল না। সুইজারল্যানডে এলবার্ট তাঁর শিক্ষাজীবন স্টেটলেস—অরাষ্ট্রীয় নাগরিক হিসেবে শেষ করলেন—তাঁর পরিচয় শুধু জার্মান পিতামাতার সন্তান।

১৮৯৬ সালে E T H-এর পরীক্ষায় আবার বসলেন এলবার্ট এবং তিনি পাশ করলেন। চার বছরের এক শিক্ষাক্রমের ছাত্র হয়ে কলেজে এলেন—পাস করলে অধ্যাপনা জুটবে। ১৮৯৬ সালের ২৯শে অক্টোবর জুরিখে আইনস্টাইনের নতুন ছাত্রজীবন শুরু। পেয়িং গেস্ট হয়ে তুটি বাড়িতে দু বছর কাটালেন। পড়ার খরচা জোগাল মায়ের এক আত্মীয়

(Karr) পরিবার, মাসিক একশ ফ্রাঙ্ক—তার মধ্যেই সব খরচাপাতি। আইনস্টাইনের বয়স তখন সতের। ক্লাসে সব চেয়ে বয়সে ছোট ; এমন কি ক্লাসের মেয়েরাও বয়সে বড়। মিলেভা মেরিচ (Mileva Maric) নামে হাঙ্গেরীয় যে মেয়েটি এলবার্টের সঙ্গে পড়ে, সে তার চেয়ে চার বছরের বড়। জন্ম ১৮৭৫ সালে।

এলবার্টের E T H-এর ছাত্র-জীবনে কোন বিশেষ ঘটনা নেই। অর্থহীন আলাপ-আলোচনা, বন্ধুদের সঙ্গে পাহাড়ের শিখরে ওঠা, কাফেতে হই-হই আড্ডা—মুখরোচক খাওয়া আর মাসের শেষে পয়সার টানাটানি—সব ছাত্রজীবনে যা ঘটে থাকে, এলবার্টের জীবনেও তাই। এরই মধ্যে আরাউ শহরে বোন মাজাকে দেখতে যেতেন, মাজা সেখানকার টিচার্স সেমিনারের ছাত্রী।

এছাড়া ছিল হ্রদের জলে নৌকো ভাসিয়ে ভেসে চলা। এই নৌকো চালানো এলবার্টের সারাজীবনের এক আনন্দসঙ্গী। জুরিখের ছাত্রজীবনে এই আনন্দের সূচনা। আরেকটি সূচনা হলো, ব্যক্তিগত জিনিসপত্র, বিশেষ করে ঘরের চাবি হারিয়ে ফেলা, ভুলে যাওয়া। দুপুর রাত্রে ল্যানড্‌লেডিকে জাগিয়ে অপরাধী কণ্ঠে বহুবার বলতে শোনা গেছে—"আমি আইনস্টাইন, আবার চাবিটা ভুলে ফেলে এসেছি।"

বেহালা বাজানো শিক্ষার সুবিধে পাওয়া যায়। মেয়েমহলে কালো কোঁকড়া চুলের বেহালাবাদকের খাতির জোটে। আইনস্টাইন ১·৭৬ মিটার (প্রায় ৫ ফিট ৮ ইঞ্চি) লম্বা, শরীরের ঊর্ধ্বাংশ সাঁতার আর নৌকো চালনার জন্য সুগঠিত, একমাথা কালো চুল, নাকের গঠন ইহুদিদের মতন নয়। সুন্দর তীক্ষ্ণ নাক, অথচ রোমানদের ঈগলের ঠোঁটের মতো নয় ; আর তাঁর চোখ, দুটি আশ্চর্য চোখ, কিছুটা কোটরে ঢুকোনো দুটি উজ্জ্বল চোখ, যেন দুটি হীরে—এমনি তার সম্মোহন। আইনস্টাইন সুপুরুষ, বুদ্ধিমান, গান-বাজনা বোঝেন, কথাবার্তায় কিছুটা চতুর। মেয়েমহলে আইনস্টাইন পপুলার। সেই পপুলারত্ব আজীবন এলবার্টের বজায় থেকে গেছে। মেয়েরা সঙ্গী হয়ে এসেছে, বন্ধু হয়েছে। আবার আইনস্টাইনকেই ভেবেছে পরামর্শদাতা। মেয়েদের সঙ্গ আইনস্টাইনের ভালই লাগে। এই ভালো-লাগা বোধ প্রৌঢ়ত্বেও দেখা গেছে। দ্বিতীয় স্ত্রী এলসা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে বলতেন, "বুদ্ধিমতী মেয়েরা তাঁকে আকর্ষণ করে না। সাধারণ কর্মী মেয়েরা দয়া পরবশ হয় বলে, তাঁর আকর্ষণ।"—শুধু এই মেয়েদের সঙ্গ আকর্ষণ ক্ষণিকের। জুরিখেও দেখা গেছে, তাঁর চিন্তা বা কাজের সময় মেয়েদের সান্নিধ্য তাঁর অসহ্য। শুধু মেয়ে নয়, যে কোন সঙ্গী তাঁর কাজের ব্যাঘাত। ধীরে ধীরে এই কাজে ডুবে যাওয়া শুরু হয়। দেখা দেয় অনুভূতিশূন্যতা, গম্ভীরতা, স্থৈর্য আর মগ্নতা। অঙ্ক আর ফিজিক্স এই তাঁর প্রথম আকর্ষণ। তাঁর দ্বিতীয় আকর্ষণ সেও ফিজিক্স আর অঙ্ক। এরই মধ্যে কোন অবসর মুহূর্তে আইনস্টাইন ছাত্রী মেয়েদের হোস্টেলে হাজির হতেন, মিলেভা পিয়ানো বাজাতো, তিনি শুনতেন।

কোনরকম খেলাধূলায় আকর্ষণ ধীরে ধীরে কমে আসে। ব্যায়াম, যা শারীরিক, সেখানে তাঁর অনিচ্ছা। নদীতে নৌকো ভাসিয়ে পালে হাওয়া লাগিয়ে ভেসে চলা, হাওয়া না থাকলে, স্থির জলে ছোট নোট বই খুলে অঙ্ক কষা বা বই পড়া—এই তাঁর অবসর, তাঁর বিশ্রাম। বিজ্ঞান তাঁর ভালো লাগে—তবে সে বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক দিক। লেবরেটরির কাজে নেই প্রাণের টান। এর মধ্যে ১৮৯৯ সালে জুরিখের লেবরেটরিতে কাজ করতে গিয়ে হাত পোড়ালেন। আইনস্টাইনের জীবনীকার আনটন রিসার (Anton Reiser—যিনি ছদ্মনামে জীবনটি লিখেছেন, বাস্তবে ইনি আইনস্টাইনের দ্বিতীয় স্ত্রী এলসার জ্যেষ্ঠা কন্যার স্বামী) তাঁর বই-এ লিখেছেন, আইনস্টাইন এমন এক যন্ত্র তৈরি করতে চেয়েছিলেন, যার ফলে দূর-দূরান্তের অজানা সমস্যা, যা সময়ভিত্তিক, তার ধারণা করা যাবে। মাপা যাবে ইথারের বিপরীতে পৃথিবীর গতি।

E T H-এ ফিজিক্সের পাঠক্রমে ইঞ্জিনিয়ারিং-এর দিকে ঝোঁক বা জোর ছিল। কাজেই ফিজিক্স-এর তত্ত্বের সংবাদ আইনস্টাইনকে একাই জানতে হলো। আইনস্টাইনের উপরে দুজন শিক্ষকের প্রভাব পড়ে। প্রথম জন আর্নস্ট মাক (Arnst Mach) ; মাক নিউটনের পরম বা absolute তত্ত্ব মানতেন না। জ্ঞান হলো অনুভূতি সাপেক্ষ আর মানুষ যাকে বলে প্রাকৃতিক নিয়ম সেটি তাঁর ভূয়োদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে ওঠা। "রং, স্পেশ, সুর ইত্যাদি এরাই বাস্তব—আর কিছুর অস্তিত্ব নেই।" মাক-এর মতবাদের সঙ্গে সঙ্গে আইনস্টাইন সে যুগের এবং সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ পোঁয়াকার-এর (Henri Poincare) লেখা পড়েন। এ সময়ে পোঁয়াকার তাঁর যুগান্তকারী বৈপ্লবিক ঘোষণা জানান—"পরম বা absolute স্পেশ, পরম সময় এমন কি ইউক্লিডীয় জ্যামিতি মেকানিক্সের শর্ত হতে পারে না। নন্-ইউক্লিডীয় স্পেশের ভিত্তিতে অথবা সাপেক্ষে এইসব তথ্যকে বর্ণনা করা যাবে।"—সে যুগের ফিজিক্স-এর তত্ত্বের বিকাশে চরম আর পরম কথাটা বাধা ঠেকে। আইনস্টাইন তাঁর ব্যক্তিগত পড়াশুনার চর্চা করেন ; কিরশফ, হেলমোহৎস, হার্টৎস ও মেক্সওয়েলের তত্ত্ব এবং তথ্য। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সীমাবদ্ধতা, মেকানিক্সের জগতের দম আটকানো বদ্ধভাবের মুক্তি কিছু বুঝি পোঁয়াকারের ধারণায়, কিছু বা মাকের বক্তব্য। নিউটনের চরম ও পরম জগতের সমালোচনায় মাকের সোচ্চার মতবাদ আইনস্টাইনের মনকে সংস্কারমুক্ত করে তোলে।

দ্বিতীয় শিক্ষক হার্মান মিনকোউস্কি (Herman Minkowski)। ইনি গণিতের অধ্যাপক। আইনস্টাইনের প্রিয় বিষয়ের অধ্যাপক। এই গণিতজ্ঞ পরবর্তীকালে আইন-স্টাইনের তত্ত্বের সম্ভাবনাময় বিশালত্বের গাণিতিক ছক জানিয়েছিলেন।

আর যাঁরা শিক্ষক, তাঁদের ক্লাসে আইনস্টাইন যে নিত্য উপস্থিত থাকেন তা নয় ; তাঁর বন্ধু মার্সেল গ্রোসমান ক্লাসের নোট এলবার্টকে সরবরাহ করতেন। জানাতেন পাঠক্রম, পরীক্ষাসূচী। এলবার্ট কষ্ট করে পরীক্ষা দিতেন। পড়া এবং তর্ক ; জানা এবং জ্ঞাতব্য

বিষয় নিয়ে প্রকাশ্যে বা নিভৃতে জাবর কাটা—এই তাঁর প্রস্তুতিপর্বে ছাত্রজীবনের প্রাপ্তি। সে দিনের প্রতিষ্ঠিত স্বীকার্য তথ্যগুলিকে চ্যালেঞ্জ করা যাবে আর ডিগ্রিকোর্সের পাঠক্রম কত যে পঙ্গু, কত ভুলভালে ভরা—এ সত্য তাঁর কাছে প্রকাশিত, অতএব পুরনো মতকে আঘাত করো, ভেঙে দাও। গড বা ঈশ্বর কী ভাবে এ জগৎ সৃষ্টি করেছেন জানতে হলে, কোন কিছুতে বিশ্বাস রাখলে চলবে না। মুক্ত মনে ও দৃষ্টিতে তাকে খুঁজতে হবে। ধর্ম এবং নিউটন—এসব প্রচলিত সত্যের বন্ধন থেকে মুক্তি নিতে হবে—এই তাঁর Conviction, তাঁর প্রত্যয়।

শিক্ষকরা তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করেন, পাঠ্যসূচীতে মন বসাতে বলেন—এলবার্ট উত্তরে তর্ক করেন। ফিজিক্স-এর প্রফেসর ওয়েবারকে সম্মান দিয়ে ডাকেন না হের প্রফেসর বলে, ডাকেন হের ওয়েবার। পরীক্ষা দেওয়াটা হেলাফেলার ব্যাপার, কাজের কাজ নয়। ডিগ্রিটা দরকার—কারণ ডিগ্রি পেলে পাওয়া যাবে অধ্যাপনার সুযোগ আর পড়ার সুবিধে। পরবর্তীকালে ১৯৩৪ সালে জনৈক তরুণীর লিখিত চিঠির জবাবে আইনস্টাইন তাঁর শিক্ষাকালের স্মৃতিচারণ করলেন।—"আমার শিক্ষকদের কাছ থেকে আমার অনুরূপ আচরণ (যে আচরণে রোষ জাগায়) পাবার দুর্ভাগ্য হতো। স্বাধীন মনোভাবের জন্য তাঁরা আমাকে পছন্দ করতেন না, সহকারীর প্রয়োজন ঘটলেও আমাকে ডাকতেন না। তবে একথা স্বীকার করি, আদর্শ ছাত্র হিসেবে আমি বেশ নীচু স্তরের ছিলাম।"

১৮৯৬ থেকে ১৯০০ সাল—এই চার বছর E T H-এ ছাত্রজীবনে এলবার্ট আইনস্টাইন গোলমেলে ছাত্র হয়েই রইলেন। পাস করলেন ১৯০০ সালে, পূর্ণসংখ্যা ৬'০০ এর মধ্যে ৪'৯১ সংখ্যা পেয়ে। পাস করলেন, কিন্তু ইনস্টিট্যুটে চাকরি পেলেন না। এলবার্ট আইনস্টাইনকে সহকারী নিতে প্রফেসর ওয়েবার অস্বীকার করলেন। সে বছর যাঁরা পরীক্ষা দিয়েছিল তাঁদের মধ্যে এক মিলেভা মেরিচ ছাড়া সবাই পাস করলেন। পাস করা সবারই চাকরি জুটলো, শুধু আইনস্টাইন ছাড়া।

লুইটপোল্ড জিমনাসিয়ামের বিতাড়নের পর E T H-এর অস্বীকৃতি—তাঁর জীবনের দ্বিতীয় আঘাত। কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে তিনি নন, তিনি কর্তৃত্বকে মানতে চাননি; সেই না-মানা জেহাদের ফল জীবনের সূচনায় তাঁকে অসহায় করে তুললো। ১৯০০ সাল। বয়স ২১। শিক্ষায় গ্র্যাজুয়েট। অতএব প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী কার পরিবার তাঁদের ১০০ ফ্রাঙ্কের সাহায্য বন্ধ করে দিলেন। এলবার্টকে নিজের চেষ্টায় নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। অসহায় এবং নিঃসহায় এলবার্ট মিলানে তাঁর বাবার কাছে এলেন আর শুরু হলো কাজের চেষ্টায় পত্র লেখা। কোন সুরাহা হলো না। আবার ফিরে এলেন জুরিখে। প্রফেসর আলফ্রেড উলফারের অধীনে সুইস ফেডারেল অবজারভেটারিতে একটা সাময়িক কাজ জুটলো। আর এই সাময়িক কাজের সুবাদে তিনি সুইস নাগরিকত্ব পাবার দরখাস্ত দিলেন।

নাগরিকত্ব পাবার পরিপ্রেক্ষিতে জীবনীকার রিসার আইনস্টাইন আর সুইস কর্তৃপক্ষের ইনটারভ্যুর একটা বিশদ ছবি লিখেছেন। বস্তুত আইনস্টাইন মুডে থাকলে, মেজাজে এলে গালগল্প করতে ভালবাসতেন। আর বেশির ভাগ মজার গল্পের হাবাগোবা নায়ক হতেন তিনি নিজে। রিসারের লেখা ইনটারভ্যুর হাবাগোবা চার্লি চ্যাপলিন জাতীয় চরিত্রটি আইনস্টাইনের, যিনি কর্তৃপক্ষের প্রশ্নের অদ্ভুত অদ্ভুত উত্তর দিলেন। মজা পেয়ে কর্তৃপক্ষের দল আইনস্টাইনকে আরো অদ্ভুত প্রশ্ন করলেন, ঠাট্টা করলেন, আলঠালেন। অবশেষে আইনস্টাইন পেলেন সুইজারল্যানডের সম্মানিত নাগরিকত্ব। ২১শে আগস্ট ১৯০১ সালে সুইস নাগরিকত্বে তাঁর স্থান পাকা হলো। সেকালীন নিয়ম অনুযায়ী তিন মাসের জন্য তাঁর সামরিক ট্রেনিং নেবার কথা। সবরকম মিলিটারি ব্যাপারে যাঁর প্রচণ্ড অনীহা সেই এলবার্ট আইনস্টাইন সুইস নাগরিকত্ব পাবার আনন্দে মিলিটারি ট্রেনিং নিতে গেলেন · ট্রেনিং তাঁর বরাতে জুটল না, কারণ তাঁর পা হলো ফ্ল্যাট আর আছে ভেরিকোজ ভেন। ট্রেনিং না পান, আইনস্টাইন কিন্তু তাঁর সার্ভিস বুক সযত্নে বহুদিন নিজের কাছে রেখেছিলেন।

সাময়িক কাজ শেষ হয় অথচ নিয়মিত পারমানেনট্ কাজ জোটে না। হতাশ এলবার্ট আবার বাবা-মা-এর কাছে চলে এলেন। ইতিমধ্যে সুইজারল্যানডের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পত্রিকা Annalen der Physik-এর ১৩ ডিসেম্বর ১৯০০ সালের সংখ্যায় তাঁর প্রথম মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশ হলো Deduction from the Phenomena of Capillarity। মৌলিক প্রবন্ধটি জার্মান ফিজিক্যাল কেমিস্ট ভিলহেলম অস্টওয়াল্ডের কাজের ভিত্তিতে, অনুপ্রেরণায় লেখা। আইনস্টাইন এই প্রবন্ধের একটি কপি প্রফেসার অস্টওয়াল্ডকে পাঠালেন—সঙ্গে তাঁর লেবরেটারিতে কাজ পাবার অনুরোধ। উত্তর পাওয়া গেল না। চিঠি লিখলেন হল্যানডের লেইডেন (Leiden) বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর ওনেস (Onnes) এর কাছে; এখানেও প্রবন্ধের নকল, আর ইউনিভারসিটিতে এসিসট্যানটের চাকরির জন্য দরখাস্ত। উত্তর এখানেও এল না।

যা হোক আরো একটা সাময়িক বদলি শিক্ষকের কাজ জোটে—অঙ্কের মাস্টারি। কাজ সুইজারল্যানডের Winterthur-এ; মাত্র তিন মাসের জন্য। তিন মাস পর আবার চাকরি খোঁজা। পয়সা রোজগার নেই অথচ পড়াশুনায় আগ্রহ, খেয়ে পরে থাকার প্রচেষ্টা, সব মিলিয়ে আইনস্টাইনকে টেনশনে রেখে দেয়। খবরের কাগজে কর্মখালি দেখে দরখাস্ত পাঠান, চাকরির উমেদারী আর পাঠাগারে বসে বসে নাওয়া খাওয়া ভুলে পড়া, এই হলো দৈনন্দিন রুটিন। ইতিমধ্যে বন্ধু কনার্ড হাবিখ্ট্ (Conard Habicht) -এর সহায়তায় ডক্টর জেকব নুয়েখ (Dr. Jakab Nuesh)-এর বোর্ডিং স্কুলে চাকরি পেলেন। সে চাকরিও নিজের অমনোযোগী স্বভাবের দোষে কয়েক মাসের মধ্যে হারালেন। এই বোর্ডিং স্কুলে আইনস্টাইন তাঁর ডক্টরেটের থিসিস লেখা শেষ করলেন—

গ্যাসের কাইনেটিক থিওরির উপর লেখা—আর এটি পেশ করলেন জুরিখ ইউনিভারসিটিতে। এই বছরেই পেটেনট্ অফিসে চাকরির দরখাস্ত করলেন।

বের্নে শহরের পেটেনট্ অফিসটির প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৮৮ সালে, তার ডিরেক্টর ফ্রেডরিক হালের (Friedrich Haller)। হালের ইঞ্জিনিয়ার, সুইজারল্যানডের পাহাড়ে রেলপথ নির্মাণে প্রশংসা পেয়েছেন। নিজের মর্জি মতন পেটেনট্ অফিস চালান। হালেরের বন্ধু হলো আইনস্টাইনের E T H-এর ক্লাস ফ্রেনড্ মার্সেল গ্রোসমানের বাবা; তাঁরই সহায়তায় ১৯০২ সালের প্রথম দিকে আইনস্টাইন কাজের ইনটারভ্যু পেলেন। দুঘণ্টা ইনটারভ্যু চললো।

হালের দেখলেন আইনস্টাইনের কারিগরী জ্ঞান প্রায় শূন্য। তবুও তাঁর চাকরি হলো। ১৬ই জুন ১৯০২ সালে টেকনিক্যাল এক্সপার্টের কাজে বার্ষিক ৩৫০০ সুইস ফ্রাঙ্ক মাইনেতে এলবার্ট আইনস্টাইন নিয়োগপত্র পেলেন। আইনস্টাইন টেকনিক্যাল এক্সপার্ট (দ্বিতীয় শ্রেণী) পোস্টের জন্য দরখাস্ত করেছিলেন। ইনটারভ্যুতে কিছু পারেন নি, চাকরি হলো টেকনিক্যাল এক্সপার্ট (তৃতীয় শ্রেণী) পোস্টে।

সবাই নিশ্চিন্ত। যা হোক ভদ্র সন্তানটির একটা হিল্লে হলো। লেগে থাকলে টিকে থাকলে উন্নতি হবে—শত হোক সুইস পেটেনট্ অফিসের চাকরি, সরকারী চাকরি। তাছাড়া এলবার্ট আইনস্টাইনের যা বুদ্ধি-শুদ্ধি, হাবভাব, যে অলস মতিগতি, তর্ক করার প্রবৃত্তি, একটা যা হোক কাজ জুটেছে সেই যথেষ্ট। গ্রোসমানরা আইনস্টাইনের উপকার করতে পেরে খুশি।

নিয়োগপত্র পাবার এক সপ্তাহ পরে আইনস্টাইন কাজে যোগ দিলেন। ডিরেক্টর হালেরের কড়া শাসনের খপ্পরে পড়লেন আইনস্টাইন। হালেরের সম্বন্ধে এলবার্টের মিশ্র স্মৃতি, "বাবার চেয়েও কড়া; তবে আমাকে শুদ্ধ প্রকাশ রীতি শিখিয়েছেন।" এই কড়া ব্যবস্থার মধ্যে আইনস্টাইন ফিজিক্স-এর চর্চা পুরোদমে শুরু করলেন।

২৩শে জুন ১৯০২ সালে বের্নে শহরের সরকারী পেটেনট্ অফিসে এলবার্ট আইনস্টাইন কাজে যোগ দিলেন। কাজ হলো, যাঁরা নানা যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের পেটেনট্ নিচ্ছেন, তাঁদের দরখাস্ত পড়া, নকশা দেখা, যা তৈরী হতে পারে তাদের সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করা এবং মোটামুটি বিশ্বাসযোগ্য ভাষায় এগুলির গুণাগুণ স্পেশিফিকেশন লিখে দলিলবদ্ধ করা। সাধারণ কাজ, রুটিন মাফিক কাজ। কাজটি বুঝতে লাগে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বা ফলিত বিজ্ঞানের জ্ঞান এবং এটির স্পেশিফিকেশন লিখতে লাগে ভাষার দখল। তবুও এলবার্ট আইনস্টাইনের কাজের স্বীকৃতি, কনফারমেশন এল ৫ই সেপ্টেম্বর ১৯০৪ সালে। পদোন্নতি ঘটল না, তবে মাইনে বাড়ল ৪০০ ফ্রাঙ্ক। ৩৫০০ ফ্রাঙ্ক থেকে দাঁড়াল ৩৯০০ ফ্রাঙ্কে। ডিরেক্টর হালের লিখলেন, কাজ শিখেছে, তবুও মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ জ্ঞান যথেষ্ট নয়। সত্যিকারের পদোন্নতি ঘটে ১৯০৬ সালে, মাইনেও বাড়ে

বছরে আরো ৬০০ ফ্রাঙ্ক। ইতিমধ্যে আইনস্টাইন তার ডক্টরেট ডিগ্রি পেয়েছেন, আর ১৯০৫ সালে বিজ্ঞানজগতে আলোড়ন তুলেছেন।

পেটেনট্ অফিসের কাজ, সরকারী কাজের মতোই কেরানী আইনস্টাইন করতেন। এ তাঁর রুজি রোজগার -দৈনন্দিন হাঁড়ি ঠেলার ব্যাপার। তবুও হালেরের কড়া নির্দেশে স্পেশিফি:কেশন লিখতে লিখতে লেখার ব্যাপারে উন্নতি ঘটে। সহজ সরল সুনির্দিষ্ট যুক্তি-সম্মত অথচ সরসতায় ভরা যে লেখার জন্য আইনস্টাইনের খ্যাতি, তার সূচনা এখানে, পরিমার্জনাও এখানে। রুটিন কাজের অবসরে আইনস্টাইনের পড়াশোনা চলে।

আইনস্টাইনের প্রথম প্রবন্ধ জুরিখে লেখা। থিসিস লেখেন ডক্টর মুয়েখের বোর্ডিং স্কুলে। এ ছাড়া তাঁর আর সব মৌলিক প্রবন্ধ যা তিনি সুইজারল্যানডে লিখেছেন, সবকটির রচনা বের্ন শহরে পেটেনট্ অফিসে কাজের সময়।

তাঁর ডক্টরেটের থিসিস "A New Defination of Molecular Dimension" —একটি ২১ পাতার রচনা ; বন্ধু মার্শেল গ্রোসমানকে উৎসর্গিত। থিসিসটি ফিজিক্সের বিষয়, না অঙ্কের বিষয় এ নিয়ে সংশয় দেখা দেওয়ায় ফিজিক্স ও গণিতের এই দু-বিভাগই থিসিসটি পড়েন। তাঁর গাণিতিক পাণ্ডিত্যের প্রশংসা থিসিসটিতে বেশি জোটে। যা হোক জুরিখ ইউনিভারসিটি থেকে আইনস্টাইন ডক্টরেট ডিগ্রি পান। ঘটনাটি ঘটে ১৯০৫ সালে।

ইতিমধ্যে ১৯০১ সাল থেকে ১৯০৪ সালের মধ্যে আইনস্টাইন পাঁচটি পেপার প্রকাশ করেছেন—সবকটি প্রকাশ হলো Annalen der Physik পত্রিকাটিতে। ১৯০৫ সালে প্রকাশিত হলো তাঁর ষষ্ঠ পেপার। প্রথম দুটি পেপারে আইনস্টাইন কেপিলারিত্ব আর পোটেনশিয়েল ডিফারেন্স নিয়ে কাজ করলেন। পরের তিনটি বিষয় থার্মোডায়নামিক্স ও ও কাইনেটিক এনার্জির উপর লেখা।

ছটি পেপারে নতুনত্বের চমক নেই—বরং আছে সেকালীন তাপগতি-বিজ্ঞান বা থার্মোডায়নামিক্স-এর প্রচলিত ধারণার নতুন ব্যাখ্যা, নতুন রীতি:তে প্রমাণ। সে যুগে ফিজিক্সের চৌহদ্দিতে এটমের ধারণা প্রতিষ্ঠা পায়নি। অস্টওয়াল্ড, মাক—এঁরা ডালটনের এটমতত্ত্বে বিশ্বাস করেননি। এঁদের উত্তরসূরী হয়েও আইনস্টাইন তাঁর পেপারে এটমতত্ত্ব হাজির করলেন। সমস্যার সমাধানে প্রয়োগ করলেন সংখ্যা-গণিত, সাংখ্যায়নিক বিজ্ঞান বা স্ট্যাটিসটিক্স। প্রতি এটমের ব্যষ্টি-চিন্তা থেকে প্রয়োগ হলো গোষ্ঠী-চিন্তা। ষষ্ঠ পেপারে তিনি তাঁর প্রথম দিকের পেপারের সমাধানগুলিকে আরেক নতুন রীতিতে প্রমাণ করলেন। বিবিধতার মধ্যে তিনি মিলন খুঁজে পেলেন,আর দর্শন-ইন্দ্রিয়ে গড়া জগতের বাইরে আরেক বাস্তব জগতের আভাস টেনে আনলেন। তাপগতি-বিজ্ঞানের সমতা, অপরিবর্তনীয়তার ধারণায় প্রয়োগ করলেন সম্ভাবনার তত্ত্ব বা Theory Probability। আইনস্টাইনের নিজস্ব ধারণা তাঁর কাজ একেবারে নতুন ; তাপগতি বিজ্ঞানে সাংখ্যায়নিক পদ্ধতির প্রয়োগে সম্ভাবনার তাত্ত্বিক দিকের প্রকাশ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের গণিতবিদ্ জসুআ উইলার্ড

গিবস (Josuah Willard Gibbs) আগেই করেছিলেন। আইনস্টাইনের কাজ গিবসের কাজের উন্নত সংস্করণ।

এইসব পেপার প্রকাশের ফলে আইনস্টাইনের নাম বিজ্ঞানীমহলে প্রচারিত হচ্ছে। আইনস্টাইন তাঁর টাকা-পয়সার টানাটানি কিছুটা সুরাহা করতে প্রাইভেট ট্যুশনি করতে শুরু করলেন। পাঠ্যবিষয় ফিজিক্স, সময় এক ঘণ্টা। ১৯০২ সালে ২।১টি ছাত্র নিয়ে তাঁর প্রাইভেট শিক্ষকতার স্কুল চালু হলো, একটা গালভরা নাম দিলেন স্কুলের—"অলিম্পিয়া একাদেমি।" প্লেটোর একাদেমির মতো বিদগ্ধদের আলোচনার জায়গা। প্রথম মরিস সলোভিন, আর দ্বিতীয় জন, আইনস্টাইনের পূর্বতন সুহৃদ কনার্ড হাবিখ্ট্, যিনি আইনস্টাইনকে ডক্টর মুয়েখের বোর্ডিং স্কুলে কাজ পেতে সাহায্য করেছিলেন। ছাত্র-শিক্ষকের বয়সের তফাত বড় জোর বছর দুই। কাজেই পড়াশোনা মানে আলোচনা, ঘোরতর তর্ক; আলোচনা সবই বিজ্ঞানের উপর অথবা গণিতের কাঠামো নির্ধারণে।

অলিম্পিয়া একাদেমি আর পেটেন্ট্ অফিসের চাকরির কালে ১৯০৩ সালে ৬ই জানুয়ারী তারিখে আইনস্টাইন সহপাঠী মিলেভা মেরিচকে বিয়ে করলেন। মিলেভা বয়সে বড়, একটু খুঁড়িয়ে হাঁটেন, স্থূল নাক, ঘন কালো চুল, অথচ সব মিলিয়ে লাবণ্যে ভরা। হার্মান

আইনস্টাইন এলবার্টের বিয়ে দেখে যাননি—তাঁর মৃত্যু ১৯০২ সালে। আইনস্টাইনের বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন, তাঁর দুই ছাত্র—মরিস সলোভিন আর কনার্ড হাবিখ্ট্।

কোন মধুচন্দ্রিমা হলো না। রেজিস্ট্রি অফিস থেকে চারজনে গেলেন ছোট একটি রেস্তোরাঁতে; খাওয়ার পর নবদম্পতি ছোট একটি নতুন ভাড়া করা ফ্ল্যাটে বাস করতে গেলেন। বিশেষ কিছু ঘটনা সেদিন ঘটল না, শুধু ফ্ল্যাটে এসে দরজা খুলতে গিয়ে আইনস্টাইন দেখেন চাবিটি ভুলে এসেছেন।

বিয়ের প্রথম দিনে চাবি ভুলে আসার কোন মঙ্গল-অমঙ্গল সম্পর্ক আছে কিনা তার বৈজ্ঞানিক যুক্তি নেই। তবে এলবার্ট-মিলেভার দাম্পত্য জীবন সুখের হয়নি। ১৯০৩ থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত দাম্পত্য জীবন চলছে চলবে গোছের চলেছে, তারপর মিলেভা তাঁকে ছেড়ে চলে আসেন সুইজারল্যানডে—আইনস্টাইন তখন বার্লিনে। বারো বছরের দাম্পত্য জীবনের ফসল দুটি সন্তান—বড় ছেলে হান্সের জন্ম ১৯০৩ সালের শেষ দিকে, দ্বিতীয় ছেলের জন্ম ১৯১০ সালের জুলাই মাসে—আর তাঁর বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। রোজগার বাড়েনি, সংসার বেড়েছে ; অন্যদিকে মিলেভা গৃহিণী হিসেবে চালাক-চতুর নন, লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, সংসার সম্পর্কে ধারণা কম ; গণিতজ্ঞ, তবু হিসেব করে চলা জানেন না। স্বামীর কাজে, ফিজিক্স-এ যতটা কৌতূহল-অনুরাগ, তত ইনটারেস্ট-অনুরাগ নেই সংসারের হাল ধরতে। অলিম্পিয়া একাদেমির অভিজ্ঞতা কাজে লাগে না। মিলেভা সুগৃহিণী নন, তবু আইনস্টাইনের মতে তাঁর গলার স্বর কী যে মধুর। বারো বছরের দাম্পত্যজীবনে মিলেভার মধুর স্বর আইনস্টাইনকে কী সাহায্য করেছিল জানা যায় না। এ বিষয়ে আইনস্টাইন আর মিলেভা দুজনেই বিস্ময়করভাবে নীরব থেকে গেছেন ; শুধু জানা যায় যে, এই বারো বছরের জীবনে আইনস্টাইন তার বিস্ময়কর তিনটি নতুন তথ্য ১৯০৫ সালে প্রকাশ করলেন, আর সাধারণ আপেক্ষিকবাদের সূচনা এ যুগেই।

এ সময়ে আইনস্টাইনের অন্তরঙ্গ সঙ্গী তাঁর বোন মাজার স্বামী পল উইনটেলারের বোনের স্বামী মাইকেল এঞ্জেলো বেসো। বেসোর কাছে লেখা চিঠিতে জানা যায় ১৯০৯ সাল থেকে আইনস্টাইনের দাম্পত্য জীবনে চিড় ধরেছিল। ছোট ছেলে অসুস্থ, অর্থের আমদানি কম, উপার্জনের উদ্যমও কম। পেটেনট্ অফিসের মাইনে সামান্য বাড়লেও প্রমোশন হয়নি। ডিরেক্টর মনে করেন আইনস্টাইনের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ জ্ঞান কম। আইনস্টাইনের আছে বিজ্ঞান, আছে তত্ত্বগঠনের উৎসাহ, সংসারের দিকে উদাসীন হবার প্রচেষ্টা। মিলেভার ভুয়ো-দর্শনের অভাব, অভাব গৃহিণীপনায়। সম্ভবত মিলেভা জর্জ বার্নার্ড শ'-এর মেজর বারবারা নাটক পড়েননি—যেখানে শ' বলেছেন, 'The true artist will let his wife starve"। আইনস্টাইন আর্টিস্ট—বিজ্ঞানের নতুনপথের শিল্পী। তাঁর নিরঙ্কুশ হবার অধিকার ছিল। সেই নিরঙ্কুশত্বের দৃশ্যের অভাবে সে যুগে আইনস্টাইনের ছাত্রবন্ধুরা সমবেদনায় পরবর্তীকালে যে স্মৃতিচারণ করে গেছেন, সেখানে দেখা যায়, আইনস্টাইন এক হাতে ছোট ছেলেকে সামলে, বড় ছেলের নানা প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে অন্য হাতে লিখে চলেছেন। আরেক জন বলেন, তিনি এক হাতে ছোট ছেলের দোলনায় দোল দিতে দিতে বই পড়ে চলেছেন ; মুখে সিগার। ঘরে স্টোভ ধোঁয়া উদ্গিরণ করে চলেছে। এ সব দৃশ্য বর্ণনায় মিলেভা উপেক্ষিতা, তাঁর কথা নেই।

দৃশ্যে মিলেভা নেই, তেমনি নেই তাঁর তিনটি নতুন তত্ত্ব আবিষ্কারের প্রস্তুতির ঘোষণা। ১৯০৫ সাল। আইনস্টাইনের বয়স ছাব্বিশ। প্রথম যুগের তাপগতি-বিজ্ঞানের পেপার-

গুলি সমন্বয় করে ষষ্ঠ পেপারটি প্রকাশ করেছেন। গ্র্যাজুয়েট হবার পর ডক্টরেট থিসিস ছাড়া পাঁচ বছরের ফসল তাঁর ঐ ছয়টি পেপার। অন্য দিকে বিজ্ঞান জগতে গুমোট আবহাওয়া—অগ্রগতির পথে বাধা পুরনো চিন্তা ; আর নতুন তথ্যে সমন্বয় নেই, সামঞ্জস্য নেই, বিশেষত্ব প্রকাশের সম্ভাবনা নেই।

হঠাৎ গুমোট কেটে যায়। বদ্ধ হাঁফধরা আবহাওয়া হালকা হয়ে ওঠে। সির-সির করে হাওয়া বয়, গাছের পাতা শন-শন করে হেসে বলে, গতি আছে। নদীতে স্রোত জাগে, ঢেউ ওঠে, পাখিরা মাছেরা, আকাশে জলে ওলট-পালট খায়। বাতাসে ভেসে আসে নতুন পথের ইশারা, নতুন ফুলের সুবাস। অগ্রগতি চলতে থাকে। তেমনি, ১৯০৫ সালে Annalen der Physik-এর ১৭শ ভল্যুমে আইনস্টাইন প্রকাশ করলেন তাঁর তিনটি রচনা আর ১৮শ ভল্যুমে চতুর্থটি। ছোট চারটি রচনা যেন চারদিকের জানলা খুলে গুমোট ঘুচিয়ে ঘর হাওয়ায় ভরে দেয়। বিজ্ঞানের নতুন পথের আভাস জাগে;সামনে সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ। প্রথম পেপার আলোর গঠন ও শক্তি সম্পর্কে। দ্বিতীয়টি জানাল এটমের আকৃতি ও পরিমিতি মাপার বহুবিধ রীতি আর নিয়ম। তৃতীয় ব্রাউনিয়ান মুভমেনটের নতুন ক্রমবিকাশ আর চতুর্থটি তাঁর সুবিখ্যাত আপেক্ষিক তত্ত্ব।

আলো, এটম, ব্রাউনিয়ান মুভমেনটে মলিকুল আর সবার উপর আপেক্ষিকতত্ত্বে গতিশীল বস্তুর উপর তড়িৎ-গতি-বিজ্ঞানের প্রয়োগ। যে ক্যানভাসে আইনস্টাইন তাঁর নব বিজ্ঞানের ছবি আঁকলেন তার বিশালত্ব আর মহত্ব বুঝি অসীম এবং অনির্বচনীয়। সবই ঘটে যায় একটি বছরে— ১৯০৫ সালে।

এরও প্রস্তুতি ছিল। ছিল মনে মনে ছবি আঁকা, কাগজে-কলমে আঁকিবুঁকি টানা। পুরনো রীতিকে আত্মস্থ করা, নতুন পথের সন্ধানীদের বুঝতে চাওয়া—আর সবার উপর কল্পনা শক্তি আর সৃষ্টি সুখের উল্লাস। আইনস্টাইন পুরনো রীতিতে এক নতুন রঙরেখা, একটি বিশেষ মাত্রা যোগ করে দিলেন। পুরনো রীতি তখন বিশিষ্ট হয়ে নতুন হয়ে সেজে দাঁড়ায়। এখানে আইনস্টাইন সাহসী, বলিষ্ঠ কল্পনার উদ্গাতা। যেমন শিল্পগুরু নন্দলাল বসুর আঁকা 'কৈকেয়ী' ছবিটি। রাজনন্দিনী রাজমহিষী কৈকেয়ীর দুঃখ-গর্বিত চেহারাটি রঙে রেখায় ফুটে উঠেছিল—তবু সেই ছবিটি বিশিষ্ট নয়, নয় নির্দেশিত, কারণ ছবিতে নেই কৈকেয়ীর নিয়তি, তার বিবেক এবং নেই সময়ের কশাঘাতের ইঙ্গিত। গুরু অবনীন্দ্রনাথ সে ছবিতে এঁকে দিলেন মন্থরার মুখ, যে মন্থরা কৈকেয়ীর ভূত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ, তার নিয়তি, তার কালচক্রের নিয়ামক। আইনস্টাইন বিজ্ঞানের অগ্রগতির অনন্ত সম্ভাবনার পথে নির্দেশনা এনে দিলেন ; সম্ভাবনার বিকল্পকে সীমাবদ্ধ করে দিলেন। এখানেই আইনস্টাইনের মৌলিকতা। ঐতিহ্যের গভীর উপাদানগুলিকে সেই মৌলিকতার গঠনে তিনি নিয়োগ করলেন। আর এই গঠন গড়া হলো বিশ্ববিদ্যালয় এবং লেবরেটরির সাহায্য ছাড়া—কেবলমাত্র কাগজ আর পেন্সিলে।

১৯০৫ সালের অবিশ্বাস্য ঘটনার উল্লেখ করে লুই দ্য ব্রলী (Louis de Broghlie) বললেন, "অন্ধকার রাত্রে সহসা অল্পক্ষণের জন্য প্রখর আলোয় বিশাল অজানা দিগন্ত উদ্ভাসিত করা প্রোজ্জ্বল হাউই।" সেই রকেটের, হাউইয়ের আলোয় পথ দেখা গেল। ভল্যুম ১৭ তে প্রথম তিনটি পেপারের প্রথমটি, যেটিতে এটমের মাত্রা মাপের কথা বলা হয়েছে, সেটি তাঁর অন্যান্য পেপারের তুলনায় সাধারণ। আইনস্টাইন এই পেপারটিতে তাঁর ডক্টরেট থিসিসের বিষয়টির নতুন করে আলোচনা করলেন। অত্যন্ত গাণিতিক এই রচনা ডিফারেনশ্যল সমীকরণে, ইকুয়েশনে গড়ে তোলা বিশ্লেষণমূলক মেকানিক্সের বিষয়বস্তু—যা পড়ে তাঁর থিসিসের পরীক্ষক প্রফেসর বুর্খার্ড্ট্ (Burkhardt) তাঁর গাণিতিক প্রয়োগের দক্ষতা দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন।

দ্বিতীয় পেপারটি ব্রাউনিয়ান মুভমেনটের উপর কাজ—এই কাজ তাঁর আগের বিভিন্ন প্রকাশিত পেপারের পরবর্তী ধাপ। যে সাংখ্যায়নিক ধারণা আইনস্টাইন তাঁর ষষ্ঠ পেপারে প্রয়োগ করেছিলেন, সেই সাংখ্যায়নিক স্ট্যাটিস্টিক্যাল তাপ গতিবিজ্ঞান-এর প্রয়োগে তিনি জানালেন কোন্ কোন্ বিশেষ অবস্থায় আণবিক পরিচলন বা মুভমেনটকে শুধু যে অণুবীক্ষণে দেখা যাবে তা নয়, একটি নির্দিষ্ট ভল্যুমে তাদের ভর এবং সংখ্যাও জানা যাবে। এই পেপারে আইনস্টাইন এটম তত্ত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন,—যে সংশয় দ্বিধা মলিকুল ও এটমকে মেনে নিতে পদার্থবিদ্‌দের মনে ছিল, তার সম্পূর্ণ দূরীকরণ সম্ভব হলো। মাক এবং অস্টওয়াল্ডের মতো এটম তত্ত্ব-বিরোধীরা আইনস্টাইনের যুক্তি ব্যাখ্যা পড়ে ধর্মান্তরিত হলেন। পরমাণুর স্থান ফিজিক্স-এ পাকাপাকি হয়ে দাঁড়াল।

আইনস্টাইন এটমের উপস্থিতি জানালেন, সেই উপস্থিতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, পরীক্ষায় পাওয়া ফল নয়, সম্পূর্ণ তত্ত্বভিত্তিক। তাঁর তত্ত্বের প্রমাণ হলো তিন বছর পর ১৯০৮ সালে; প্যারিসে জাঁ পেরিন ও তার পরে শিকাগোতে ফ্লেচার ও মিলিকনের হাতে। আইন-স্টাইনের তথ্যভিত্তিক তত্ত্বে পাওয়া গেল ভবিষ্যতের তত্ত্বের সূচনা, নতুন তথ্য পাওয়ার ইঙ্গিত। মেক্সওয়েলের বিদ্যুৎ চুম্বক তরঙ্গতত্ত্বের মতো তাঁর তত্ত্ব সুদূরপ্রসারী দুরবগাহ পথের দিশারী। আর ভল্যুম ১৮ তে প্রকাশিত তাঁর প্রথম পেপারে আইনস্টাইন প্রচলিত ধারণা ভাঙলেন।

এই বিখ্যাত পেপারটিকে সংক্ষেপে বলা হয় ফোটোইলেকট্রিক পেপার—আলোক তড়িৎ

পেপার ; আইনস্টাইন এটিকে বললেন, 'On a Heuristic viewpoint concerning the production and transformation of light." Heuristic শব্দটি গ্রিক Heuriskin শব্দটি থেকে গড়া। গ্রিক শব্দটির অর্থ দেখা বা খোঁজা। Heuristic শব্দটির অর্থ ন্যায় শাস্ত্র বা Logic-এর মতো অনুসন্ধানমূলক বা আবিষ্কারমূলক। আইনস্টাইনের পেপারটির শিরোনামের অর্থ হলো "আলোর উৎপাদন ও পরিবর্তন সম্পর্কে এক অনুসন্ধানমূলক দৃষ্টিভঙ্গি।"

আলোকে নিউটন ভাবতেন কণা। প্রায় একই সময়ে হাইগেন্‌স্ আলোর তরঙ্গতত্ত্ব ঘোষণা করলেন। উনবিংশ শতাব্দীতে ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্বে আলোর তরঙ্গতত্ত্বের সুষম ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। অথচ প্রায় একই সময়ে হের্টৎস আলোকতড়িৎ ফলের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তরঙ্গতত্ত্বে সমাধান পেলেন না। কোন কোন ধাতুর উপর আলো পড়লে বিদ্যুৎ পাওয়া যায়, তবু তার কারণ কী জানা গেল না। ম্যাক্সওয়েল বিদ্যুৎ চুম্বক তত্ত্বের ঘোষণা করেছেন—এই তত্ত্বের প্রয়োগ আলো বা অন্যান্য রশ্মিতে প্রয়োগ করা যাচ্ছে। অন্য দিকে ইংলনডে জে. জে. টমসন আর হল্যানডের লেইডনের লরেন্স ইলেকট্রন কণার অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন। এ সবই ঘটে ১৯০০ সালের আগে। আর ১৯০০ সালে জার্মানির লেনার্ড (Lenard) আলোকতড়িৎ ফলের এক সাদাসিদে সহজ সরল ব্যাখ্যা দিলেন। তিনি বললেন, আলোর আঘাতে ধাতু থেকে ফটো ইলেকট্রন বা নেগেটিভ চার্জের মুক্তি ঘটে। আরো কিছু পরে তিনি বললেন, আলোর আঘাতে যখনই ইলেকট্রনের মুক্তি ঘটে, তখন আলোর শক্তি বাড়ালে, ঔজ্জ্বল্য বাড়ালে ইলেকট্রনের মুক্তির ধারা বাড়বে—বেশি বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে। বাস্তবে কিন্তু তা পাওয়া গেল না। দেখা গেল আলোর বর্ণালীর পরিবর্তনের সঙ্গে অথবা আলোর তরঙ্গের কম্পাঙ্ক বা ফ্রিকোয়েন্সির পরিবর্তনের সঙ্গে বিদ্যুৎশক্তির সম্পর্ক আছে—সম্পর্ক নেই ঔজ্জ্বল্যের। কম্পাঙ্ক বাড়লে ইলেকট্রনের মুক্তি বেশি হয়, তড়িৎশক্তি বেশি পাওয়া যায়।

অন্য দিকে ম্যাক্সওয়েলের তরঙ্গে গড়া বিকিরণের বর্ণালীর সুষম ব্যাখ্যা দেওয়া যাচ্ছে না। দৃশ্য বর্ণালীর এক পাশে লাল, অন্য পাশে বেগুনী। তারপরেও দুপাশে পাওয়া যায় আরো অন্যান্য তড়িৎ চুম্বকতরঙ্গ—অবলাল বা Infra-red, এক্স-রে, গামা-রে ইত্যাদি অথবা অতি বেগুনী বা ultra-violet এবং অন্যান্য বৃহৎ দৈর্ঘ্যের তড়িৎ-চুম্বক তরঙ্গ। ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আচার ব্যবহার জানা যাবে ভীনের (Wein) ফর্মুলায় আর বৃহৎ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের জন্য রইল রেলে-জিনসের (Rayleigh-Jeans) ফর্মুলা ; বিকিরণের পরিবেশনের ধারা একটি মাত্র রীতি বা ফর্মুলায় জানা যাচ্ছে না—এই সমস্যার সমাধানে বিজ্ঞানীরা ব্যস্ত। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক কিরশফ এ সমস্যার সমাধানে কাজ করেন—অনেক তথ্য যোগাড় হয়, পাওয়া যায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার অনেক ডেটা। ১৮৮৭ সালে কিরশফের মৃত্যুর পর মাক্স প্লাঙ্ক

অধ্যাপকত্ব পান। তাঁরও একই কাজ—বিকিরণের ধারার সুসমঞ্জস ব্যাখ্যা ; একটি নিয়মে বিকিরণের পরিবেশনার রীতিকে জানা—একটি ফর্মুলায় পরিবেশনটিকে বাঁধা। ১৮৯০ সাল থেকে প্লাঙ্ক কাজ করেন। ১৯০০ সালের ১৪ই অক্টোবরে বার্লিন ফিজিক্যাল সোসাইটিতে তিনি একটি উপপত্তিতে বিকিরণের বিকাশের ধারার সম্ভাব্য নীতির কথা জানালেন।—তাঁর উপপত্তির ব্যাখ্যায় ভীন ও রেলের ফর্মুলার গাঁটছড়া বাঁধা সম্ভব হলো। প্লাঙ্ক তাঁর উপপত্তিটি নিয়ে আরো চিন্তাভাবনা করেন। অবশেষে হঠাৎ তিনি বিকিরণের ধারার মূলসূত্রটি খুঁজে পান। বিকিরণের ধারা নিরবচ্ছিন্ন নয়, অবচ্ছিন্ন। বিকিরণ ঝলকে ঝলকে বেরোয় ; বৃষ্টির ধারার মতো মনে হয় এ ধারা নিরবচ্ছিন্ন , তবু থাকে বিচ্ছিন্নতা, অবকাশ বা ফাঁকি। এই বিকিরণের ঝলক বোঝাতে প্লাঙ্ক একটি লাটিন শব্দ ব্যবহার করলেন, কোয়ানটা (quanta) যার মানে কতটা। এই কোয়ানটার সাইজ নির্ভর করে বিকিরণের বিদ্যুৎ চুম্বক তরঙ্গের কম্পাঙ্কের ফ্রিকোয়েন্সির উপর। ফ্রিকোয়েন্সি বাড়লে কোয়ানটা বাড়ে। ১৯০০ সালের ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে বার্লিনের ফিজিক্যাল সোসাইটিতে প্লাঙ্ক তার যুগান্তকারী কোয়ানটা তত্ত্ব জানালেন। বললেন বিকিরণের শক্তি যদি হয় E, তবে এটি ফ্রিকোয়েন্সির উপর নির্ভর করবে। E হবে h-vএর সমান। যেখানে v বিকিরণের তরঙ্গের দৈর্ঘ্য আর h একটি ধ্রুবক, যাকে বলা হলো প্লাঙ্কের ধ্রুবক , এটির মান $h = 6{\cdot}6 \times 10^{-27}$ erg-sec।

প্লাঙ্কের বৈপ্লবিক ঘোষণাব মধ্যে বিকিরণের মূলে কণার আবির্ভাবের কথা নিহিত। তবু প্লাঙ্ক সেটি ঘোষণা করতে পারলেন না। তিনি বললেন, তাঁর তত্ত্ব বস্তু বা মেটার ও বিকিরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ—বিকিরণ কীভাবে পরিচালিত হচ্ছে সেই গতিপথের ব্যাখ্যায় তাঁর তত্ত্ব খাটবে না। অর্থাৎ প্লাঙ্কের বিকিরণের কণার ঝলক কোন এক অবস্থায় তরঙ্গ হয়ে বয়ে যাবে। কারণ, বিকিরণের তরঙ্গরূপ ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্বে প্রমাণিত। কণার ঝলক তরঙ্গ হবে আবার যখন ধরা পড়ে তারা তখন কণা—এ তথ্যের বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা প্লাঙ্কে নেই।

১৯০৩ সালে জে. জে. টমসন আরেক ধাপ এগিয়ে এলেন। তাঁর ধারণায় বিকিরণের শক্তি সীমাবদ্ধ অবস্থায় যে রূপ পায় সেটি পরীক্ষায় পাওয়া অনেক অর্থের সুষম ব্যাখ্যা দিতে পারবে। অর্থাৎ বিকিরণের তরঙ্গ সীমাবদ্ধ আঁটসাঁট স্থানে এমন কিছু অবস্থা পাবে, যার শক্তির ধাক্কায় ধাতু থেকে ইলেকট্রন বেরিয়ে আসতে পারে।

১৯০৫ সালের আগে জানা গেল লেনার্ডের তত্ত্ব আর মাক্স প্লাঙ্কের ঘোষণা। তা ছাড়া পরীক্ষাতে পাওয়া অনেক তথ্য যার ব্যাখ্যা সে যুগের বিজ্ঞানের কাঠামোতে নেই। লেনার্ড আর প্লাঙ্ক—তুজনে বিকিরণের কথা বললেন—তবুও বিকিরণটি নির্দেশিত হলো না ; তার বৈশিষ্ট্য স্থিরভাবে জানা গেল না। যে বৈপ্লবিক বিদ্রোহী

মনোভাব এ দুটি চিন্তার বিশ্লেষণের ফলে সামঞ্জস্য আনতে পারতো—সে চিন্তা বা কল্পনার এবং সাহসের উপস্থিতি বিজ্ঞান জগতে তখন উপস্থিত নয়।

১৯০৫ সাল। এর আগে আইনস্টাইন শুধু তাপগতি বিজ্ঞান নিয়ে কাজ করছেন; চিন্তা করছেন। তাঁর প্রকাশিত বিভিন্ন পেপারে সেই প্রমাণ। কবে যে তিনি বিকিরণের তত্ত্বে কৌতূহলী হয়ে অনুসন্ধান করতে শুরু করেছিলেন সেটি সুস্পষ্ট নয়। বন্ধু হাবিথ্টকে তাঁর নতুন এক চিন্তার উদ্ভাসনের আভাস চিঠিতে জানিয়েছিলেন। তবু তাঁর বিকিরণের ঘোষণাটি প্রায় বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো ঘটে গেল। নিউটনের কণা তত্ত্ব এবং ফ্যারাডে ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎচুম্বক তত্ত্ব সনাতন বিজ্ঞানের সূত্র। আর আছে লেনার্ডের আলোক তরঙ্গের বা বিকিরণের ধাক্কায় ইলেকট্রনের মুক্তির ব্যাখ্যা, প্লাঙ্কের সীমাবদ্ধ স্থানে বিকিরণের ধারায় অবিচ্ছিন্নতার বোধ। এবং কিছু পরীক্ষায় পাওয়া ফলাফল যার ব্যাখ্যা জানা নেই—যেমন কম্পাঙ্ক বাড়লে ইলেকট্রনের মুক্তি বাড়ে। এরই সঙ্গে যোগ হল আইনস্টাইনের নিজের চিন্তা যা তিনি তাপগতিবিজ্ঞানে প্রকাশ করেছেন, বস্তু বা মেটার কণায় গড়া, ঐ কণা—এটম আর মলিকুল। এবং প্লাঙ্কের সমীকরণে একটি আভাস, কম্পাঙ্ক বা ফ্রিকোয়েন্সি বাড়লে শক্তির কোয়ানটা বাড়ে কারণ E=h-v।

এই সব কিছুর সমন্বয় আইনস্টাইন করলেন, উপরন্তু মন্থরার মুখটি এঁকে বিকিরণকে নির্দেশিত করলেন—সম্ভাবনার বহুধা বিকল্পকে সুনিশ্চিত করলেন।

আইনস্টাইন বললেন, আলো—কণা এবং আলো বা বিকিরণ কণার ধারা নিরবছিন্ন নয়, প্লাঙ্কের কোয়ানটাম তত্ত্বের মতো বিচ্ছিন্নভাবে প্রবহমান। সুতরাং প্লাঙ্কের তত্ত্ব অনুযায়ী এই কোয়ানটার তরঙ্গ ফ্রিকোয়েন্সি কমলে যে শক্তি পাওয়া যাবে তা কম, এবং ফ্রিকোয়েন্সি বাড়লে শক্তি বাড়ে। এই শক্তি নিয়ে আলো কোয়ানটা যখন ধাতুতে আঘাত হানে তখন ইলেকট্রন বেরোবে। জোরে এলে পাওয়া যাবে বেশি ইলেকট্রন, আস্তে এলে কম। আইনস্টাইন আলোকে কণারূপে প্রতিষ্ঠা করলেন।

যা ছিল অগোছাল, তাই গুছিয়ে তুললেন আইনস্টাইন। দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হলো। আলো হাইগেন্সের তরঙ্গ নয়, নয় ফ্যারাডে-ম্যাক্সওয়েলের তরঙ্গ। নতুন আলোর তত্ত্বে আছেন নিউটন, ম্যাক্সওয়েল, এবং লেনার্ড, প্লাঙ্ক ও টমসন। আর এইসব বিবিধ মতের বিবিধ ধারণার সমন্বয় করলেন আইনস্টাইন। এক ধাক্কায় আইনস্টাইন প্রপঞ্চময় জগৎ থেকে বিজ্ঞানকে নিয়ে গেলেন উপলব্ধির জগতে। যেখানে আলো হবে কোয়ানটা, যার রূপের ধারণা পঞ্চেন্দ্রিয়ে নেই। অথচ তার অনুসন্ধানের পক্ষে দৃষ্টিভঙ্গির সূত্রে যে গাণিতিক ছক পাওয়া গেল, তা সেকালীন পরীক্ষায় পাওয়া সব তথ্যকে প্রমাণিত করতে পারছে এবং দিতে পারছে নতুন তথ্য ও তত্ত্বের ঘোষণা। এরাও প্রমাণিত হলো ভবিষ্যতে।

প্লাঙ্কের গণিত $E = h\text{-}v$ এর প্রভেদ ঘটালেন আইনস্টাইন। আইনস্টাইন বললেন, আলো যে শুধু কোয়ানটা আকারে নির্গত হবে তা নয়, এর প্রবাহ হবে কোয়ানটা আকারে। প্লাঙ্কের কোয়ানটার শক্তি $h\text{-}v$; আইনস্টাইনের মতে তার কিছুটা ব্যবহৃত হবে এটম থেকে ইলেকট্রন বের করতে আর বাকিটুকু ব্যবহৃত হবে ইলেকট্রনের গতি দিতে, ইলেকট্রনের গতি মানে বিদ্যুতের কারেনট্। আইনস্টাইন তাঁর গণিতের ছকে বললেন $h\text{-}v = P + \frac{mv^2}{2}$ যেখানে P হবে এটম থেকে ইলেকট্রন বের করার শক্তি ; v সেই ইলেকট্রনের গতি। $\frac{mv^2}{2}$ অংশটি যে কোন বস্তুর কাইনেটিক বা গতির শক্তি জানাচ্ছে। অর্থাৎ আইনস্টাইন প্লাঙ্কের কোয়ানটার জগতের সঙ্গে মিল ঘটালেন গতির জগতের সঙ্গে যা নিউটনের সৃষ্টি। আলোর কণাকে নিউটন বলেছিলেন, কোর্পাসকল্ (corpuscle), আইনস্টাইন এই কোয়ানটার নাম দিলেন, "আলোর তীর" (Light arrow)। এই আলোর তীরের কণাধর্ম আছে, সেকালীন আলোর তরঙ্গ রূপের ধারণার যেটি নিশ্চিত ব্যতিক্রম।

আলোর গুণ বা চরিত্র বর্ণনা কালে আইনস্টাইনের খোলা মন—সংস্কারের বাধা নেই। যুক্তি তথ্য এবং সজ্ঞাত জ্ঞান বা ইনটুইশন—এই তিনটির উপর তাঁর তত্ত্ব গড়ে উঠল। আইনস্টাইনের ধারণায় প্রকৃতির রাজ্যে আকস্মিকতা নেই, নেই একসিডেনট্। আলোক-তড়িৎ ফলের ব্যাখ্যায় আলো কণা, তবু প্রকৃতির নিয়মের মূল সূত্রটি তখন জানা যায়নি। সেকালীন তরঙ্গ তত্ত্বের ব্যতিক্রম নয় তাঁর কণাতত্ত্ব। আলোর কোয়ানটার আরো কিছু অজানা গুণধর্ম আছে, যা তখনো অজানা, প্রয়োজন আরো পরীক্ষার, আরো তথ্যের।

আইনস্টাইন বলেন, তথ্যভিত্তিক যুক্তি সম্মত ধারণায় আলোর কণাধর্ম নিশ্চিত প্রতিষ্ঠিত। কৈকেয়ী আলো মন্থরা কোয়ানটার উপস্থিতিতে কণারূপে নির্ধারিত হলো।

১৯০৫ সালে Annalen der Physik-এর ১৭শ এবং ১৮শ ভল্যুমে আইনস্টাইনের চারটি পেপার প্রকাশিত হয়। তিনটি ভল্যুম ১৭তে এবং চতুর্থটি ভল্যুম ১৮তে। চতুর্থ পেপারটি, ভল্যুম ১৮তে প্রকাশিত তাঁর পেপারটিতে আলোর নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর কথা আইনস্টাইন জানালেন—এই ভল্যুমের ১৩২ থেকে ১৪৮ পাতার মধ্যে। যুগান্তকারী চিন্তা। যেন বিজ্ঞানের নদীতে ঢল নামে। তবুও বন্যা প্লাবনের দেখা নেই। প্লাবন এল তাঁর ১৭শ ভল্যুমে প্রকাশিত তৃতীয় রচনাটিতে—শিরোনাম "On the electrodynamics of moving bodies"—"গতিশীল বস্তুর তড়িৎগতি বিজ্ঞান সম্পর্কীয় রচনা।" পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮৯১-৯২১, অর্থাৎ মাত্র ৩১ পাতার রচনা। পরবর্তীকালে বিজ্ঞানী ওপেনহাইমার এই রচনাটির উল্লেখ করে তাঁর বিখ্যাত বই "The Flying Trapeze—Three Crisis of Physicists-এ একটি সংহত লাইনে বললেন, magni-

ficently precise and beautiful science (একটি অপূর্ব বাহুল্যহীন নির্দেশ, একটি মধুর বিজ্ঞান)। এই রচনাটি একটি নির্দেশ, একটি সুস্পষ্ট, যথাযথ অথচ সতর্ক, বাহুল্যহীন পথের ইঙ্গিত। একটি বিশেষ বিশিষ্ট জ্ঞান। বিজ্ঞানের সৌন্দর্যের নির্ভুল দিগ্‌দর্শী। মানুষের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বাইরের জগতে হাত ধরে অগ্রগতির পথে যে নিয়ে যায়, সনাতন বিজ্ঞানের বদ্ধ জলাশয়ে দুকূল প্লাবী প্লাবনের সূচনাকারী সেই বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব।

১৬৬৬ সালে মহামারী প্লেগে যখন ইংলনড্ বিপর্যস্ত সেইসময়ে কেম্ব্রিজ থেকে লিঙ্কনশায়ারের পৈতৃক বাড়িতে পালিয়ে এলেন বাইশ বছরের আইজাক নিউটন। গ্রীষ্মের সুদীর্ঘ দিন বিজ্ঞানের নানা সমস্যার সমাধানে নির্জনে একান্তে কেটে যায়। আর এই একান্ত নির্জনতার দিনগুলিতে নিউটন তাঁর তিনটি তত্ত্ব খুঁজে পান, যার অন্যতম ও শ্রেষ্ঠতম হলো মহাকর্ষ বা মাধ্যাকর্ষণ সূত্র। আপেল কেন মাটিতে পড়ে, চাঁদ কেন ঘোরে পৃথিবীর চারদিকে, গ্রহ-নক্ষত্রের পথ, প্রাণী-মানুষের গতি, বস্তুর পরিচলন, এমনকি আলোর সংক্রমণ কেন হয়, কী তার বিশেষত্ব, একটি সহজ সরল নিয়মে নিউটন জানালেন। সেটি মাধ্যাকর্ষণের সূত্র। একটি গণিতের ছকে সেকালীন জাগতিক গতির স্বভাবকে বাঁধা গেল—সেটি মাধ্যাকর্ষণের গণিত। এই সূত্র ও গণিত যে ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে সেটি হলো চরম, পরম, এবসল্যুট (absolute) দেশ বা স্পেসের (space) এবং পরম বা এবসল্যুট সময়কাল বা time-এর ধারণার উপর। দেশ এবং কাল এ দুটি স্বাধীন, স্বনির্ভর, সুনির্দিষ্ট। পরম দেশের গতি নেই, পরিবর্তন নেই। পরম কালের প্রবাহে নেই অসাম্য পরিবর্তনের ধারণা। আপেক্ষিক গতি বা সময়ের ধারণা হবে এই পরম বা চরম স্পেস ও সময়ের সাপেক্ষে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে নিউটনের পরম তত্ত্বের ধারণায় সংশয় দেখা দেয়। কিরশফ, যিনি কোয়ানটাম তত্ত্বের পথ গড়েছিলেন, তিনি পরীক্ষা থেকে পাওয়া নানা তথ্যের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে পরম তত্ত্বের বাধায় প্রতিহত হলেন। আর্নস্টমাক, যিনি আইনস্টাইনের শিক্ষক, তিনি পরম তত্ত্বের দার্শনিক বিশ্লেষণে বললেন "এদের উপস্থিতি নেই প্রপঞ্চের জগতে, এরা ভাববাদের ধোঁয়ায় গড়া মানব মনের কল্পনা।" গাণিতিক পোঁয়াকার বললেন, 'পরম তত্ত্ব মানুষের চেতনার রঙে রাঙানো রঙীন কল্পনা বিলাস।' এঁরা পরম তত্ত্বকে স্বীকার করতে চাইলেন না—কারণ প্রচলিত প্রমাণিত তথ্যগুলির ব্যাখ্যা পরম তত্ত্বের সাপেক্ষে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। আর সবার বড় বাধা মাইকেলসন-মরলের আলোর গতি নিয়ে পরীক্ষা।

ফ্যারাডে ইতিমধ্যে তড়িৎ আর চুম্বক তত্ত্বের কথা জানিয়েছেন। তাদের মিল দেখেছেন—দেখেছেন একটি শক্তির পরিবর্তনে অন্য শক্তির প্রাপ্তি—তড়িৎ ক্ষেত্রে পাওয়া যাবে চুম্বক শক্তি আবার চুম্বক ক্ষেত্রে তড়িৎ। ফ্যারাডে তাঁর শক্তির আকর্ষণ বিকর্ষণ ধারায় শক্তির

তারতম্যের বোধে আনলেন Field বা ক্ষেত্রের ধারণা। ক্ষেত্র বোঝায় উষরতা, উর্বরতা, ক্ষেত্রের সীমায় গতির সচলতা। ম্যাক্সওয়েল ফ্যারাডের ক্ষেত্রতত্ত্বটিকে গণিতের ছকে বাঁধলেন, তাকে নতুন রূপ দিলেন, এল তড়িৎ চুম্বক শক্তি, তড়িৎ চুম্বক তরঙ্গ। বর্ণালীর কারণ জানা গেল, পাওয়া গেল রেডিও তরঙ্গ। ক্ষেত্রের বিশৃঙ্খলায় তরঙ্গের সৃষ্টি। নদীতে ঢেউ জাগে, কারণ হাওয়ার এলোমেলো পাগলামো ; সুরের পরিবর্তন হয়, কারণ কম্পনের হারের ব্যতিক্রম। ক্ষেত্র আছে বলেই তরঙ্গের গতির প্রয়োজনে থাকে মাধ্যম। মাধ্যমহীন তরঙ্গের গতিবেগের ধারণা নেই। অতএব বিদ্যুৎ চুম্বক তরঙ্গের গতিতে আছে মাধ্যম, যে মাধ্যম ইথার। ইথার যদি মাধ্যম হয় তারও থাকে গতি—সে স্থির নয়। এই ইথারের অস্তিত্ব প্রমাণের চেষ্টা চলে।

নদীতে নৌকো চলে, চলে স্রোতের অভিমুখে বা বিপরীতে এবং স্রোতের আড়াআড়ি। নদীতে গতির সঙ্গে নৌকোর গতির পরিবর্তন হবে। নৌকো জোরে যায় স্রোতের সাহায্যে, ধীরে যাবে যখন সে চলে স্রোতের বিপরীতে। অন্য দিকে আড়াআড়ি যাবার কালে নদীর স্রোতের বেগ নৌকোটির গতিবেগে পরিবর্তন আনবে। অর্থাৎ নদীর স্রোত আছে—তাই নৌকোটির গতিবেগের পরিবর্তনের ধারা থাকে। মাইকেলসন-মর্লে পৃথিবীর বুকে ইথার বায়ুর আভাস মাপতে এই নৌকোর গতির পরীক্ষাটি আনলেন। নৌকো এখানে আলো যার গতি সেকেনডে 3×10^8 মিটার। এই গতিতে আলো পাঠান হলো নির্দিষ্ট সমদূরত্বে পৃথিবীর গতির সমান্তরে এবং আড়াআড়ি ভাবে ; এবং তাদের ফিরিয়ে আনা হলো। ইথারের গতি থাকলে এই যাতায়াতের দুমুখো পথে সময়ের পরিবর্তন পাওয়া যাবে। অথচ পরীক্ষায় কোন পরিবর্তন পাওয়া গেল না। আলোর গতির কোন পরিবর্তন ইথারের গতি সাপেক্ষে পাওয়া গেল না।

কেন পাওয়া গেল না তার কারণ খুঁজতে তিনটি সম্ভাব্য সমাধান পাওয়া গেল। এক, পৃথিবীর গতি নেই। এ তত্ত্ব কোপারনিকাসের তত্ত্বের বিচ্যুতি। অতএব এটি নাকচ হলো। দুই হলো, ইথার পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে জড়াজড়ি হয়ে চলে। এ তত্ত্বও নাকচ হলো, কারণ জ্যোতির্বিদ্ জেমস ব্রেডলির পরীক্ষায় তত্ত্বের সুসঙ্গত প্রমাণ পাওয়া গেল না, বরং উল্টো ধারণাটি থাকে। তৃতীয় ধারণা হলো, ইথার বলে কিছু নেই। ইথার নেই ভাবা যায় না, কারণ ইথার না থাকলে তড়িৎ চুম্বক তরঙ্গের মাধ্যম কী? গোটা ঊনবিংশ শতাব্দীর পদার্থবিদ্যার জগৎ দাঁড়িয়ে আছে এই তরঙ্গের গতিময় রূপের কাঠামোতে।

এই দিশেহারা ভাবনার জগতে তিনজন বিজ্ঞানী গণিতবিদ্ একটি তত্ত্বের দুয়ারের চৌকাঠে হাজির হলেন। ট্রিনিটি কলেজের অধ্যাপক ফিটজিরাল্ড বললেন, গতির দিকে সব বস্তুই কিছুটা সঙ্কুচিত হবে।

হল্যানডে লেইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক লরেন্স প্রায় একই সময়ে সঙ্কোচনের ধারণা

আনলেন। লরেন্স ইলেকট্রনের নেগেটিভ চার্জযুক্ত কণার অস্তিত্ব ঘোষণা করেছিলেন। জে. জে. টমসন এটি প্রমাণিত করেন। লরেন্স দেখলেন বিদ্যুৎ চুম্বক শক্তি যে কোন পদার্থের উপর এমন প্রভাব আনে যে, এটি যখন ইথারের মধ্য দিয়ে যাবে, এটির আকৃতির সমতা নষ্ট হবে—কারণ ইলেকট্রন জাতীয় কণাদের নিজেদের মধ্যকার দূরত্বের তফাত ঘটে। বস্তুটির আকারে পরিবর্তন ঘটে। লরেন্স তার প্রস্তাবে কয়েকটি উপপত্তি রাখলেন। এক, তড়িৎ চুম্বক ক্ষেত্রের সমীকরণ সত্য, দুই, নিউটনের বলবিদ্যার আইনের সত্যতা এবং তৃতীয়টি হলো, সব বস্তুই, ইলেকট্রনে গড়া—যে ইলেকট্রন হলো বিদ্যুৎ

লরেন্সের ধারণা মেনে নিলে নদীর স্রোতে আর নৌকোর গতিবেগের মাঝে সাধারণ যোগ বিয়োগ খাটবে না। কোন বস্তর গতিবেগ যদি হয় v প্রতি সেকেনডে তবে এটি t সেকেনডে যাবে vt দূরত্ব। লরেন্স বললেন, এই দূরত্বের মাপ হবে vt কে $\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}$ দিয়ে ভাগ করে, যেখানে c হবে আলোর গতিবেগ। দেখা যাচ্ছে v যদি কম হয় তবে ভগ্নাংশের হরটিকে 1 ধরা যাবে। আলোর গতিবেগ সেকেনডে 3×10^8 মিটার; এটি c। অতএব c^2 হবে 9×10^{16}। v আলোর গতি সাপেক্ষে যথেষ্ট জোরদার না হলে $\frac{v^2}{c^2}$-অংশটি এত ছোট হবে যে এটিকে আমরা নাকচ করতে পারি। আলোর গতির ফলে এই যে সঙ্কোচন এটি শুধু দূরত্বের মাপে নয়, আকারেও হবে।

গণিতজ্ঞ পোঁয়াকার অন্যভাবে বললেন, যদি এই বিশ্ব হঠাৎ মাপে বেড়ে যায়, সব কিছু অংশ যদি সেই অনুপাতে বাড়ে, তবে এই বৃদ্ধির ধারণা আমাদের থাকে না, কারণ সাদৃশ্য ধারণার (Similitude) বোধ। কাজেই কোন দূরত্বের মাপ সঠিক জানা যাবে না—শুধু জানা যাবে যে নির্দিষ্ট রেফারেন্স কাঠামো বা ফ্রেমে এটিকে মাপা যাবে।—অর্থাৎ সব মাপই আপেক্ষিক। ১৯০৪ সালে পোঁয়াকার আরও বললেন, হয়তো এক নতুন মেকানিক্সের জগৎ আমরা তৈরী করতে পারব, যেখানে জাড্য বা Inertia গতির সঙ্গে বেড়ে যাবে—আলোর গতি যেখানে অনতিক্রম্য হয়ে উঠবে।

দর্শন আর বিজ্ঞান মিলিয়ে মাইকেলসন-মর্লের পরীক্ষার আরো একটি সমাধান ভাবা হলো—আলোর উৎসের গতির সাপেক্ষে আলোর গতি সব সময় এক থাকবে। আপাতত মনে হলো এ সম্ভাবনায় সব সমস্যার উত্তর পাওয়া যাবে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এ তত্ত্বও নাকচ করলেন; উৎসের গতির সাপেক্ষে আলোর গতির পরিবর্তন হয় না। পোঁয়াকার আবার বললেন, হয়তো আলোর গতি অনতিক্রম্য এবং সনাতন বিজ্ঞানের কাঠামোর বদল হওয়া দরকার। বললেন, "as yet nothing proves that the principles will not come from the combat victorious and intact—এই অখণ্ড তত্ত্ব আর জয়া-

ভিলাষী প্রতিদ্বন্দ্বীর যুদ্ধে সেই নিয়ম যে পাওয়া যাবে না, এখনো তার কোন প্রমাণ দেখিনে।" সেদিন ১৯০৪ সাল। ফিটজিরাল্ড আর লরেন্স সনাতন বিজ্ঞানের কাঠামোয় মাইকেলসন-মর্লের পরীক্ষা থেকে পাওয়া সমস্যার সমাধান খুঁজছেন-আর পোঁয়াকার পরম স্পেস গড়া সনাতন বিজ্ঞানের কাঠামো থেকে সরে এসে আলোর অনতিক্রম্য গতির সাপেক্ষ নতুন মেকানিক্সের গঠন চাইছেন।

নিউটনের বলবিদ্যায় আছে গতির তুলনা আর ম্যাক্সওয়েলের সূত্রেও থাকে গতি। তড়িৎ চুম্বক ক্ষেত্রের ফ্যারাডিয় চিন্তায় কিছু অসঙ্গতি ছিল; সেই অসঙ্গতি সেদিনের বিজ্ঞানীদের জানা, তবুও প্রকাশ করা হয়নি। আইনস্টাইন প্রথমেই এই অসঙ্গতির কথা তুললেন। আইনস্টাইন বললেন, চুম্বক বা বিদ্যুৎবাহী তারের আবেশে যে বৈদ্যুতিক কারেন্ট্ পাওয়া যাবে সেটি চুম্বক আর তারের আপেক্ষিক গতির উপর নির্ভর করবে; অর্থাৎ বিদ্যুৎ-চুম্বক ক্ষেত্রের বিশৃঙ্খলা থেকে যা পাওয়া যাবে সেটিও আপেক্ষিক। নিউটনের গতি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও আইনস্টাইন পরমস্থির বা এবসল্যুট-রেস্ট এর ধারণা ধ্বংস করলেন; বললেন যে-নিয়ম বিদ্যুৎ গতি-বিজ্ঞান ও নিউটনের আলোক-বিজ্ঞানে প্রযোজ্য সেই একই নিয়ম একই রেফারেন্স ফ্রেমে একই নির্দিষ্ট কাঠামোতে—মেকানিক্সের জগতে খাটবে। আর এই জগতে আলোর গতি একমাত্র অপরিবর্তনীয় ও সর্বোচ্চ। আলোর উৎস বা যে আলো গ্রহণ করছে তাদের উপর আলোর গতি নির্ভর করে না—এক কথায় যে কোন দর্শকের কাছে আলোর গতি অপরিবর্তনীয়।

লরেন্সের সমীকরণ আইনস্টাইনের জগতে থাকে, শুধু রেফারেন্স ফ্রেমের পরিবর্তন ঘটে। আর এই পরিবর্তন ঘটাতে গিয়ে আরো কিছু অদল বদল ঘটে যায়। গতি বা ভেলসিটি হলো দূরত্ব আর সময়ের অনুপাত। দূরত্বকে সময় দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া যাবে গতির মান। আইনস্টাইন আলোর গতি অপরিবর্তনীয় বললেন; অতএব এরই সাপেক্ষে দূরত্ব বা স্পেস এবং সময়—এই দুটি পরিবর্তিত হয়ে যায়। পোঁয়াকারের স্পেস পরম নয়; আইনস্টাইন তার উপরে যোগ দিলেন পরিবর্তনশীল সময়। যে সঙ্কোচন লরেন্সের স্পেসে পাওয়া যাবে, সেই একই সঙ্কোচন, আইনস্টাইনের নতুন ফ্রেমের জগতে, গতির পরিপ্রেক্ষিতে সময়েতেও ঘটে—গতি বাড়লে সময় কমে। এককথায় কোন বস্তু যদি আলোর সমান গতিতে যায়, সে বস্তুর আকার সেই গতিতে থাকে না এবং সময় সেখানে স্তব্ধ।

আইনস্টাইন আরো বললেন, যে জগতে আলোর গতি অপরিবর্তনীয়, সেই সময় ও দেশের পরিবর্তনের সম্ভাবনাময় জগতে কোন অবস্থানে সেই জগতে আলোর চেয়ে বেশি গতি পাওয়া যাবে না এবং যে কোন বস্তুর ভরকে শক্তিতে রূপান্তরিত করা যাবে;—শক্তি পাওয়া যাবে আলোর গতির সাপেক্ষে। E যদি হয় শক্তি, m যদি হয় ভর এবং c আলোর গতিবেগ তবে $E = mc^2$।

আইনস্টাইন পূর্বসূরীদের বিভিন্ন মতবাদের সামঞ্জস্য করলেন। নানা অসঙ্গতির মধ্যে যোগসূত্র খুঁজে আনলেন। লরেন্স ও পোঁয়াকারের চিন্তার মেলবন্ধন ঘটালেন আর আনলেন বিশিষ্টতা, নির্দেশতা—সেটি সময়, যে সময় স্থির নয়, পরম নয়; সে সময় স্রোতের মত প্রবহমান এবং পরিবর্তনীয়; সে সময়কে গতির নিরিখে মাপা যাবে! আইনস্টাইন তত্ত্ব দিলেন। যে তত্ত্বে আছে নিউটনের গতিবিজ্ঞান, ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎ চুম্বক ক্ষেত্র তত্ত্ব। এ ছাড়াও রইল বাড়তি অনেক কিছু। জানা গেল সেকালীন পরীক্ষালব্ধ তথ্যগুলির ব্যাখ্যা, বিশ্বের সম্পর্কে অতিরিক্ত ধারণা। ফিলিপ ফ্রাঙ্ক বললেন, "জানা গেল মহাবিশ্ব সম্পর্কে সহজ সরল সত্য কথাটি।"

কি জানা গেল এবং কি জানা গেল না তার প্রমাণ-আলোচনা চল্লিশ বছর ধরে হলো, তত্ত্বটিকে নানা দিক দিয়ে পরীক্ষা করা হলো। সনাতন বিজ্ঞানকে গ্রহণ করে বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব বিজ্ঞানের পথে এক বিরাট লাফ দিয়েছে—আর সেই লাফ একটি মাত্র মানুষের সাধনায়, সাহসে, কল্পনার বলিষ্ঠতায় ঘটে গেল। আইনস্টাইন এখানে একক অনন্যবিজ্ঞানসাধক শুধু নন, ১৯০৫ সালে তিনি বিজ্ঞানের দ্রষ্টা ও কবি।

১৯০৫ সালে নিজের গবেষণার জগতে তিনি একা, কারো সাহায্য তিনি নেননি। পূর্ব-সূরীদের চিন্তাধারা তার জানা ছিল, সেগুলির পঠন, মনন, নিদিধ্যাসনের ফলে সুপরিকল্পিত ভাবে গ্রহণ করেছিলেন। অথচ তাঁর রচনায় কোন গ্রন্থপঞ্জীর উল্লেখ করেন নি। অন্যদিকে বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ রচনার শেষ ছত্রে জানাচ্ছেন, "এই বিষয়ে সাহায্য করার জন্য আমি আমার বন্ধু ও সহকর্মী এম বেসোর সহায়তা পেয়েছি। কত-গুলো বিষয়ে কিছু কিছু মূল্যবান পরামর্শ-ইঙ্গিতের জন্য আমি তাঁর কাছে ঋণী।"

বেসো পদার্থবিদ্ নন; বেসোর উপস্থিতি ছিল আইনস্টাইনের সৃষ্টির প্রারম্ভিক প্রচেষ্টায় তাঁকে সাহচার্য দান। আইনস্টাইনের সরব বক্তব্য সহানুভূতির সঙ্গে শোনা, তাঁর সঙ্গে একই পথে একই সঙ্গে অফিস থেকে হেঁটে বাড়ী ফেরা। বেসো স্বয়ং বললেন, 'ঈগল আইনস্টাইন বেসো চড়াইকে ঘাড়ে করে অনেক উঁচুতে উড়েছে। চড়াইয়ের আনন্দ ঈগলের ঘাড়ে চেপে মহাকাশে ভ্রমণ আর নীচের জগৎকে দেখা।"

আইনস্টাইন তাঁর চিন্তার ধ্যানধারণার কথা বেসোকে উপলক্ষ করে নিজেকে শোনাতেন, যুক্তির কাঠামোর ভুল ত্রুটি ধরতেন। বেসো একজন সজীব বুদ্ধিমান শ্রোতা মাত্র যাঁর কাছে মন উজাড় করে দেওয়া যায়। এই স্নেহপ্রবণ, অনুভূতিশীল মানুষটির কাছে আইনস্টাইন কৃতজ্ঞ; কৃতজ্ঞতার সেই প্রকাশ তাঁর তত্ত্বে রয়ে গেল!

১৯০৫ সালে আইনস্টাইন তখনো বের্ন শহরের পেটেনট অফিসের তৃতীয় শ্রেণীর টেকনিক্যাল অফিসার। চাকরি পাকা হয়েছে, মাইনে সামান্য বেড়েছে—এইমাত্র। ১৯০৫ সালে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে শ্বশুর বাড়ী বেলগ্রেড-এ ঘুরে এলেন—শ্বশুর বাড়ী যাওয়া তাঁর এই প্রথম এবং

এই শেষ। সেখানে, সার্বিয়ায় মিলেভাকে রেখে তিনি ফিরে এলেন এবং কাজে লেগে গেলেন। কাজ মানে ফিজিক্সের কাজ এবং কাজ তাঁর তিনটি : আলোর গঠন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করা, বিশেষ আপেক্ষিকতত্ত্বের গাণিতিক গঠনটি পরিস্ফুট করা এবং শুধু গতি নয়, ত্বরণের জগতে আপেক্ষিকতত্ত্বের প্রয়োগের সম্ভাবনা। ইতিমধ্যে বিজ্ঞানী মহলে আইনস্টাইনের কাজ এবং আইনস্টাইন স্বয়ং পরিচিত হতে শুরু হয়েছে।

আইনস্টাইনকে প্রথম স্বীকৃতি দেন Annalen der Physik পত্রিকার সম্পাদক ভীলহেলম ভীন যিনি বিকিরণের স্বল্প দৈর্ঘ্যের তরঙ্গের শক্তি বণ্টনের সূত্রটি জানিয়েছিলেন। তিনি যে শুধু তাঁর পেপারগুলি প্রকাশ করেছিলেন, তা নয়—তাঁর তত্ত্ব বোঝার চেষ্টা করেছিলেন, যেখানে সংশয় দেখা দিয়েছিল, সেখানে নিজে আলোচনা করেছেন অথবা পাঠিয়েছেন তরুণ বিজ্ঞানীদের। লব (Laub) এমন একজন বিজ্ঞানী ; ভীনের পরামর্শে তিনি এলেন আইনস্টাইনের কাছে আপেক্ষিকতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে আর সব ছেড়েছুড়ে আইনস্টাইনের সহযোগী হয়ে কাজ করতে লেগে গেলেন। দুজনে মিলে আরো তিনটি পেপার প্রকাশ করলেন, তিনটিই বিদ্যুৎ চুম্বক শক্তি ও ক্ষেত্রের সমীকরণের সমাধানের কাজ। লব গাণিতিক দিকটা দেখেন আর আইনস্টাইন দেখেন ফিজিক্সের তাত্ত্বিক দিক।

বার্লিনে মাক্স প্লাঙ্ক রিলেটিভিটি তত্ত্বের আশ্চর্য উপযোগিতা প্রায় প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই উপলব্ধি করেন। ১৯০৫ সালে তিনি পদার্থবিদ্যার সেমিনারে রিলেটিভিটির উপর ভাষণ দিলেন। ফন লাউএ (Von Laue) এই বক্তৃতা শুনলেন আর পরের বছর আরো বিশদভাবে বুঝতে চলে এলেন আইনস্টাইনের কাছে বের্ন শহরে। নোবেল পুরস্কারবিজয়ী ফন লাউএ আইনস্টাইনের স্বীকৃত তাঁর একমাত্র জার্মান বন্ধু। এ বন্ধুত্ব আজীবন বজায় ছিল। পেশার বা শিক্ষার বন্ধুতা সহমর্মিতা নয়, সর্বাংশে ফন লাউএ আইনস্টাইনের বন্ধু, সচিব ও সখা।

পোলানডের উইটকাওস্কি রিলেটিভিটি পেপার পড়ে উত্তেজিত হয়ে বললেন, "এক নতুন কোপার্নিকাসের জন্ম হলো।" তাঁরই উৎসাহে এই পেপারের প্রচার বিদগ্ধ মহলে হয়। পেপার পড়েন আইনস্টাইনের চেয়ে বয়সে তিন বছরের ছোট মাক্স বোর্ন—এই সুবিখ্যাত বিজ্ঞানী সেদিন রিলেটিভিটিতত্ত্ব পড়ে আইনস্টাইনের মুগ্ধ ভক্ত হয়ে পড়েন। সেই মুগ্ধতা শ্রদ্ধা আজীবন তিনি বয়ে গেলেন।

অন্যদিকে আইনস্টাইন আপেক্ষিকতাবাদের আলোচনা ছাড়া আলোর গঠন নিয়ে কাজ করে যান। আলো কণা, আলো তরঙ্গ এই দ্বৈতরূপের সঠিক ধারণা নেই। আলোর কণাধর্ম আলোকতড়িৎ ফল বোঝাতে পারছে, আইনস্টাইন সেই তত্ত্ব দিয়েছেন ; তবুও কণা-তরঙ্গের মেলবন্ধন ঘটেনি। ইতিমধ্যে এটম, মলিকুল ও কঠিন পদার্থের কম্পনে তিনি প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম ফর্মুলার প্রয়োগ করলেন, এরই পরিপ্রেক্ষিতে কঠিন পদার্থের

স্পেসিফিক হীটের যে গোলমাল সনাতন বিজ্ঞানের রীতিতে দেখা গিয়েছিল তার ব্যাখ্যা দিলেন। তাঁর পেপার "Plank's Theory of Radiation and the Theory of Specific Heat" প্রকাশ হলো ১৯০৫ সালে। যে সমাধানের ইঙ্গিত তিনি দিলেন তার সার্থক প্রয়াস লো টেম্পারেচারে স্পেসিফিক হীট মাপার পদ্ধতিতে লাগালেন নার্নস্ট ও তাঁর সহকর্মীরা এবং পরবর্তীকালে লিনডামান, ডেবাই এবং মাক্সবোর্ন।

একটি মানুষ বিজ্ঞানেব অট্টালিকার রুদ্ধদ্বার খুলে যাচ্ছেন অথচ তখনো তিনি কেরানী, বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত নন, শিক্ষক নন, অধ্যাপক তো নিশ্চয় নন। এ সময়ে ধীরে ধীরে তিনি সমাজ-সংসার থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে উঠছেন। কাজ—কাজ ছাড়াআর কোন ধারণা নেই, ধ্যানজ্ঞান নেই। মিলেভা সার্বিয়া থেকে ফিরে এসে জানালেন, তিনি কেথলিক ধর্ম নিয়েছেন—উদাসীন আইনস্টাইনের কাছে এ সংবাদের কোন মূল্য নেই। মানুষের সঙ্গ তাঁর ভাল লাগে না—তাঁর কাছে সেই সঙ্গী প্রিয় যাঁরা তাঁর কাজে সাহায্য করতে পারে। নিরাসক্তি তাঁর সর্ব ব্যাপারে, শুধু ফিজিক্স ও অঙ্ক ছাড়া। তাঁর অবসর বিনোদন হলো বেহালা বাজান অথবা নৌকোয় ভেসে চলা। তাঁর চিন্তার রাজ্যে নেই লেবরেটরিব পরীক্ষা, নেই যন্ত্রপাতি। সমাজ-সংসার পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে উদাসীন, বীতরাগ অনুভব শূন্য এলবার্ট আইনস্টাইন মিলেভার অপরিচিত যেন। অন্যদিকে ব্যবহারে এসেছে নম্রতা ও নিজের শক্তি সম্পর্কে সচেতনতা। এই আইনস্টাইনের পৃথিবীতে রাজনীতি সমাজনীতি কিছু নেই—আছে বিজ্ঞানের অজানাকে খোঁজা, সত্যকে জানতে চাওয়া। সার্বিয়া থেকে ফিরে স্বামীকে চিনতে পারেন না মিলেভা।

১৯০৭ সালে জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ক্লেইনার আইনস্টাইনের অধ্যাপনার কাজ যাতে জোটে, সে চেষ্টা করেন। সেকালের নিয়ম অনুযায়ী ডক্টরেট পেলেও অধ্যাপক হওয়া যায় না। দরকার কিছু সময়ের জন্য সাধারণ শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা যাকে বলা হলো Privatdozant। এখানে শিক্ষকের বাঁধাধরা লেকচার দেবার রীতি নেই আর মাইনে হবে ছাত্রেরা যা দেবে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্পর্শে থাকতে হবে। ক্লেইনার আইনস্টাইনকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত করেন, তিনি Privatdozant হন। সময়কাল ১৯০৭ সাল।

এ বছরেই রিলেটিভিটিতে নতুন মাত্রা যোগ হলো। মাত্রার প্রতিষ্ঠা ঘটান আইনস্টাইনের E T H-এব ভূতপূর্ব অঙ্কের অধ্যাপক মিনকোওস্কি, যিনি ১৯০২ সালে জার্মানির গোটেনগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। সে যুগে গোটেনগেন গণিতবিদদের মক্কা ছিল। অঙ্কে গণিতে যাঁরা শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে পারেন, গোটেনগেন তাঁদের আমন্ত্রণ করে অধ্যাপককুলে গ্রহণ করত। মিনকোওস্কিকেও আহ্বান করে গোটেনগেনে আনা হলো। আইনস্টাইনের তত্ত্ব মিনকোওস্কি পড়লেন। অবাক মিনকোওস্কি দেখেন অলসের চূড়ামণি অঙ্কে ডাহা ফাঁকিবাজ (Lazy dog who never bothered about mathematics)

এলবার্ট আইনস্টাইন কি অসম্ভব তত্ত্ব জানিয়েছেন—কি বিস্ময়কর এই তত্ত্বের সম্ভাবনা। ১৯০৭ সালে মিনকোওস্কি একটি পেপার প্রকাশ করলেন, আর ১৯০৮ সালে "স্পেস ও সময়" এই বিষয়ে একটি বক্তৃতা দিলেন।

মিনকোওস্কি আইনস্টাইনের রেফারেন্স ফ্রেমে স্পেসের তিনমাত্রার সঙ্গে আরো একটি মাত্রা যোগ করলেন, এটি সময়। তিনমাত্রার ফ্রেমে দাঁড়াল চতুর্মাত্রিক দেশ-কালের ফ্রেমে। গণিতে মাত্রা বা Dimension কথাটি একটি জ্যামিতি-সংজ্ঞা। কোন সমীকরণে একাধিক অজানা রাশি থাকতে পারে যারা পরস্পর পরস্পরের সাপেক্ষে পরিবর্তনীয়। গণিতে এদের বলা হয় Variables। এই ভেরিএবলদের জ্যামিতিক আকৃতিতে মাত্রা দিয়ে বোঝান হয়। যেমন দেশ বা স্পেসের ভেরিএবল তিনটি—দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ, ; এদেরই বলা হবে মাত্রা। দেশ হলো ত্রিমাত্রিক। মিনকোওস্কি বললেন, রিলেটিভিটির জগতে দেশ ও কাল দুটিই পরিবর্তনীয় ; অতএব এখানে ভেরিএবল চারটি –দেশ দেবে তিনটি এবং সময় বা কাল একটি। দেশ-কালের জগৎ চারমাত্রার জগৎ। দেশের তিন মাত্রার যে গুণ সেই একই গুণ সময়ের মাত্রায়। দেশ-কালের জগতে সময়কে তুচ্ছ করা যাবে না— সেই জগতে সময়, পরিবর্তনীয় সময়, স্বমহিমায় স্বমর্যাদায় উপস্থিত ; সে আছে বলেই আইনস্টাইনের জগতে সনাতন জগতের চেয়ে থাকে অতিরিক্ত একটি ভেরিএবল— একটি মাত্রা !

দেশ-কালের জগতের উপস্থিতি ঘোষণা করে মিনকোওস্কি বললেন, "এখন থেকে স্পেস বা সময়ের আলাদাভাবে উপস্থিতি অন্ধকারের রাজ্যে নির্বাসিত হবে—যা স্বাধীন হয়ে টিঁকে থাকবে, সেটি এদের দ্বৈত মিলন।"

রিলেটিভিটি তত্ত্বটিকে মিনকোওস্কি গণিতের বন্ধনে বাঁধলেন, সুসঙ্গত ব্যাখ্যা দিলেন, তত্ত্বটি জনপ্রিয় করলেন আর এই তত্ত্ব গড়ার উৎসবের দিনে সহসা অসুস্থ হয়ে ১৯০৯ সালের ১২ জানুয়ারি তিনি মারা গেলেন। শোনা যায়, মৃত্যুশয্যায় হতাশ মিনকোওস্কি বলেছিলেন, "রিলেটিভিটি তত্ত্ব সৃষ্টির দিনে মরতে চলেছি—এ যে কত দুঃখের।" মিনকোওস্কি রিলেটিভিটির নতুন মাত্রা প্রতিষ্ঠা করলেন ; তাঁর অঙ্কের সহায়তায় সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব গঠনের জটিলতা আইনস্টাইনের কাছে সহজ হয়ে দাঁড়ায়। ১৯০৭-০৮ সালে Jahrbunch der Radioaktivitat and Electronic পত্রিকার দুটি সংখ্যায় তিনি সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বের মৌলিক উপপত্তি সাদৃশ্য নিয়ম (The Principle of Equivalence) প্রকাশ করলেন।

বিশেষ আপেক্ষিকতত্ত্বে তিনি গতি বা ভেলসিটি নিয়ে কথা বললেন। পরম স্থির বলে সেখানে কিছু নেই এবং নেই পরম গতি। সবগতি আপেক্ষিক। গতির জগতে আলোর গতি সর্বোচ্চ। গতির পরিবর্তন থাকে—গাড়ীর স্পীড বাড়ে, কমে, চলে, থামে। এই যে পরিবর্তনীয় গতি, নিউটনের গতিশাস্ত্রে এরাও সত্য—এদেরও ব্যবহার আছে।

গতির পরিমাপ করা যাবে অন্য গতির পরিপ্রেক্ষিতে,—কিন্তু গতির পরিবর্তনের ধারণায় সেই পরিপ্রেক্ষিত নেই। তার নিজস্ব ফ্রেমের কাঠামোতে পরিবর্তিত গতি যেন স্বপ্রমাণিত! এটাই আইনস্টাইনের সমস্যা। আপেক্ষিকতার জগতে পরিবর্তিত গতি স্বপ্রমাণিত হতে পারে না—এখানেও থাকবে সাপেক্ষ অথবা সাযুজ্য বোধ। পরিবর্তিত গতি, যাকে বলা হয় ত্বরণ বা accleration—সেখানে পরম থাকে না। পরম ত্বরণ বলে কিছু নেই; তবে কি আছে?

নিউটনের গতির জগতে জাড্য বা Inertia ভেঙে গতি আনতে বল বা ফোর্স লাগে। যার ভর বেশি তাকে নড়াতে বেশি সময় লাগে—ভরের বিচ্ছিন্নতার সঙ্গে ফোর্সেরও প্রভেদ ঘটে। শুধু বিশ্বসংসারে একটি ফোর্স নিশ্চিত, সেটি মহাকর্ষ বা মাধ্যাকর্ষণ। নিউটন দেখিয়েছেন যেমনই হোক আকার বা ভর, মহাকর্ষের টানে বস্তু একই গতিতে মাটিতে নামে। এই যে গতির অপরিবর্তনীয়তা—নিউটন তার এক সুন্দর ব্যাখ্যা দিলেন; নিউটন বললেন প্রতি বস্তু, তার যেমনই ভর হোক, মহাকর্ষের আকর্ষণ তার উপরে পড়বে। ছোট ভরে টান কম, বড় ভরে টান বেশি। এই আকর্ষণের বিভিন্নতা যেন অনুপাতের নিয়মে বাঁধা। আকর্ষণের আনুপাতিক হ্রাস বৃদ্ধির জন্য সব পদার্থ, ছোট বা বড়, একই গতিতে মাটিতে নামে। মহাকর্ষের বল –জাড্য বা ইনারশিয়ার প্রতিরোধী। জাড্যকে প্রতিরোধ করে যে বল অবশিষ্ট থাকে, তা সব সময়ে সমান!

নিউটনের ব্যাখ্যায় যুক্তির চেয়ে বিশ্বাস যেন প্রবল। প্রকৃতির রাজ্যে এমন কিছু ঘটছে যার কারণ জানা যায় না; প্রমাণ নেই মেনে নিলে ঝামেলা নেই। তবু কেন মানা হবে? মহাকর্ষ কেন জাড্যকে আনুপাতিক হারে প্রতিরোধ করবে এই রহস্যের ব্যাখ্যা কোথায়? সৃষ্টির রাজ্যে অসঙ্গতি থাকবে এটি আইনস্টাইনের ইচ্ছে নয়। অথচ মহাকর্ষের ক্ষেত্র বা Gravitational field যে কি ঠিকভাবে জানা নেই। পৃথিবীতে এই ক্ষেত্রের ধারণা করা যায় না—অতএব পৃথিবীর বাইরে খোঁজা হোক মহাকর্ষের ক্ষেত্রের আচার ব্যবহার। মহাকর্ষের নিয়ম খুঁজতে গিয়ে আইনস্টাইন লেবরেটরি জাতীয় কোন কিছুর উপর নির্ভর করলেন না। তিনি চিন্তার মালায় যুক্তির ফুল গেঁথে চলেন। তাঁর চোখের সামনে যেন আছে এক পরীক্ষাগার, তাঁর যুক্তির পারম্পর্য যেন সেই পরীক্ষাগারের এক শ্রেণী পরীক্ষা-নিরীক্ষা অনুক্রমে পাওয়া তথ্যের উপর গড়ে উঠছে। পরীক্ষার অনুপুঙ্খ ধারণার মধ্যে তত্ত্বর অঙ্কুর বনস্পতি হয়ে দাঁড়ায়। পরিভাষায় এই পদ্ধতিকে বলা হয়, গেডাঙ্কে (Gedankin) বা চিন্তাসমীক্ষা (Thought experiment)—তত্ত্বের পরীক্ষা ও সত্যতা চিন্তার ক্রমাগ্রসরণের (Thought process) ভিত্তিতে তৈরি হয়।

এই মহাকর্ষের আচার ব্যবহার খুঁজতে গিয়ে আইনস্টাইন দেখলেন, মহাকাশে ত্বরণ আর মহাকর্ষের বোধ এক। গতির সহসা পরিবর্তনের ফলে ত্বরণে কেন্দ্রাভিমুখী টানের ফলে

বস্তুর উপর যে সামনে বা পেছনে ঝোঁক বা টান পড়ে, সেই একই ঝোঁক বা টান ঘটে মহাকর্ষের বলে। মহাকাশে, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বলের বাইরে কোন যান যদি সমগতিতে চলে, তখন তার কাছে যদি কোন গ্রহ বা তারা আসে, তবে নতুন মহাকর্ষের টানে যানটির আরোহীদের যে বোধ জাগে সেই একই বোধ জাগে যদি যানটির গতির হঠাৎ পরিবর্তন হয়—গতি বাড়লে টান আসে পেছনে, কমলে টান হয় সামনে। মহাকাশে ত্বরণ আর মহাকর্ষের ফলাফল এক, এদের প্রভেদ পাওয়া যাবে না। অতএব পরম ত্বরণের ধারণা অসম্ভব; কারণ ঐ প্রাকৃতিক সাদৃশ্য বোধ!

এই সাম্যভাবের জন্য মহাকর্ষের ফলে আলোর কণা টান বা আকর্ষণ অনুভব করবে—বিশ্বের সবকিছু বস্তুর মতো আলোর কণা মহাকর্ষের টান উপেক্ষা করতে পারবে না; যে ইউক্লিডীয় সরলরেখায় আলো যায়—সেই সরলরেখায় বিচ্যুতি .ঘটবে।

সাদৃশ্য নিয়মের উপপত্তির মধ্যে আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বের বীজ নিহিত —চিন্তার ভ্রূণ প্রত্যয়ের বিধৃতিতে পূর্ণশরীরী রূপ তখনো পায় নি। মিনকোওস্কির গণিত তাঁর তত্ত্ব গঠনে সব নয়, শেষ নয়। রহস্যের উন্মোচনের জন্য আরো চিন্তা, সমীক্ষা গেডাঙ্কের প্রয়োজন। ১৯০৮ সাল থেকে এই উন্মোচনের প্রস্তুতি চলে।

বিজ্ঞান জগতে আইনস্টাইনকে আর উপেক্ষা করা যায় না। জেনেভা ইউনিভার্সিটিতে কেলভিনের ৩৫০তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপনের উৎসবে আইনস্টাইন আমন্ত্রিত হয়ে প্রথম অনারারি ডক্টরেট উপাধি পান। এখানেই তার সঙ্গে পরিচয় হয় মেরী কুরী, আর্নেস্ট সলভে এবং ভিলহেলম অস্টওয়াল্ডের সঙ্গে। দুমাস পরে ১৯০৯ সালে জার্মানির সালসবার্গ কনফারেন্সে বক্তৃতা দিতে আইনস্টাইন আমন্ত্রিত হলেন। এখানে তিনি পেপার পড়েন "The development of our views on the nature and constitution of radiation"। সভায় উপস্থিত ছিলেন, নার্নস্ট, প্লাঙ্ক, ভীন, রুবেন্স, সমারফেল্ড, মাক্সবোর্ন, লুডউইগ, হফ প্রভৃতি বাঘা বাঘা বিজ্ঞানীরা। সালসবার্গে বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের উপর মাক্সবোর্ন পেপার পড়েন। বিস্মিত মাক্সবোর্ন দেখেন বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ নিয়ে আইনস্টাইনের যেন কোন আকর্ষণ নেই, তাঁর চিন্তাভাবনা তখন সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ গঠনে এবং আলোর দ্বৈত স্বভাবের ব্যাখ্যায় ব্যস্ত। তাঁর পেপারে আইনস্টাইন আলোর দ্বৈত সত্তার কথা জানালেন। নিউটনের কণার সূত্রে আলোর অনেক গুণের ব্যাখ্যা দেখা যায়, আবার আলোর তরঙ্গরূপ অনেক তথ্যের ব্যাখ্যা দিতে পারে। সুতরাং সমসাময়িক চিন্তাভাবনার অচলায়তন ভেঙে নতুন চিন্তার প্রয়োজন—প্রয়োজন দুটি চিন্তার, দুটি ধারণার একীকরণ। আলোর দুটি রূপ, দুটিই সত্য; আলো কণাতরঙ্গ। আইনস্টাইন বললেন, "তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যায় অগ্রগতির পরবর্তী পর্যায়ে আমরা এমন কোন এক তত্ত্ব পাব যা আলোর কণাতত্ত্ব আর তরঙ্গতত্ত্বকে সমন্বয়ের বাঁধনে বাঁধতে পারবে।"

প্লাঙ্ক আলোচনায় যোগ দিয়ে বললেন, "আমার মনে হয়, সে পর্যায়ে চিন্তা-ভাবনার সময় এখনো আসেনি।"

উত্তরে আইনস্টাইন তাঁর বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বের $E = mc^2$ উপপত্তিটি আলোচনা করেন; আলো বা তড়িৎচুম্বকশক্তির আকারে শক্তির বহিপ্র্ কাশ ভরের পরিবর্তনে পাওয়া যাবে—এখানে আলো কণা। অন্যদিকে আলোর নির্গমনের প্রাথমিক শর্ত হলো সনাতন বিজ্ঞান অনুযায়ী এটি ফেরিকেল তরঙ্গরূপে বেরিয়ে আসবে না—আসবে বিকিরণের ধারায়। বিকিরণের ধারা প্লাঙ্কের তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। আলো নিশ্চিত কণা।

আরো আগে হাইড্রোজেন গ্যাসের বর্ণালি বিশ্লেষণকালে বামার (Balmer) একটি ফর্মুলা দিয়েছিলেন। ১৮৮৬ সালে রুঁজ (Runge) দেখলেন, বামারের ফর্মুলার সত্যতা সহজেই প্রমাণ করা যায়, যদি ধরে নেওয়া যায় কম্পাঙ্কটি $v = \frac{c}{\lambda}$ যেখানে c আলোর গতিবেগ এবং λ হলো তরঙ্গদৈর্ঘ্য। অনদিকে এ $v = c$ অর্থাৎ আলোর গতি যেখানে সেকেনডে 3×10^8 মিটার, সেখানে কম্পাঙ্ক আর-তরঙ্গের দৈর্ঘ্যের গুণে পাওয়া যাবে সেই গতি। যেমন রেডিওর তরঙ্গদৈর্ঘ্য 300 মিটার আর সেটিকে একইভাবে বলা যাবে কম্পাঙ্ক বা ফ্রিকোয়েন্সি 10000 কিলোহার্টজ; এ দুটির গুণে পাওয়া যাবে $300 \times 10^3 \times 10^8$ মিটার $= 3 \times 10$ মিটার প্রতি সেকেনডে—যেটি আলোর গতি। তখনো রুঁজের বক্তব্য প্রমাণ হয়নি। আইনস্টাইন তাঁর ভাষণে রুঁজের বক্তব্য আনলেন। আলোর কণা ও তরঙ্গের মেলবন্ধন রীতিতে প্রাপ্ত শক্তি প্লাঙ্কের ফর্মুলা hv তে না বুঝিয়ে বোঝাবে hc/λ ফর্মুলায়। অর্থাৎ $E = \frac{hc}{\lambda}$ এই ফর্মুলা কণাতরঙ্গবাদের আভাস জানাবে। এই উপপত্তির প্রমাণের জন্য কোন তথ্য আইনস্টাইনের হাতে নেই, তবে যুক্তি দিয়ে গড়া এই উপপত্তিটিকে প্রমাণিত বা অপ্রমাণিত না করা পর্যন্ত পাশ কাটিয়ে যাওয়া যাবে না। আইনস্টাইনের দুঃসাহসী উক্তি সেই মুহূর্তে প্লাঙ্ক মানতে পারেন নি। তবু আইনস্টাইনের মনীষা তাঁকে মুগ্ধ করে। অন্যদিকে আইনস্টাইন প্লাঙ্কের ব্যক্তিত্বে বিমুগ্ধ; দুজনের দুজনকে ভাল লাগে। প্লাঙ্কের থাকে আইনস্টাইনের জন্য স্নেহ, ভালবাসা আর আইনস্টাইনের প্লাঙ্কের জন্য শ্রদ্ধা; এই ভাব আজীবন বজায় থেকে গেছে। আইনস্টাইন প্লাঙ্কের কোন অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারেননি তাঁর অনুরোধ আইনস্টাইনের কাছে ছিল আদেশ; অন্যদিকে স্নেহশীল প্লাঙ্ক বাস্তবজ্ঞানহীন এলবার্টকে তাঁর পক্ষচ্ছায়ায় আশ্রয় দিয়ে বিজ্ঞানে তাঁর চলার পথ মসৃণ করার চেষ্টা করে গেছেন। প্লাঙ্ক জানেন, আইনস্টাইন হলো নব-বিজ্ঞানের প্রথম ফাল্গুনী হাওয়া।

সালসবার্গ থেকে আইনস্টাইন কিছু ঘুরে ফিরে বের্নে ফিরে এলেন—এলেন সেই পেটেনট অফিসে কেরানীর কাজে। তবে সেদিন আর নিজেকে 'হরিপদ কেরানী' ভাবতে পারেন না—আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান জগতে তিনি সেদিন বিশিষ্ট একজন—আকবর বাদশার সঙ্গে তফাত খুঁজে পাওয়া যায় না।

প্রাগে আইনস্টাইনের প্রথম সময়টা ভালই কাটে। বৈঠকী আড্ডায় তিনি হাজির—চেম্বার মিউজিক শুনছেন ; কানট, হেগেল, ফিখটকে নিয়ে আলোচনা করছেন। ছাত্রদের সঙ্গে হাস্য পরিহাসে মশগুল। তাঁর উন্নতির সুখের আমেজটুকু আনন্দে উপভোগ করছেন। ধীরে ধীরে প্রথম পাওয়া সুখের রেশ কমে আসে। অন্বেষণের যে পথ বেছে নিয়েছিলেন, সেই খোঁজার হাতছানির ইশারাতে মনের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে ফেলেন। আনন্দ খোঁজেন গণিতে ও ফিজিক্সে। প্রাগের গণিতের অধ্যাপক জর্জ পিক তাঁকে রিক্কি ও লেভিসিভিটারের উচ্চ গণিত শেখান—পিকের ধারণা সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্বের কাঠামোতে এই গণিত প্রযোজ্য হবে। বিভিন্ন গণিতের আলোচনাটুকুই প্রাগে তাঁর প্রাপ্তি। অন্যদিকে প্রাগের রাজনীতির আবহাওয়া ঘোলাটে—জার্মান চেক, খৃষ্টান-ইহুদি, এই সব বিভিন্ন ভাষাভাষী আর ধর্মীয় লোকদের মধ্যে রেষারেষি। আইনস্টাইনকে প্রায় বাধ্য হয়ে অষ্ট্রিয়-হাঙ্গেরির নাগরিকত্ব স্বীকার করতে হলো—তবে তাঁর সুইস নাগরিকত্ব বজায় থাকে, খারিজ হয় না। ধর্মের ব্যাপার তাঁর অবিশ্বাসত্ব টেঁকে না,—এখানেও বাধ্য হয়ে তিনি নিজেকে ইহুদি ধর্মীয় বলে ঘোষণা করলেন।

রাজনীতি, ধর্ম, বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা খুঁটিনাটি ব্যাপার থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখে আইনস্টাইন তাঁর কাজে মগ্ন থাকেন। এখানেই তিনি ধীরে ধীরে অনুভূতি-আবেগ-উদ্বেগহীন একমনা যান্ত্রিক বিজ্ঞানসাধক হয়ে দাঁড়াতে থাকেন যাঁকে দেখে মাক্সব্রড তাঁর The Redemption of Tycho Brahe নামক উপন্যাসের নায়ক বিজ্ঞানী কেপলেরের চরিত্র গড়ে তোলেন। তবু বাইরের অশান্ত ঢেউ বারবার তাঁর মনঃসংযোগ ভেঙে ফেলতে চায়। বিশেষ করে ইহুদিরা তাঁকে নিজেদের দলে পেতে চান। প্রাগে ইহুদিরা একটি বড় দল, সেই দলে আইনস্টাইনকে পেলে মর্যাদা বাড়ে ; উদাসীন আইনস্টাইনের ধর্মে এরা বারবার আঘাত হানে, কানে ইহুদিতত্ত্বের মন্ত্র জপেন ; আর, কখন না জানি আইনস্টাইনের মনে ইহুদিদের জন্য সামান্য সমবেদনা বিশিষ্ট রূপে দেখা দেয় ; নিজেকে কোন কোন মুহূর্তে ইহুদি ভাবেন।

তবু, ধর্ম, জাতীয়তাবোধ এসব ক্ষুদ্র ব্যাপার তুচ্ছ করে তিনি বিজ্ঞানের চর্চায় মগ্ন থাকেন। সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের গঠনে নিজেকে নিয়োজিত করেন। মহাকর্ষের সমস্যা সমাধানে, তাঁর সাদৃশ্য নিয়মের অনুবর্তী আরো একটি পেপার Annalen der Physik-এ প্রকাশ করেন। এই পেপারে তাঁর সাদৃশ্য নিয়মের বিশদ ব্যাখ্যা দিলেন। প্রাকৃতিক জগতে বস্তু বা মেটারের উপর মহাকর্ষের আকর্ষণের ফলাফল কি—সেটিই আলোচ্য বিষয়। তিনি জানান, সব বস্তু শক্তির রূপান্তরে সৃষ্টি, বস্তুর মধ্যে শক্তি জমাট বেঁধে যেন আছে। আর আলোর কোয়ানটা যেন কণা যা আলোর গতি পাবার জন্য ভরের রূপান্তর ঘটাচ্ছে। অতএব মহাকর্ষের টান আলোর উপর পড়বে। নিউটন স্বয়ং মহাকাশে অসীম দূরত্বে বস্তুর টানে আলোর বাঁকের কথা ভেবেছিলেন। জার্মান বিজ্ঞানী সোল্ডনার নিউটনের

আলোক-কণা তত্ত্বের প্রয়োগে এই বাঁকের মাপটুকু হিসেব করেছিলেন। আইনস্টাইনের তত্ত্বেও সেই টানের ফলে বাঁকের ইঙ্গিত থাকছে—তবে এখনো তিনি গাণিতিক ছকটি দিলেন না। এই পেপারে আরেকটি নতুন তত্ত্ব জানালেন—প্রবল মহাকর্ষ ক্ষেত্র থেকে আলো যখন দুর্বল মহাকর্ষের ক্ষেত্রে যাবে তখন আলোর গতি যাতায়াতের জন্য শক্তি-ক্ষয়ের ফলে কমবে না—কারণ আলোর গতি অপরিবর্তনীয়। দূরের তারার আলো তার সৃষ্টিক্ষেত্র প্রবল মহাকর্ষ ক্ষেত্র ছেড়ে যখন দুর্বল মহাকর্ষের ক্ষেত্রে হাজির হয়, তার গতি তখনো এক। বহুদূর পথ পার হলেও তার শক্তিক্ষয়ের জন্য গতি কমে যাবে না, কমে যাবে তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য। সূর্যের আলো সাদা, অন্যদিকে দূরের তারার আলো লাল। তার কারণ শক্তিক্ষয়ের জন্য তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হ্রাস। এই যে আলোর লাল বর্ণালির দিকে সরে যাওয়া, একে বলা হলো আইনস্টাইনীয় স্থান পরিবর্তন বা Einstein Shift। এই পরিবর্তনের অবশ্য অন্য কারণ থাকতে পারে—যেমন ডপলারের রীতি। তবু আইনস্টাইনের গড়া নতুন তত্ত্ব মোতাবেগ পরিবর্তন থাকবে—এটি হয়তো সামান্য, তবুও বাড়তি; এটিকে তুচ্ছ করা যাবে না। কিভাবে এটি মাপা যাবে তখনো সেই ধারণা আইনস্টাইনের নেই এবং নেই গণিতের নির্দেশনা।

১৯১১ সালে প্রকাশিত এই পেপারে তাত্ত্বিকবিজ্ঞানী পরীক্ষকবিজ্ঞানীদের এক নতুন কাজ দিলেন, আলোর বাঁক মাপা। তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন হিসেব করা। যুক্তি দিয়ে গড়ে তোলা তত্ত্বের প্রমাণ পরীক্ষক বিজ্ঞানীদের হাতে—তাঁরাই তত্ত্বটির সত্যতা জানাবেন।

এই ১৯১১ সালে লরেন্সের আমন্ত্রণে লেইডনে বক্তৃতা দিতে এলেন। মিলেভা আর তিনি লেইডনে লরেন্সের অতিথি। আর এর দুমাস পরে ব্রাসেলসের সলভে কনফারেন্সে আমন্ত্রণ এল। ৩০শে অক্টোবর থেকে ৩রা নভেম্বর পাঁচ দিনের এই সম্মেলনে বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানীদের সঙ্গে কনফারেন্সে যোগ দিলেন আইনস্টাইন।

সলভে কনফারেন্সের উদ্‌গাতা ও প্রতিষ্ঠাতা বিখ্যাত বেলজিয়ান রসায়নবিদ ও শিক্ষাবিদ আর্নস্ট সলভে যাঁর সঙ্গে সালসবার্গ কনফারেন্সে আইনস্টাইনের আলাপ হয়েছিল। জার্মান বিজ্ঞানী নার্নস্টের পরামর্শে বিশ্বখ্যাত পদার্থবিদদের সলভে আমন্ত্রণ জানালেন, উদ্দেশ্য সে যুগের পদার্থবিদ্যার সমস্যার উপর একটি সামগ্রিক আলোচনা করা—নতুন পথের দিকচিহ্নগুলিকে বুঝতে চাওয়া। ১৯১১ সালে বিজ্ঞান জগতে অনেক সমস্যা—সমস্যা রেডিও একটিভ পদার্থ নিয়ে, কোয়ানটাম তত্ত্ব নিয়ে, এটমের গঠন নিয়ে। এই সমস্যার সমাধানে সলভে বিজ্ঞানীদের আলোচনা সভা ডাকলেন—এটিই প্রথম সলভে কনফারেন্স। এই কংগ্রেসে, ইংলনড, জার্মানী, ফ্রান্স, হল্যানড, অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরির সুবিখ্যাত বিজ্ঞানীরা হাজির হলেন। একটি দুষ্প্রাপ্য ছবি পাওয়া যায়—সে ছবি প্রথম সলভে কংগ্রেসে উপস্থিত বিজ্ঞানীদের গ্রুপ ফটো। এখানে আছেন স্বয়ং সলভে এবং কংগ্রেসের প্রেসিডেনট লরেন্স। তা ছাড়া আছেন, নার্নস্ট, ব্রিলোউন, ওয়ারবুর্গ, পেরিন, ভীন, মাদামকুরী,

পোঁয়াকার, গোল্ডস্মিডট, প্লাঙ্ক, রুবেন্স, সমারফেল্ড, লিনডামান, ব্রবলী (বড়), ক্নুডসেন, হোসেনোরল, হারৎসেন, জেমস জিন্স, রাদারফোর্ড, কামেরলিংগ, ওনেস, লাজ্যাঁভ্যা ও আইনস্টাইন। ছবিটি দেখে পরবর্তী কালের বিজ্ঞানীদের সরস মন্তব্য হলো, এ ছবির বিজ্ঞানীদের সবার মুখে গোঁফ-দাড়ি বা শুধু গোঁফ আছে, ব্যতিক্রম মাদাম কুরী ও জেমস জিন্স। মাদাম কুরী নারী, অন্যান্যরা পুরুষ, তবে জেমস জিন্স কি? রসিকতাটি জিন্স খুবই উপভোগ করতেন; নতুন যুগের বিজ্ঞানীদের ক্লীন-শেভড মুখ দেখিয়ে বলতেন, আমি-তোমরা।

সলভে কনফারেন্সে যে তিনজন তাঁদের ব্যক্তিত্বে, জ্ঞানে ও প্রকাশ ভঙ্গিমায় বিশিষ্ট হয়েছিলেন, তাঁরা রাদারফোর্ড, পোঁয়াকার এবং আইনস্টাইন। রাদারফোর্ডের বিশাল চেহারা গলার জোয়ারী আওয়াজ, মানোয়ারী জাহাজের মত চালচলন সবকিছু আলাদা। চাইম ওয়াইজমান বলতেন, রাদারফোর্ড মানে পরীক্ষাই সব আর আইনস্টাইন হলেন সবটাই অঙ্ক (Rutherford all experiment and Einstein all calculation)। সেই আইনস্টাইন পদার্থবিদ্যায় গণিতের প্রয়োগের আরেকটি উদাহরণ তাঁর কংগ্রেসে গঠিত পেপারটিতে দিলেন—The actual state of the problems of specific heat—এই পেপারটিতে লো টেম্পারেচারে স্পেসিফিক হীটে যে গোলমাল সনাতন বিজ্ঞানে দেখা দিয়েছিল, সেই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর মৌলিক চিন্তাধারা প্রকাশ করলেন। এ বিষয়ে আগেও একটি পেপার লিখেছিলেন তবে তাঁর নতুন পেপারটি আরো বিশদ, গণিতের ছক অনেক সুজ্ঞেয়, তথ্য যুক্তির সমন্বয় অনেক ন্যায়ানুগ। মাদাম কুরী তাঁর যুক্তির বলিষ্ঠতায়, তথ্যের পরিবেশনায় কারুকার্যে এবং বুদ্ধির চাতুর্যে মুগ্ধ হলেন; অন্যদেরও এক-মত। আইনস্টাইন সলভে কংগ্রেসে নিজেকে বিশিষ্ট এবং অনন্যভাবে প্রকাশ করলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলির টনক নড়ে। এর আগে হল্যানডের উট্রেকট ইউনিভার্সিটির কিছু অধ্যাপক আইনস্টাইনকে উট্রেকটে আনার চেষ্টা করেন। লরেন্স স্বয়ং এর উদ্যোক্তা। জুরিখের E T H-এও অধ্যাপনা জোটার সম্ভাবনা একই সময়ে দেখা দেয়। ভিয়েনা, বার্লিন এমন কি ইউ এস এ'র নিউইয়র্কের কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি আইনস্টাইনকে অধ্যাপনার পদে যোগ দেবার আমন্ত্রণ জানান। আইনস্টাইন নিজে জুরিখে ফিরে যেতে চান; চান সুইজারল্যানডে বাস করতে; মিলেভারও সেই ইচ্ছা। জুরিখের নিয়োগপত্র আসতে দেরী হয়; তবু সেই নিয়োগেও আশায়, আইনস্টাইন অন্যান্য আমন্ত্রণগুলি প্রত্যাখ্যান করেন; জুরিখের নিয়োগ না পেলে, প্রাগে যেমন আছেন তেমনি থাকবেন, এমনি তাঁর মনোভাব। ১৯১১ সাল কাটে। ১৯১২ সালে আইনস্টাইনের সঙ্গে বিজ্ঞানী এরনফেস্ট-এর সখ্যতা হয়। ইতিমধ্যে জুরিখের নিয়োগপত্র এসেছে। তাঁর পোস্টে এরনফেস্ট প্রাগে যোগ দিন, আইনস্টাইনের এই ইচ্ছা। তবে এখানেও সেই ধর্মীয় ঝামেলা গড়ে ওঠে। আইনস্টাইন ঝামেলা এড়াতে নিজেকে ইহুদি বলে ঘোষণা

করেছিলেন—এরনফেস্ট কোন সমঝোতার মধ্যে যান না। তাঁর ধর্মে ও ঈশ্বরে অবিশ্বাস তিনি বজায় রাখলেন; ফলে তাঁর চাকরিটি হলো না। কিছু পরে এরনফেস্ট লেইডনে লরেন্সের উত্তরাধিকারী হয়ে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকত্ব পান। কোয়ানটাম গণিতে এরনফেস্টের উল্লেখযোগ্য কাজ, আর সেই কাজের সূচনা এরনফেস্ট-আইনস্টাইনের আলোচনার মাধ্যমে।

১৯১২ সালের আগস্ট মাসে আইনস্টাইন জুরিখে E T H-এ যোগ দিলেন।

আইনস্টাইন তখন বিজ্ঞান জগতে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, সমসাময়িক বিজ্ঞানীরা তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে জুরিখে আসেন; আসেন ফনলাউএ, এরনফেস্ট। সুইজারল্যানডে অবসর কাটাতে এসে মাদাম কুরী পাহাড়ে চড়ার কালে আইনস্টাইনকে সঙ্গী করে নেন। পাহাড়ের খাড়াইয়ে, সরু রাস্তায়, আইনস্টাইন মাদাম কুরীকে তাঁর সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বের চিন্তা সরবে জানাতে থাকেন, অন্যমনস্ক হয়ে খাদে পড়ে গিয়ে মাদামের দুটি ছোট-মেয়ের হাসির খোরাক হন। মাদাম আর আইনস্টাইন রাদারফোর্ডের এটমের গঠন নিয়ে আলোচনা করেন—বোঝা যায়, সাব-এটমিক জগতের উপকরণদের গতি যেখানে বেশি রিলেটিভিটিতত্ত্ব সেখানে খাটবে। মাদামের তেজস্ক্রিয়তা আর আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা এই নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা পাহাড়ে উঠতে উঠতে চলে, দুই বিজ্ঞানীর এটাই বিশ্রাম ও অবকাশ।

জুরিখে তাঁর ছাত্রজীবনের বন্ধু মার্শেল গ্রোসমানের সঙ্গে আবার দেখা হয়। গ্রোসমান অঙ্ক ভাল বোঝেন। সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ গঠনে আইনস্টাইন গ্রোসমানের সাহায্য নেন। দুজনে ১৯১৩ সালে একটি পেপার প্রকাশ করেন,—আইনস্টাইন এটির ফিজিক্সের দিকটা দেখেন আর গ্রোসমান দেন গণিতের ছক। দুজনের চেষ্টায় যা পাওয়া গেল, সেটি মহাকর্ষের সমস্যার সমাধানে গণিতের ছকে একাধিক উত্তর! অর্থাৎ একটি মাত্র মহাকর্ষের পরিবেশে, একটি মাত্র অবস্থাতে একাধিক সমাধান পাওয়া সম্ভব। আইনস্টাইনের ধারণার পরিপন্থী এই সমাধান; অন্যদিকে নিমিত্তের জগতে এইসব সমাধান বেমানান। কিছুদিনের জন্য আইনস্টাইন ভাবেন, সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বের চিন্তা হয়তো সঠিক নয়। সুস্থির শান্ত হয়ে পরে আইনস্টাইন ভেবে দেখেন,—যে সমাধান পাওয়া গেল, তাঁর চিন্তার সেটি বিপরীত, এই অসঙ্গতি প্রকাশিত পেপারে অঙ্কের ছকে আছে। তাঁদের অঙ্ক ভুল। নতুন উদ্যমে আইনস্টাইন আবার কাজে লাগেন।

বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ পদার্থবিদ্যার জগতে ধীরে ধীরে প্রমাণিত হতে থাকে যে তত্ত্বের প্রকাশ তিনি করেছেন তার উপর বিভিন্ন বিজ্ঞানী যেমন কাজ করেছেন, বেশ কিছু বিজ্ঞানী তেমনি এটিকে সন্দেহের চোখে দেখছেন—সমালোচনায় মুখরিত অনেকানেক বিজ্ঞানী। এই ১৯১৩ সালে বিজ্ঞান জগতে আরেকটি আলোড়ন ওঠে। নীয়েল বোর রাদারফোর্ডীয় এটমের ব্যাখ্যা প্লাঙ্ক-আইনস্টাইনের কোয়ানটাম পদ্ধতিতে করেছিলেন;

বোরের উপপত্তির প্রমাণ ১৯১৩ সালে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের ফলে পাওয়া গেল। আইনস্টাইন এই নতুন উপপত্তির প্রমাণের কথা শুনালন; বললেন, তাঁরও এই ধরনের একটা চিন্তা ছিল; কিন্তু এই চিন্তা যদি সত্য হয়, তবে ফিজিক্সের এখানেই শেষ। ফিজিক্সের শেষ নয়, শেষ হলো পুরনো ধারণার। বোরের তত্ত্বের প্রমাণের ফলে তখনকার বিরুদ্ধবাদীরা আইনস্টাইনের তত্ত্বের সমালোচনায় কিছুটা সংযত হলেন।

১৯১৩ সালে ভিয়েনায় অবসরভোগী বৃদ্ধ মাকের সঙ্গে আইনস্টাইনের দেখা হলো—ছাত্র শিক্ষকের অনেক দিন পর দেখা। আইনস্টাইনের তত্ত্ব পড়ে মাক এটমকে মেনে নিয়েছিলেন; আইনস্টাইনের ধারণা হলো, রিলেটিভিটি তত্ত্বও মাক আলোচনার কালে স্বীকার করে নিলেন। মাকের স্বীকৃতি মানে পুরনো জগতের স্বীকৃতি। খুশি হয়ে ফিরে এলেন আইনস্টাইন। পরে জানা গেল, রিলেটিভিটি তত্ত্ব, বিশেষ করে আইনস্টাইনের রিলেটিভিটি তত্ত্বকে মাক গ্রহণ করতে পারেন নি। মাকের দর্শনের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আইনস্টাইনের রিলেটিভিটি তত্ত্বের সূচনা। কিন্তু নতুন মেকানিক্সের সৃষ্টি, তত্ত্বের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ থেকে কিছুটা সরে আসা, কার্যকারণের প্রতিষ্ঠিত দার্শনিক মতবাদের নতুন ব্যাখ্যা এবং সবার উপর ইনটিউশনের উপর নির্ভরশীলতা, পরীক্ষায় পাওয়া তথ্য ছাড়া তত্ত্বের গঠনের উপলব্ধিসঞ্জাত পদ্ধতি মাক পছন্দ করেননি। আলোচনার কালে সম্ভবত আইনস্টাইনের কাছে মাকের মতবাদ সুস্পষ্ট হয়নি। ১৯১৬ সালে মাক মারা গেলেন—অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে আইনস্টাইন স্মৃতিতর্পণ করেন। ১৯১৬ সালে মাকের The Principles of Physical Optics বইটি প্রকাশ হলো—ভূমিকায় মাক দ্বিধাশূন্য ভাষায় রিলেটিভিটি তত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর সংশয়ের কথা জানালেন। এলবার্ট আইনস্টাইন মাকের গোঁড়ামিটুকু বেদনার সঙ্গে দেখলেন। ১৯২২ সালে প্যারিসের এক বক্তৃতায় তিনি মাকের বক্তব্যের সঙ্গে তাঁর চিন্তার পার্থক্যটি জানালেন; মাকের সম্পর্কে একটি ছোট উক্তি রাখলেন, "deplorable philosophe" একজন দার্শনিক যাঁর চিন্তাধারা শোচনীয়।

১৯১৩ সালের ২৫শে জুন তারিখে মাককে লেখা একটি চিঠিতে আইনস্টাইন জানালেন যে সূর্যের মহাকর্ষের ফলে আলোর গতির বাঁকের পরীক্ষার সম্ভাবনার সুযোগ ঘটেছে। সুযোগটা ঘটল বার্লিনের এরউইন ফিনলে ফ্রয়েন্ড্‌লিশের প্রচেষ্টায়। ফ্রয়েন্ড্‌লিশ আধাজার্মান, আধাস্কচ, জ্যোতির্বিদ, বার্লিনের অবজারভেটারির সহকারী। ১৯১১ সালে প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর পোলোক বার্লিনে এসে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের নতুন উপপত্তির কথা জানালেন। মহাকর্ষের ফলে আলোর বাঁকের পরীক্ষা মহাকাশে যে সম্ভব সেই চিন্তা প্রাগে আইনস্টাইন সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনার কালে বলেছিলেন—পোলোক সেই সম্ভাবনার কথা বার্লিনের অবজারভেটারির অধ্যাপকদের জানালেন। কেউ এই সম্ভাবনা নিয়ে মাথা না ঘামালেও ফ্রয়েন্ড্‌লিশ আলোর বাঁকের

প্রমাণের জন্য উঠেপড়ে লাগেন। ফ্রয়েন্ড্‌লিশের প্রথম চেষ্টা বৃহস্পতির কাছে আলোর বাঁক মাপা—প্রচেষ্টাটি সফল হলো না। দ্বিতীয় প্রচেষ্টা মহাকর্ষের যমক তারার আকর্ষণের ধারায় আলোর বাঁক মাপা। এই প্রচেষ্টাতে আইনস্টাইনের সাফল্য সম্বন্ধে দ্বিধা ছিল; প্রচেষ্টাটি সফলও হয় না। ১৯১৪ সালে ক্রিমিয়া অঞ্চলে সূর্যগ্রহণ দেখা যাবে—সূর্যের গ্রহণের আগে এবং পরে তারাদের অবস্থান মেপে আলোর গতিপথের তফাত হচ্ছে কিনা জানা যাবে—এটি আইনস্টাইনের ধারণা। এই সূর্যগ্রহণের সুযোগে সেই ধারণাটি প্রমাণ করতে ফ্রয়েন্ড্‌লিশ উদগ্রীব। বার্লিন অবজারভেটোরির কর্তৃপক্ষ কতকটা নিমরাজি হয়ে ফ্রয়েন্ড্‌লিশকে নিজের পয়সায় আর সময়ে ক্রিমিয়া যেতে অনুমতি দিলেন। ফ্রয়েন্ড্‌লিশ তাঁর সদ্য বিবাহিত স্ত্রীকে নিয়ে সুইজারল্যানড এলেন। দুটো উদ্দেশ্য; এক মধুচন্দ্রিমা যাপন আর দুই, আইনস্টাইনের সঙ্গে প্রজেক্টটি নিয়ে আলোচনা করা। ১৯১৩ সালে সস্ত্রীক জুরিখে ফ্রয়েন্ড্‌লিশ এলেন। স্টেশনে অভ্যর্থনা করতে হাজির জার্মানির বিখ্যাত বিজ্ঞানী, কিছুদিন আগে প্রতিষ্ঠিত কাইজার ভিলহেলম ইনস্টিট্যুটের ডিরেক্টর রসায়নবিদ ফ্রিৎস হাবের আর মাথায় খড়ের টুপি পরা এলবার্ট আইনস্টাইন এবং আইনস্টাইনের সহকারী অটো স্টার্ন। সবাইকে লাঞ্চে নিমন্ত্রণ করে আইনস্টাইন রেস্টুরেনটে নিয়ে এলেন। খাওয়া-দাওয়ার পর বিল মেটাবার সময় আইনস্টাইনের খেয়াল হয়, পকেটে পার্স নেই, টাকা নিয়ে আসেন নি। যা হোক, টেবিলের তলা দিয়ে একটা একশ ফ্রাঙ্কের নোট পাচার করে স্টার্ন বিশ্রী পরিস্থিতিটা কাটিয়ে তোলেন। আইনস্টাইন সেই নোট দিয়ে বিলের টাকাটা মেটান!

ফ্রয়েন্ড্‌লিশ থাকার সময় আর কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটলো না। শুধু ফ্রয়েন্ড্‌লিশ আর আইনস্টাইন তাঁদের নতুন প্রজেক্ট নিয়ে আলোচনা প্রায় করে চলেন, আর নববিবাহিতা ফ্রাউ ফ্রয়েন্ড্‌লিশ সেই সময়ে সুইজারল্যানডের নৈসর্গিক শোভা উদাসীন মুগ্ধতা চোখে নিয়ে তাকিয়ে দেখেন। ক্রিমিয়ায় পরীক্ষা নিয়ে যেটুকু সংশয় ছিল, সেই সংশয়টুকু মাউনট উইলসন অবজারভেটোরির প্রফেসর জর্জ হেল কাটিয়ে দেন। আইনস্টাইনের চিঠির জবাবের হেল জানালেন, "সূর্যালোকে কোন ফল পাওয়া যাবে কিনা এ বিষয়ে আমার দ্বিধা আছে; আমার বিশ্বাস, সূর্যগ্রহণের সময় পরীক্ষা করলে সুফল পাওয়া যাবে। মনে হয়, কোন অসুবিধার সৃষ্টি হবে না। অনেক তারা নিয়ে মাপা-কষা যাবে ফটোগ্রাফ প্লেটে। ব্যক্তিগতভাবে প্ল্যানটিকে আমি অনুমোদন করছি।"

আইনস্টাইনেরও এক ধারণা। সুতরাং ফ্রয়েন্ড্‌লিশের প্রজেক্ট এগিয়ে চলে। টাকার ব্যাপারে কিছু অসুবিধে অবশ্য ছিল। আইনস্টাইন স্বয়ং নিজের সঞ্চয় থেকে ২০০০ মার্ক দিতে চান। যা হোক টাকা পাবার সম্ভাবনা জোটে। ক্রুপ কোম্পানির কর্তৃপক্ষ এবং বিখ্যাত রসায়নবিদ এমিল ফিশার টাকা দিতে রাজি হলেন। শোনা যায় স্বয়ং মাক্স প্লাঙ্ক এই অর্থ সংগ্রহের জন্য উদ্যোগী হয়ে শিল্পবিদদের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। অভাবনীয়ভাবে

এই টাকা পাবার সম্ভাবনা ১৯১৪ সালে জানা গেল। সব কিছু ঠিকঠাক।
সুইজারল্যানডেও আইনস্টাইনের পরিবারে সবকিছু শান্তি আর স্বস্তিতে ভরা। সুইজার-ল্যানডে এসে মিলেভা খুশি। কিছুদিন ধরে মাথা ধরার এক অস্বস্তিকর যন্ত্রণায় তিনি ভুগছিলেন, সুইজারল্যানডের জল হাওয়ায় তাঁর শরীর ভাল আছে। ছোট ছেলে এডুয়ার্ড হেঁটে চলে বেড়ায়, আধো আধো কথা বলে। বাবা ছোট ছেলেটিকে ভালবাসেন, আদর করেন, কোলে তুলে নিয়ে ঘুরে বেড়ান। বড় ছেলে হান্স স্কুলে যায়। সংসারে টাকা পয়সায় আমদানি আছে, সাহায্যের জন্য আছে মেড। দুই ছেলে আর আপন-ভোলা কাজ-পাগল স্বামী নিয়ে মিলেভার সংসার ; কিছু দূরে ননদ মাজা স্বামী উইনট-লারকে নিয়ে লুসার্ন শহরে বাস করেন ; সেই একই শহরে ছেলে আর মেয়ের কাছা-কাছি থাকতে মা চলে এলেন। আর কিছু দূরে আছেন পারিবারিক বন্ধু মাইকেল এঞ্জেলো বেসো। ভালবাসার, ভালোলাগার আত্মীয়স্বজন নিয়ে ভরভরতি সংসার।
শান্তির এই আবাসটিকে উৎখাত করে সবসুদ্ধ বার্লিনে যাবেন ঘোষণা করলেন এলবার্ট। মিলেভা জানতেন না, বোন মাজা, মা, বন্ধু বেসো, সহকর্মীরা কেউই জানতেন না ; ১৯১৩ সাল থেকে এলবার্ট এই যাওয়া নিয়ে কথাবার্তা বলছিলেন আর ১৯১৪ সালের এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে বার্লিনে রওনা দিলেন।
ফ্রয়েন্ড্লিশ জুরিখ স্টেশনে কাইজার ভিলহেলম ইনস্টিট্যুটের ডিরেক্টর বিখ্যাত রসায়নবিদ হাবের কে দেখেছিলেন। শুধু হাবের নন, বিভিন্ন সময়ে, বার্লিন থেকে প্লাঙ্ক নার্নস্ট সুইজারল্যানডে আইনস্টাইনের সঙ্গে দেখা করেছিলেন, চিঠি লিখেছেন;—উদ্দেশ্য কাইজার ভিলহেলম ইনস্টিট্যুটে আইনস্টাইনকে নিয়ে আসা।
১৯১১ সালে সলভে কংগ্রেসে আইনস্টাইনকে দেখার পর থেকেই প্লাঙ্ক আর নার্নস্টের ইচ্ছে জার্মানিতে তাঁকে নিয়ে আসা। জার্মানি বিজ্ঞান-জগতে ইংল্যানডের প্রতিদ্বন্দ্বী। ইংল্যানডের কেভেনডিশ লেবরেটারির চেয়ে বড় এক বিশ্ববিদ্যালয় কাইজারের পৃষ্ঠপোষকতায় বার্লিনের উপান্তে গড়ে উঠল ১৯১২ সাল নাগাদ। এখানেই এলেন হাবের, প্লাঙ্ক, নার্নস্ট প্রমুখ বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা। আইনস্টাইন এলে ষোলকলা পূর্ণ হবে—তাঁকে এই ইনস্টিট্যুটে আনা চাই।
১৯১২ সালে প্রাগ থেকে বার্লিনে এলেন আইনস্টাইন—নার্নস্ট, প্লাঙ্ক, রুবেন্স, হাবের এদের সঙ্গে দেখা হলো। বার্লিনের বিজ্ঞানের পরিমণ্ডল দেখে তিনি মুগ্ধ। প্রাগ বা জুরিখ থেকে কত তফাত। আইনস্টাইনের এই মুগ্ধতা প্লাঙ্ক ও নার্নস্ট লক্ষ্য করলেন। নতুন ইনস্টিট্যুটটি চালু হলে দুজনে এলেন জুরিখে আইনস্টাইনের কাছে। এঁরা চান আইন-স্টাইন বার্লিনে আসুন, সেখানে তাঁর গবেষণার অভূতপূর্ব সুযোগ। যে থট-প্রসেস বা চিন্তা-প্রকল্পের সাহায্যে আইনস্টাইন তাঁর তত্ত্ব গড়ে তুলছেন, সেই প্রকল্পের জন্য দরকার সমমর্মী বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আলোচনা। সেই আলোচনার সুযোগ বার্লিনে যতটা পাওয়া

যাবে, আর কোথায় আছে তার তুলনা ? নার্নস্ট বললেন, "আপেক্ষিকতাবাদ বোঝেন সারা পৃথিবীতে ডজন খানেক বিজ্ঞানী আর তার আটজনই আছেন জার্মানিতে,বার্লিনে !" তা ছাড়া তাঁরা চান না সাধারণ প্রফেসর বা ডিরেক্টর হয়ে আইনস্টাইন যোগ দিন। তাঁর পদ হবে অধ্যাপকের,তবে লেকচার দেওয়া না দেওয়া তাঁর নিজের ব্যাপার, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের এডমিনিস্ট্রেশনে তাঁকে সময় দিতে হবে না। তিনি অধ্যাপক অথচ মগ্ন থাকবেন নিজের রিসার্চ নিয়ে। তাঁর মাইনে হবে বার্ষিক ১২০০০ মার্ক—যেখানে সাধারণ অধ্যাপকত্বের মান ৬০০০ মার্ক। এই ৬০০০ মার্ক দেবার কথা প্রথমে হয়েছিল, প্লাঙ্কের চেষ্টায় এটি দ্বিগুণে দাঁড়ায়।

একটি শুধু বাধা, আইনস্টাইন তাঁর সুইস নাগরিকত্ব বিসর্জন দিতে চান না। চান না জার্মান নাগরিকত্ব গ্রহণ করতে। প্লাঙ্ক, নার্নস্ট দুজনেই বললেন, এটা কোন সমস্যা নয়। আইনস্টাইনকে ভেবে দেখতে বলে দুজনে সুইজারল্যানডের রিগি পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতে গেলেন। কথা হলো, ফিরে এলে আইনস্টাইন তার মতামত জানাবেন। আইনস্টাইন বললেন, স্টেশনে তিনি তাঁদের রিসীভ করতে যাবেন। তাঁর কোটের বাটন-হোলে যদি সেদিন থাকে সাদা গোলাপ, তাহলে তিনি যাচ্ছেন না, আর লাল গোলাপ থাকলে তিনি বার্লিনে যেতে রাজি। রিগি থেকে জুরিখে স্টেশনে নেমে প্লাঙ্ক-নার্নস্ট আইন-স্টাইনকে প্লাটফরমে দেখলেন, বাটন-হোলে লাল গোলাপ। আইনস্টাইন বার্লিনে যেতে রাজি। দুই বিজ্ঞানী মহানন্দে ফিরে এলেন, তাঁদের এখন কাজ আইনস্টাইনকে বার্লিনে যোগ দেবার প্রস্তাবটি অফিসিয়েলি পাঠানো। প্লাঙ্ক স্বয়ং আইনস্টাইনের উপযুক্ততার উপর নোট লিখে শিক্ষা-মন্ত্রকের কাছে পাঠালেন। অতি সতর্ক, সুচতুর, সেই নোটে আইনস্টাইনের বহুমুখী প্রতিভার কথা জানিয়ে প্লাঙ্ক বললেন, Einstein must rank as a master—আইনস্টাইনকে ওস্তাদ বলে মানতে হবে।

একাদমি আইনস্টাইনের নিয়োগ অনুমোদন করে প্রস্তাব পাঠালেন গভর্নমেনটের কাছে, তারিখ ২৮শে জুলাই ১৯১৩ সাল। আর সেই বছরের ২০শে নভেম্বর তারিখে সরকারের অনুমোদন এল, তা ছাড়া অর্থদপ্তর যাতায়াতের খরচা বহন করতে রাজি হলেন। আইনস্টাইনের আসার দিনটি জানার অপেক্ষা। নার্নস্ট বললেন, "আইনস্টাইন আসবেন, আসবেন ঈস্টারের মধ্যে।" ৭ই ডিসেম্বরেই আইনস্টাইনের সম্মতি জানা গেল। ইতিমধ্যে E T H থেকে মুক্তি চেয়েছেন। তিনি বার্লিনে যাবেন, সেখানের বিজ্ঞানের পরিমণ্ডল তাঁর যুক্তিবোধকে শাণিত করবে, আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য পারিবারিক সুখের সম্ভাবনা এ-ন দেবে আর সবার উপরে তিনি দেখা পাবেন তাঁর দূর সম্পর্কের কাজিন এলসার। মিউনিকে ছেলেবেলার সঙ্গী এই কাজিনটির হাসিখুশি ব্যবহার তাঁর মনে আছে। সম্প্রতি বিধবা হয়ে দুটি কন্যাকে নিয়ে বাপের বাড়িতে ফিরে এসেছেন এলসা।

এলসার সঙ্গে নিত্য দেখা হবার আকর্ষণটুকু বার্লিনবাসের অতিরিক্ত প্রাপ্তি, তার মূল্য বা ওজন তাঁর কাছে অনেকখানি।

শিক্ষকতার একঘেয়েমি নেই, এডমিনিস্ট্রেশনের বাধ্যবাধকতা নেই, নেই অর্থের ভাবনা ; আছে কাজের সুযোগ, অবসরের জন্য আছে এলসার সাহচর্য। তাঁর পরিবার, তাঁর কাজ, তাঁর অবসর—আর কি চাই ? স্বর্গ কোথাও থাকলে সে আছে বার্লিনে, কাইজার ভিলহেলম ইনস্টিট্যুটে। জুরিখের বিদায় সংবর্ধনার পর বাড়ী ফিরতে ফিরতে সহকর্মী প্রফেসর কোলরোসকে বললেন, "বার্লিনের ভদ্রলোকেরা আমাকে নিয়ে বাজি ধরেছেন, আমি নিজেই জানি না আরেকটা ডিম পাড়ব কি না !"

ডিম পাড়বেন কিনা দ্বিধা থাকতে পারে, তবু বার্লিনের পরিমণ্ডলের আকর্ষণে জুরিখ ছেড়ে ৬ই এপ্রিল ১৯১৪ সালে রওনা দিলেন। ঈস্টারের ছুটির আগেই বার্লিনে এলেন। হাবের তাঁর জন্য একটা ফ্ল্যাট বার্লিনে বন্দোবস্ত করে দেন। খুশি আইনস্টাইন ১৯১৪ সালের গ্রীষ্মে বার্লিনে বাস শুরু করলেন।

পনের বছর বয়সে জার্মানি ছেড়ে গিয়েছিলেন আইনস্টাইন। ঠিক কুড়ি বছর পর আবার তিনি জার্মানিতে ফিরে এলেন। ছেড়ে আসা আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে আবার দেখা হলো —সেই বোকাহাবা, কূটকচালে তার্কিক ছেলেটির উন্নতি দেখে তারা খুশি। আইনস্টাইনের আত্মীয় বলে পরিচয় দিতেও সম্মান। আত্মীয়-পরিজনের কাছে সম্মান—এও এক সুখ ! বার্লিনে প্রথম কয়েকটা মাস বেশ সুখে কেটে যায়। সামনে ক্রিমিয়াতে ফ্রয়েন্ড্‌লিশ-এর অভিযান, তারই তোড়জোড় চলে—সূর্যগ্রহণ হবে আগস্ট মাসে। জার্মানিতে আসার পর থেকে আইনস্টাইন আর ফ্রয়েন্ড্‌লিশের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। তবু অভিযানের দিন যত এগিয়ে আসে ততই যেন তিনি উদাসীন হয়ে পড়ছেন, তাঁর নিজের কাজে তন্ময়তা ফুটে ওঠে, আপনভোলা স্বভাব আরো প্রকাশ পায়। ফ্রাউ ফ্রয়েন্ড্‌লিশ একদিনের ঘটনার উল্লেখ করেছেন। ফ্রয়েন্ড্‌লিশদের বাড়ী আইনস্টাইনের নিমন্ত্রণ ; খেতে খেতে গল্প-গুজবের মধ্যে হঠাৎ আইনস্টাইন খাবার প্লেট সরিয়ে, পকেট হাতড়ে কোন কাগজ না পেয়ে ডিনারের দামি টেবিলক্লথে অঙ্ক কষতে কষতে ফ্রয়েন্ড্‌লিশের সঙ্গে বিজ্ঞানের তত্ত্বের আলোচনা শুরু করলেন। দামি টেবিলক্লথের অবস্থা দেখে ফ্রাউ-এর চোখ ফেটে জল আসে। স্বামী বলেন, টেবিলক্লথ রেখে দিতে, আখেরে ভাল দাম পাওয়া যাবে। ফ্রাউ চটে মটে খানাপিনার পর ওটি কেচে ফেলেন। পঞ্চাশ বছর পর এই ঘটনার স্মৃতিচারণ করে ফ্রাউ বলেন, টেবিলক্লথটা রেখে দিলে বেশ পয়সা পাওয়া যেত।

যত্রতত্র অঙ্ক কষার প্রবৃত্তি আইনস্টাইনের স্বভাবে। সেই অলিম্পিয়া একাদমির কালেও দেখা গেছে, ছাত্র বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ আলোচনার কালে, কারো হাতে ছাতা টুপি ধরিয়ে দিয়ে উবু হয়ে বসে ঢিল বা খড়ি দিয়ে রাস্তার বুকে তিনি অঙ্ক কষছেন। পরেও দেখা গেছে, হাতের কাছে টেবিল নেই তো নিজের চেয়ারটাকে টেবিল

করে মাটিতে বসে অঙ্ক কষতে আরম্ভ করেছেন। তাঁর কাছে অঙ্ক করা, কাজ করাটাই আসল; উপকরণের অভাব কোন সমস্যা নয়।

ফ্রাউ ফ্রয়েন্‌ড্‌লিশের বলা আরেকটি গল্পে জানা যায়,আইনস্টাইন ফ্রয়েন্‌ড্‌লিশদের ডিনারে নিমন্ত্রণ করেছেন। যথা সময়ে ফ্রয়েন্‌ড্‌লিশরা হাজির, মিলেভাও তৈরি; খাবার সময় বয়ে যায়; কিন্তু গৃহকর্তার দেখা নেই। ফোন করে মিলেভা খোঁজ নিয়ে জানেন, তিনি ইউনিভার্সিটি ছেড়ে বাড়ি যাবেন বলে অনেক আগেই বেরিয়ে এসেছেন, আর কোন খবর তাদের জানা নেই। ঘণ্টা খানেক পর আইনস্টাইনের ফোন আসে—স্টেশনে তিনি বহুক্ষণ ধরে ফ্রয়েন্‌ড্‌লিশদের জন্য অপেক্ষা করে আছেন, ওদের কোন পাত্তা নেই। মিলেভা বলেন, সেকি! ও'রা তো আমাদের বাড়ীতে অনেকক্ষণ হলো এসে গেছেন। তখন আইনস্টাইনের মনে পড়ে, সেদিন স্টেশনে ফ্রয়েন্‌ড্‌লিশদের জন্য অপেক্ষা করার কথা ছিল না!

ভোলেভোলা সময়ের মধ্যে আইনস্টাইন তত্ত্ব গঠন করে চলেন। তাঁর ইনটিউশন তাঁকে যেন জানায়, তাঁর তত্ত্ব সঠিক—ক্রিমিয়ার সূর্যগ্রহণে যে তথ্য পাওয়া যাক না কেন তাঁর তত্ত্বে সংশয় নেই। একটি চিঠিতে বেসোকে তাঁর নতুন উপলব্ধির কথা জানালেন। বিচার বিশ্লেষণ করে তথ্যের উপর গড়ে তোলা তত্ত্বের চেয়েও জোরালো অনুভূতির বলে জানা, স্বজ্ঞাত জ্ঞানে। কিছুদিনের জন্য বিজ্ঞানী আইনস্টাইনকে ছাপিয়ে দার্শনিক আইনস্টাইনের আবির্ভাব ঘটে; হ্যামলেটের মতো হোরাসিওকে ডেকে, দার্শনিক আইনস্টাইন বিজ্ঞানী আইনস্টাইনকে বলেন, 'হোরাসিও, আমি আমার বাবাকে দেখেছি, দেখেছি চোখে নয়, মনের চোখে।'......মনের চোখে যাকে দেখা যাচ্ছে সেই সত্য; তথ্য যদি তা প্রমাণ করতে না পারে তথ্য ভুল; তথ্যকে পুনর্বার পরীক্ষা করে দেখতে হবে,—তথ্যের সত্যতা তত্ত্বের আলোকে।

১লা আগস্ট, ১৯১৪ সালে জার্মানি রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। ৪ঠা আগস্ট মহাযুদ্ধ বাধল; ফ্রয়েন্‌ড্‌লিশদের বন্দী করা হলো রাশিয়ায়; যা হোক ৯ মাস পরে ছাড়া পেয়ে অভিযাত্রী দল জার্মানিতে ফিরে আসে। সূর্যগ্রহণ হয়, চলেও যায়, তত্ত্বের প্রমাণে তথ্য পাওয়া যায় না। এদিকে মিলেভার সঙ্গে সম্পর্কে চিড় ধরে। মিলেভা রুগ্‌ণ, মেলাঙ্কোলিয়া রোগের শিকার, কিছুটা সন্দেহ বাতিকগ্রস্ত। আইনস্টাইনকে সন্দেহ করেন; জার্মানিতে থাকতে চান না। দুটি ছেলেকে নিয়ে সুইজারল্যানডে বেড়াতে এলেন। গ্রীষ্ম শেষে হেমন্ত এল, শেষও হলো—মিলেভা ফিরে আসেন না, ছেলেরাও নয়; জার্মানিতে প্রথম ক্রিসমাস ছুটি প্রোষিতপত্নীক আইনস্টাইন অধ্যাপক নার্নস্টের বাড়িতে কাটালেন। ক্রিসমাসের পরও মিলেভা ফিরলেন না—আইনস্টাইন তাঁকে ডেকে নিলেন না। দুজনের বিভেদ আরম্ভ হলো; মিলেভা আর ফিরলেন না।

প্রথম মহাযুদ্ধের শুরুতেই আইনস্টাইনের পারিবারিক জীবনে ভাঙন ঘটে গেল, ফ্রয়েন্‌ড্-

লিশের প্রজেক্টও বিধ্বস্ত। যুদ্ধের সহযোগী অধ্যাপক বিজ্ঞানীরা সামিল হচ্ছেন,—হাবের জার্মানির রণসজ্জায় উল্লেখযোগ্য হাতিয়ার যুগিয়ে গেলেন—সেই হাবের মিলেভা-এলবার্টের মধ্যে সমঝোতা আনার চেষ্টায় ব্রতী হলেন। আইনস্টাইন অনড়, মিলেভাও তাঁর সঙ্কল্পে অটুট। অন্যদিকে যুদ্ধের ডামাডোলে দুই ছেলে আর মাকে কি করে টাকা পাঠাতে হবে—এটাই একমাত্র সমস্যা! আবার মিলেভার এই ছেড়ে যাওয়া আইনস্টাইনের কাছে যেন মুক্তির আশ্বাস। তাঁর উপলব্ধি সঞ্জাত তত্ত্বের গঠনে তিনি একমনা একপ্রাণ হয়ে দাঁড়ালেন। বাইরের জগতে কি ঘটেছে তার ছাপ মনে গভীরভাবে দাগ কাটে না। মিলেভা, যুদ্ধ, এসব প্রক্ষিপ্ত সাময়িক ঘটনা; এদের তুচ্ছ করলে ক্ষতি নেই।

বাইরের জগৎকে তিনি তুচ্ছ করতে চাইলেও বাইরের জগতের আঘাত বারবার হানা দেয়। মিলেভা আর তাঁর দুই ছেলেদের ভাবনা দূরে ঠেলে রাখা যায়—দূরে রাখা যায় না সহকর্মীদের উপস্থিতি আর তাদের মতবাদ। একেক করে বন্ধু-সাথীরা যুদ্ধের সামিল হয়ে দাঁড়ান; বিজ্ঞানের সহায়তায় যুদ্ধের হাতিয়ার-বন্ধ জোয়ানের রূপ প্রবল হয়ে ওঠে। তাঁর সহকারী লুডউইগ হফ জার্মানির এয়ার-মন্ত্রকে যোগ দেন, প্রাক্তন সহকারী অটো স্টার্ন পুবদিকের ফ্রনটে চলে যান। মাক্স বোর্ন যুদ্ধ দপ্তরে কাজ নেন। আর আইন-স্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব গঠনে যে জ্যোতির্বিদের সহায়তা অনন্য সেই স্থওয়ারৎস্-চিল্ড (Schwarzchild) ঈস্টার্ন ফ্রনটে জার্মান বাহিনীর গণিতের এক্সপার্ট হয়ে চলে যান। নার্নস্ট যুদ্ধ মন্ত্রকের কনসালটেনট হয়ে শেলের রাসায়নিক দিক দেখেন, পরে কমিশন নিয়ে চলে যান। ইহুদি ফ্রিৎস হাবের মেডিকেল পরীক্ষায় অসফল হওয়ায় যুদ্ধের সক্রিয় সৈন্য হতে পারেন না। তিনি যুদ্ধ দপ্তরের সহায়তায় তাঁর রাসায়নিক জ্ঞানের প্রয়োগ করেন; গ্যাসোলিনের উপর কাজ, এমোনিয়া উৎপাদনের সফল বাণিজ্যিক রীতি, আর সবার উপরে যুদ্ধে বিষাক্ত গ্যাসের ব্যবহারে তাঁর অবদান জার্মানির যুদ্ধ প্রচেষ্টায় তাঁর নিজস্ব নিবেদন। ইহুদি হাবের বিশ্বাস করতেন, শান্তির সময় বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর জন্য, যুদ্ধের সময় তারা শুধু নিজ নিজ দেশের!

যুদ্ধ একাদমিকে গ্রাস করল। যাঁরা কিছুদিন আগে ছিলেন বিজ্ঞানী, যুদ্ধের সময় তাঁরা যুদ্ধব্রতী। রাজনৈতিক-ধর্মীয় ভেদাভেদ, শ্রেণী সংগ্রাম সব কিছু মিলিয়ে দিয়ে যুদ্ধ একটি আইডিয়াতে জার্মানিকে এক করে তুললো—সেটি জার্মান জাতীয়তাবাদ।

অন্যদিকে শিবিরে একই রূপ। ব্রিটেনে লিনডামান এয়ারক্রাফটের-টেস্ট-পাইলট; ফ্রান্সে মাদামকুরী এম্বুলেন্স ড্রাইভার। রাদারফোর্ড ও লাজ'ভ্যাঁ এনটি-সাবমেরিন প্রকল্পের কর্মী। যুদ্ধ দুই শিবিরের বিজ্ঞানীদের গ্রাস করেছে। জার্মানির বিজ্ঞানীদের যুদ্ধের জন্য এই বেশ্যাবৃত্তিকে আইনস্টাইন সহ্য করতে পারছেন না। তাঁর যুক্তি জার্মানি আক্রমণকারী—তাকে সাহায্য করা অন্যায়। মিত্রপক্ষের বিজ্ঞানীরা সেই অন্যায়কে রুখতে যুদ্ধের সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন। তাঁর যুক্তি যেমনই হোক, ব্যবহারিক জীবনে

তিনি তেমন জোরদার প্রতিবাদ তোলেননি—তাঁর মাইনের বেশ খানিকটা আসত শিল্পবিদ কোপেলের কাছ থেকে—জার্মান যুদ্ধ প্রচেষ্টায় যার আর্থিক সাহায্য অসামান্য। যুদ্ধ-ব্যবসায়ী কোপেলের টাকায় আইনস্টাইনের গ্রাসাচ্ছাদন, অবসর বিলাস, কাজের নিরাপত্তা; অন্যদিকে জার্মানির যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে তিনি সর্বান্তকরণে ঘৃণা করছেন—সেই ঘৃণায় জার্মানির শত্রুদের যুদ্ধোদ্যমকে তিনি সহজে মেনে নিচ্ছেন। কৈশোরে জার্মান বিধি নিষেধ অনুশাসন বা ৎস্বয়াঙ-এর বিরোধী আইনস্টাইন পূর্ণ যৌবনেও জার্মানির অনুশাসন বিরোধী।
অক্টোবর ১৯১৪ সালে জার্মানির বুদ্ধিজীবী-সমাজ সারা পৃথিবীর উদ্দেশে এক মেনিফেস্টো প্রচার করলেন, উদ্দেশ্য জার্মানির যুদ্ধের উদ্যোগের সাফাই গাওয়া। মোটমাট ৯৩ জন মনীষী এটিতে সই করেন—এক্স-রে'র আবিষ্কারক প্রথম নোবেল পুরস্কার বিজয়ী রোনটগেন থেকে শুরু করে আছেন বড় বড় দার্শনিকরা, এমন কি স্বয়ং মাক্স প্লাঙ্ক। এর প্রত্যুত্তরে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের জর্জ নিকোলাই প্রচার করেন 'ইউরোপীয়দের প্রতি মেনিফেস্টো'। আইনস্টাইন যে শুধু এটিতে সই করেন, তা নয়, অনেকের সন্দেহ এটির মুসাবিদাতে তাঁর হাত ছিল। এই মেনিফেস্টো সই করেন মাত্র চারজন—নিকোলাই, আইনস্টাইন, অটোবাক এবং আশি বছরের বৃদ্ধ ভিলহেলম ফর্স্টের; মজা এই যে বৃদ্ধ ফর্স্টের ৯৩ জনের মেনিফেস্টোরও স্বাক্ষরকারী।
আর এই সময়েই, শান্তির প্রচেষ্টায় রত হয়ে তিনি একটি রাজনৈতিক দলের সভ্য হলেন পার্টির নাম Bund neues Vaterland; এই পার্টির উদ্দেশ্য দ্রুত শান্তি ফিরিয়ে আনা আর একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠন করা যেটি ভবিষ্যৎ যুদ্ধকে নিবারিত করবে। জার্মানিতে Bund-এর অপমৃত্যু হয়, তবে Bund-এর বক্তব্য আইনস্টাইনের মনে গাঁথা হয়ে থাকে; শান্তি আর শান্তির জন্য আন্তর্জাতিক সংগ্রাম—ভবিষ্যতে এই তাঁর গানের সুর, কল্পনার কবিতা, চিন্তার ফসল।
যুদ্ধের ডামাডোলের বাজারে তাঁর সুইস পাশপোর্ট বেশ কাজে লাগে, সহজেই সুইজারল্যানড বা হল্যানডে আসতে পারেন। স্ত্রী মিলেভাকে সাদামাটা চিঠি লেখেন, আর যুদ্ধের কথা, তাঁর চিন্তা-ভাবনার কথা জানিয়ে চিঠি লেখেন লরেন্সকে, এরনফেস্টকে। ১৯১৫ সালে স্ত্রী-পুত্রদের সঙ্গে দেখা করতে সুইজারল্যানডে আসেন। এইবারে বিখ্যাত শান্তিবাদী ঔপন্যাসিক রম্যা রোলাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। রোলাঁ তাঁর এনটি জার্মানি বিশ্বাস দেখে বিস্মিত হন। ইংল্যানডকে পছন্দ করেন না, তবু এই যুদ্ধে আইনস্টাইন ইংরেজদের জয় চান। কারণ ইংল্যানডের জয় পৃথিবীকে দ্রুত পুরনো জীবন ফিরিয়ে আনায় সাহায্য করবে। রোল্যাঁ তাঁর জার্নালে এই আলোচনার সুদীর্ঘ বিস্তৃত বর্ণনা লিখে রাখলেন।
মিলেভার সঙ্গে দেখা হয়, তবে কোন মিটমাট হলো না। অন্যদিকে যুদ্ধ শেষ হবার সম্ভাবনাও দেখা যায় না। রোল্যাঁর কাছ থেকে মানবতাবাদে দীক্ষা নিয়ে জার্মানিতে ফিরে এলেন আইনস্টাইন—তাঁর জার্মানির সমালোচনার উগ্রতা যেন এবার কিছু কম।

কোথাও যেন একটু সহানুভূতির আঁচড় দেখা দেয়। জার্মানির নতুন আকাশযানের গবেষণায় আইনস্টাইন একটি ছোটখাট অংশও নেন। পরে এই অংশ নেবার জন্য নিজেকে দোষী ভেবে এসেছেন অবশ্য।

১৯১৬ সালে আবার সুইজারল্যানডে এলেন—মিলেভার সঙ্গে দেখা হলো। মনকষাকষির চূড়ান্ত ঘটে গেল এইবারে। বেসোকে চিঠি লিখে আইনস্টাইন জানালেন, আর নয়, মিলেভাকে দেখতে আর তিনি যাবেন না। বড় ছেলে হান্স বাবাকে চিঠি লেখা বন্ধ করে; পারিবারিক সম্পর্ক যতটুকু বজায় ছিল, সেটুকুও রইল না। সুইজারল্যানডে মিলেভা অসুস্থ হন, শয্যাশায়ী, নড়াচড়া করতে পারেন না, নড়াচড়া করাও বারণ; বেসো একবার তাঁকে মিলেভাকে দেখে যেতে লেখেন। আইনস্টাইনের উত্তর, না। মিলেভা হাসপাতালে রইলে তিনি তাঁকে দেখতে ভিজিটিং আওয়ার্সে যাবেন; কোনরকম ইমোশনেল দৃশ্য তৈরি করতে চান না। ছেলেদের দেখা তিনি চান অন্য কোন জায়গায়—যেখানে তাদের মা নেই! বেসো মিলেভাদের পরিবারটির ভার নেন। ছেলেদের স্কুলে পাঠান, মিলেভার চিকিৎসার খরচাপাতির হিসেবনিকেশ, বিলিব্যবস্থার দায় বেসোর হাতে। দীর্ঘ চিঠি লিখে এদের খবর তিনি আইনস্টাইনকে জানান। আইনস্টাইনের দায়িত্ব শুধু টাকা পাঠানো। এ সময়ে ছোট ছেলে এডুয়ার্ড অসুস্থ হয়ে পড়ে। ডাক্তাররা বলেন স্ক্রুফুলা অর্থাৎ লিম্ফ গ্ল্যানডে যক্ষা। বেসোর চিঠিতে এ খবর পান আইনস্টাইন; তবু, সুইজারল্যানডে যান না।

যুদ্ধের তীব্রতা বাড়ে, যাতায়াতের সুযোগ কমে আসে। তবু ১৯১৬ সালে লরেন্সের আমন্ত্রণে আরেকবার হল্যানডে যান। হল্যানড থেকে বার্লিনে ফিরে অনেক দিন পর বন্ধু এডলারের খবর পান। এডলার ১৯১২ সালে সুইজারল্যানড ছেড়ে ভিয়েনার সোশাল ডেমোক্রেট পার্টির মুখপত্রের সম্পাদক হয়েছিলেন। রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে এডলারের বৈজ্ঞানিক সত্তা হারিয়ে গিয়েছিল। ১৯১৬ সালের অক্টোবরে তিনি ভিয়েনায় প্রাইম মিনিস্টারকে গুলি করে হত্যা করেন, কারণ সরকার পার্লামেনট ডাকতে চান নি! এডলার জেলে। আইনস্টাইন তাকে সাহায্য করতে চান; এডলারের জবাব, কোন প্রয়োজন নেই। জেলে বসে এডলার রিলেটিভিটির উপর বই লেখেন, Local Time, System Time, Lone Time; ১৯১৭ সালে ১৪ জুলাই আইনস্টাইনের কাছে মন্তব্য চেয়ে এডলার তাঁর বইয়ের পাণ্ডুলিপিটি পাঠালেন। সেই বইটির অন্য কপি বিভিন্ন মনস্তত্ত্ববিদদের কাছে পাঠান হলো, উদ্দেশ্য এডলারের মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছে কিনা জানা। বইটির অন্যান্য কপিও পাঠান হলো পদার্থবিদদের কাছে। দেখা যায়, এডলারের বই-এ তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতির চিহ্ন নেই; যা আছে সেটি হলো, রিলেটিভিটি তত্ত্বের প্রাথমিক ধারণাতে গোলমাল। আইনস্টাইনের একই মত। যা হোক এই সময়ে বন্ধুকে বাঁচানোর জন্য আইনস্টাইন একটি আবেদন করেন। এরও খুঁটিনাটির দায়িত্ব পড়ে

বেসোর উপর। বন্ধুকে চিঠিতে লেখেন নিজের খবর, কাজের খবর, চিন্তাভাবনা; আর একই সময়ে বেসোকে লেখেন জটিল মামলার বিষয়বস্তুতে পরামর্শ দিয়ে; বন্ধুর কাছে লেখা চিঠিতে আইনস্টাইন ছেলেমানুষ, স্বপ্নের আমেজে ভরা আর বেসোকে লেখা চিঠি একজন স্বাভাবিক বিষয়ী মানুষের মতো জটিল বাস্তববাদী। বেসোকে লেখেন, আসামী বিজ্ঞানী, বিবেকবান পুরুষ, কিছুটা একগুঁয়ে, বাস্তবজ্ঞান বর্জিত; আত্মহত্যার প্রবণতা আছে আর আছে আত্মনিগ্রহের প্রবৃত্তি। এই মানুষটির কোন্ অংশটির উপর জোর দিতে হবে, কোথায় লাগাতে হবে সহানুভূতি-কল্পনার প্রলেপ, এইসব বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির মতো তিনি বেসোকে নিপুণ পরামর্শ দিচ্ছেন। বন্ধু এডলারকে ঠিকই চিনেছিলেন আইনস্টাইন, চিনেছিলেন নিজের স্বভাবের আয়নায়—বেসোকে লেখা এই চিঠিগুলিতে তাঁর নিজের মনের জটিল চরিত্রটিকে উজাড় করে দিয়েছিলেন। যা হোক, ১৮ মাস পরে এডলার মুক্তি পান। আর আইনস্টাইনের রিলেটিভিটি তত্ত্ব মাথা খারাপের চিহ্ন কিনা সেই সন্দেহ আরেকবার দানা বেঁধে ওঠে।

আর এই ১৯১৬ সালে আইনস্টাইন সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের গঠনে শেষ তুলির টান দিলেন। সংসারে অশান্তি, যুদ্ধ, শান্তি প্রচারের নাটকে অভিনেতার ভূমিকা, বন্ধুর বিপদ, সব মিলিয়েও তাঁকে তাঁর কাজ থেকে সরিয়ে নিতে পারেনি। বন্ধু এডলারকে লেখা এই সময়ের চিঠিতে তাঁর সংশয়, নিঃসঙ্গতা আর মানুষের অধিকার সম্পর্কে তাঁর ধারণার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। আর লেখা হয়েছে তাঁর দৈহিক অসুস্থতার ইতিবৃত্ত। তাঁর পেটে অসহ্য ব্যথা—আইনস্টাইনের ধারণা তাঁর পেটে ক্যানসার হয়েছে। কষ্টের, অসুস্থতার দিনগুলিতে নতুন ব্যাচেলার আইনস্টাইনের দেখাশোনা করেন বন্ধুবান্ধবরা, ফ্রয়েন্ড্‌লিশ ও ম্যাক্স বোর্ন। মৃত্যুভয় তাঁর নেই। "আমি নিজেকে জীবনপ্রবাহের একটি অংশ বলে মনে করি। এই অনন্ত প্রবাহের কোন এক বিশেষ অস্তিত্বের আরম্ভ বা শেষ নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই।" যে অনুদ্বিগ্নতার সাধনা তিনি প্রাগে আরম্ভ করেছিলেন, নিজের ব্যক্তিগত বিষয়ে অনুভূতিশূন্যতা যেন তারই রেশ। কোন ব্যক্তিগত সত্তার ধারণা তাঁর বিজ্ঞানে নেই, তাঁর দর্শনে নেই ব্যষ্টির অনন্যতার চিন্তা। তবু উপলব্ধির ব্যাখ্যা তাঁর জগতে থাকে—যা প্রপঞ্চময় জগতে প্রমাণিত করা যাবে।

এ সময়ের চিঠিতে তাঁর বিজ্ঞান-দর্শনের অমূর্ত ধারণার কথা প্রকাশ পাচ্ছে—তাঁর বিজ্ঞান কঠিন ও কঠোর, অথচ সে নীরস নয়। ফ্রাউ হেডউইগ বোর্ন—বিজ্ঞানী ম্যাক্স বোর্নের স্ত্রী—অসুস্থ আইনস্টাইনকে সেবা করতে এসে একদিন জিজ্ঞেস করেন, "সব কিছু বিজ্ঞান দিয়ে বোঝান সম্ভব, আপনি একথা বিশ্বাস করেন?" আইনস্টাইন বলেন, "হ্যাঁ, এ সম্ভব। তবে এই ব্যাখ্যা অর্থহীন। যেমন বিঠোফেনের সিমফনি—তরঙ্গের চাপের পরিবর্তনের ব্যাখ্যা দিয়ে এটিকে বোঝানো যেমন, তেমনি নির্বোধ এই বোঝাবার চেষ্টা।" অসুখের কষ্টে, একাকিত্বের যন্ত্রণায় তিনি আরো অন্তর্মুখী হয়ে ওঠেন। ফ্রাউ বোর্নকে

একদিন বলেন, 'পৃথিবীর কারো মৃত্যুতে আর অস্থির উদ্বিগ্ন হই না।" স্ত্রী আর দুই সন্তান থেকে বিচ্ছিন্ন এই একাকী-বিজ্ঞানীর নির্মম শূন্যতা দেখে ফ্রাউ বোর্ন বিচলিত হন। মনে হয়, বুঝি আইনস্টাইন পার্থিব দুঃখ কষ্ট বোধের উর্ধ্বে উঠে গেছেন! এই অনুভূতিহীন ব্যক্তিগত অবস্থা বহুদিন বজায় থাকে। তারপর একদিন তাঁর মা, যিনি শেষ কদিন তাঁর ছেলের কাছে কাটাতে এসেছিলেন, সেই বৃদ্ধার মৃত্যু হলো। আইনস্টাইন সাধারণ মানুষের মত কান্নায় ভেঙে পড়েন। বন্ধুরা তাঁর কান্না দেখে আশ্বস্ত হন, পাষাণ হৃদয়ে আবার অনুভূতি জেগেছে। আর আইনস্টাইন বন্ধু গুস্তাভ বাকে-কে চিঠি লেখেন, "মনে হয় এখন থেকে যে কটা দিন আমরা একসঙ্গে কাটিয়েছিলাম, সেই দিন কটির সুখস্মৃতি সারাজীবন ভরে থাকবে।"

এই নিঃসঙ্গ, একাকিত্বে ভরা কর্মহীন জীবনে আইনস্টাইন তাঁর কাজিন এলসার স্নেহস্পর্শ পান। বিধবা এলসার দুটি কন্যা। বড় ইলসের বয়স কুড়ি, ছোট মার্গটের বয়স আঠারো। সাধারণ ছোটখাট, ক্ষীণ দৃষ্টি, হাসিখুশি ভরা এলসা। অসুস্থ আইনস্টাইনের পাশে দাঁড়িয়ে ১৯১৭ সালে তাঁর দায়দায়িত্ব হাতে তুলে নিলেন। কিছুটা সুস্থ হয়ে ১৯১৭ সালের প্রথমে আইনস্টাইন সুইজারল্যানডে আসেন; মিলেভার সঙ্গে দেখা হয় না; সময় কাটান মাজার সঙ্গে লুসার্নে। আর আরেকবার দেখা করেন রম্যাঁ রোলাঁর সঙ্গে। এবারেও তাঁর একটি জার্মানি বক্তব্য শুনে রোলাঁ ব্যথিত হন। তাঁর বন্ধুরাও তাঁর জার্মান-বিরোধী মতবাদের সোচ্চার ঘোষণায় ভীত হন। তাঁদের ইচ্ছা, তিনি সুইজারল্যানডে থেকে যান। আইনস্টাইন অবশ্যই এই ইচ্ছার শরিক হন না। আরোসা অঞ্চলে দুই ছেলেকে নিয়ে এক সপ্তাহ কাটিয়ে আবার জার্মানি ফিরে আসেন। পেটের ব্যথার কারণ ডাক্তাররা স্থির করতে পারলেন। ক্যানসার নয়। অনিয়ম, অনিদ্রা, খাওয়া-দাওয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণ যথেচ্ছচার, সব মিলিয়ে তিনি অসুখটি বাঁধিয়েছেন; এটি এখন ক্রনিক ব্যাধিতে দাঁড়িয়েছে—তাঁর সারা জীবনের সঙ্গী। প্রায় ২৮ কেজি ওজন অসুখে হারিয়েছিলেন। সুইজারল্যানডে বিশ্রামের পর অনেক সুস্থ হয়ে উঠলেন তিনি।

যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির মধ্যেও আইনস্টাইনের আয় কমেনি, মাইনের উনিশ-বিশ হয় নি। বার্ষিক ১২০০০ মার্কের মধ্যে ৭০০০ মার্ক পাঠাতেন মিলেভাদের, ৬০০ মার্ক মাকে। বাকি কিছু নিজের জন্য খরচ। সেখানেও যৎসামান্য খরচ করতেন। তখন অবশ্য তিনি নিয়মিত চুল কাটছেন, তবে জামা কাপড় সাধারণ আর তারও ঠিক ঠিকানা নেই; মোজা পরতেন কম; কোন বিলাস নেই। তামাকের নেশা, চুরুট আর পাইপের নেশা শুধু বাড়তির দিকে। এলসার স্নেহদৃষ্টি জীবনে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনে। ১৯১৭ সালের গ্রীষ্মে বোহেমিয়ান আইনস্টাইন বাড়ি বদল করে এলসার কাছাকাছি ৫ নম্বর হেবার লেনডস্ট্রেস বাড়িটিতে বাস করতে এলেন। এই বাড়িতে বেশ কয়েক বছর কাটালেন তিনি। ইতিমধ্যে স্থির করেছেন এলসাকে বিয়ে করবেন, এলসাও রাজি। বাকি

শুধু মিলেভার কাছ থেকে ডিভোর্স পাওয়া।

এই ব্যাপারেও বেসো তাঁর সচিব ও বন্ধু। বেসোকে লেখা চিঠিগুলিতে আইনস্টাইন নিজেকে নিরাবরণ প্রকাশ করেছেন। এখানে তিনি সরল বুদ্ধিমান, আপলভোলা বিজ্ঞানী নন; এ চিঠিগুলির প্রতি ছত্রে একজন সমবেদনাশীল, অভিজ্ঞ, স্থিতধী অথচ জটিল একটি মানুষকে পাওয়া যায়। আইনস্টাইন জানেন, মিলেভা অসুস্থ, প্রায় চলনশক্তি-হীন। মিলেভার জন্য তাঁর সমবেদনা আছে, দূর থেকে ভালবাসা, স্নেহ; মিলেভাকে তবু কাছে টেনে নিতে পারেন না। তাঁর বিশ্বলোকে মিলেভা অতি সুন্দর একটি দূরান্তের তারকা। বেসোকে লিখলেন, মনের অসম্ভব জোরে যদি তিনি মিলেভাকে সরিয়ে না রাখতেন, তিনি ভেঙে পড়তেন। মিলেভার নৈকট্য তাঁর কাছে এতই অসহনীয় যে তিনি তাঁর ছেলেদের ছাড়তেও রাজি। অথচ তিনি জানেন মিলেভার অসহায়তা, তাঁর অসুস্থতা। দুজনের জন্য দুজনের শ্রদ্ধা আছে, নেই সহনশীলতা; দুটি ব্যক্তিত্ব এক বিন্দুতে মিলতে যখন পারছে না, তখন ডিভোর্স বাঞ্ছনীয়! এই বিচ্ছেদের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব বেসোর—দুই ছেলের দেখাশোনার দায়িত্বও তাঁর। মিলেভা ডিভোর্সে রাজি। একটি শুধু শর্ত ছিল সেটি আইনস্টাইনের নোবেল পুরস্কারের টাকা নিয়ে। ১৯১৮ সালে আইনস্টাইনের নোবেল পুরস্কার পাবার সম্ভাবনা দেখা দেয়নি। তবু মিলেভা স্থির নিশ্চয়, নোবেল পুরস্কার তাঁর এলবার্ট নিশ্চয় পাবেন। ঠিক হয় পুরস্কারের টাকাটা মিলেভাই পাবেন—সেই টাকার সুদে মিলেভা আর তার দুই ছেলের সংসারের মোটা ভাত-কাপড়ের সংস্থান হবে।

বেসো বিচ্ছেদের কাজে এগিয়ে যান। মিলেভার সঙ্গে বিয়ের পর প্রথম লেখা চিঠিতে আইনস্টাইন বেসোকে লিখলেন, "আমি এখন বিবাহিত, সুখী স্বচ্ছন্দ দাম্পত্য জীবনের অধিকারী। ঘর সংসার ভালই চালাচ্ছেন তিনি, রান্নাবান্না বেশ করেন, বেশ হাসিখুশি মেজাজ।" সেটা ১৯০৩ সাল। ১৯১৮ সালে বেসোর কাছ থেকে ডিভোর্সের কাগজপত্র পেয়ে হাল্কাভাবে লিখলেন, "বুঝলে, চেনাজানা সব লোকদের মুখে শুনবে আমাদের ডিভোর্সের চুটকি।" ১৯১৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ডিভোর্স হয়ে যায়। একটি সম্পর্কের শেষ হয়। বিচ্ছেদের পর ১৯১৯ সালে এলসার সঙ্গে আইনস্টাইনের বিয়ে হয় আর সেই পাঁচ নম্বর বাড়িতেই তাঁরা থাকেন। কিছুদিন পরে বেসো লেখেন মিলেভা অসুস্থ, খুবই অসুস্থ। অসুখটা সম্ভবত মস্তিষ্কের যক্ষ্মা। এলবার্ট আইনস্টাইনের কাছে এটি তখন একটি খবর মাত্র! সেদিন তাঁর কাছে আরেকটি খবরের মূল্য অনেক বেশি। ১৯১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জার্মানির পতন হলো। ৯ই নভেম্বর কাইজারের পদচ্যুতি হলো, প্রতিষ্ঠা হলো জার্মান রিপাবলিকের। আর আইনস্টাইন জানলেন ব্রিটিশ বিজ্ঞানীদল ১৯১৯ সালের পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণকালে তাঁর সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বের প্রমাণের জন্য অভিযান করছেন।—পরাজিত জার্মানির বিজ্ঞানীর তত্ত্বের প্রমাণের জন্য এগিয়ে এলেন বিজয়ী ব্রিটিশ দলের বিজ্ঞানীরা!

১৯১৪ থেকে ১৯১৮ সাল, প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের চার বছর, তারই এধারে ওধারে আরো একটি করে বছর নিয়ে ১৯১৩ সাল থেকে ১৯১৯ সাল, এই ছয়টি বছর, আইনস্টাইনের জীবনে আরেকটি মহাযুদ্ধের কাল—সেখানে জয়-পরাজয়, লাভ-লোকসান, ক্ষয়-ক্ষতি, দেনা-পাওনার হিসেব-নিকেশের খেরো খাতা লাল-কালো অক্ষরে ঠাসা। প্রাগ থেকে জুরিখে আসা, গ্রোসমানের সঙ্গে সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের গঠনের চেষ্টা, জুরিখ থেকে কাইজার ভিলহেলম ইনষ্টিট্যুটে যোগ দেওয়া, যুদ্ধ, রোলাঁ্যার সঙ্গে আলাপ, এডলারের বিপর্যয় সৃষ্টি করা ঘটনা, ৯৩ জনের মেনিফেস্টোর প্রতিবাদ, শান্তিবাদের নবাঙ্কুরের আবির্ভাব, এইসব জটিল কার্যকরণ একদিকে ; অন্যদিকে মিলেভার সঙ্গে বিচ্ছেদ আর এলসার সঙ্গে বিয়ে—জটিল পারিবারিক সম্পর্কের টানাপোড়েন। আর সবার উপরে তাঁর জটিলতম বিজ্ঞানের কাজ। সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্ব, যেখানে উপলব্ধিকে মেনে নেওয়া হলো এবং আরো একটি তত্ত্ব, যেখানে সাময়িক হলেও আকস্মিকতাকে, Chance-কে মেনে নেওয়া হলো। এ সবই মিলে যাচ্ছে একটি বিন্দুতে, যেখানে ছুটি অভিযাত্রীদল সূর্যগ্রহণকালে পূর্ণগ্রাসের আগে পরে তারার ছবি তুলছেন ; নতুন জগতের ইটের গাঁথনির শুরু হলো। ৭ই নভেম্বর ১৯১৯ সালে একটি পর্যায়ের শেষ ; ছটি বছরে ঋতুচক্র আবর্তিত হয়েছে, ঘটনার অঙ্কুর বনস্পতি হয়ে দাঁড়িয়েছে, ছেঁড়াখোঁড়া ফুলপাতা উড়িয়ে ঝরিয়ে যে মালা গাঁথা হলো সে মালা আইনস্টাইনের জন্য। সব ঘটনা তুচ্ছ হয়ে যেটি বড় হয়ে দাঁড়ায় সেখানে থাকেন বিজ্ঞানী আইনস্টাইন, যিনি নিউটনের বহু আকাঙ্ক্ষিত ঈশ্বরের মস্তিষ্ক—"The Sensorium of God।"

মহাযুদ্ধের পর ক্ষতবিক্ষত জার্মানির দিকে তাকিয়ে আইনস্টাইনের সহানুভূতি জাগে। বিধ্বস্ত জার্মানির মধ্য থেকে হয়তো বা তৈরি হবে নতুন জার্মানি—গণতন্ত্রী, পরমতসহিষ্ণু এবং সংস্কৃতবান। যে রাজনৈতিক পার্টি Bund-এর সভ্য যুদ্ধের শুরুতে তিনি হয়েছিলেন, সেই পার্টির আবার উদ্ভব হলো—আইনস্টাইন তার কার্যকরী সমিতির সভ্য। যুদ্ধের শেষের কয়েক মাসে তাঁর বক্তব্যের অসঙ্গতি আর বৈপরীত্য তাঁকে হাস্যকর করে তুলেছিল। কখনো তিনি জার্মানির জন্য লড়ছেন, কখনো জার্মানির বিরুদ্ধে বিষোদগার করছেন, কখনো ইংরেজ বা মিত্র শক্তির ব্যবহারে ক্ষুব্ধ, আবার পরমুহূর্তে তাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। লয়েড জর্জ বললেন, আইনস্টাইন যেন এক নরম বালিশ ; শেষে যে মাথা রেখে শুয়েছিল সেই ছাপ বালিশে আঁকা।—আইনস্টাইন তাঁর বক্তব্যের অসঙ্গতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। তাঁর মন্তব্য, পরিবর্তিত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে, বিভিন্ন আচরণের প্রকাশ স্বাভাবিক, বক্তব্যের প্রবহমানতাও স্বাভাবিক। অবস্থার উপর সবকিছু নির্ভর করে, দেশকালের জগতে যেমন কোন কিছু এবসল্যুট, চরম বা পরম নয়, সব কিছু আপেক্ষিক—আচরণের জগতেও নেই বাঁধাধরা নিয়ম। মানুষকে স্থির অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অথবা একটিমাত্র সম্ভাবনার সাপেক্ষে অনেক সময় মনে হয় যুক্তিহীন, জটিলতা ভরা ; আচরণ অবস্থার

দাস, আর এই আচরণেই মানুষটির প্রকাশ।

মন্তব্যটি বেশ সিরিয়াসলি আইনস্টাইন ঘোষণা করলেন। এটি তিনি যে বিশ্বাস করতেন বা মানতেন, সেরকম প্রমাণ নেই। অন্যদিকে তাঁর জীবন ও কাজের অসঙ্গতির ব্যাখ্যায় অনেকে এই মন্তব্যটির যথেষ্ট মূল্য দিয়ে থাকেন।

১৯১৯ সাল। যুদ্ধের পর আইনস্টাইন, নতুন গৃহস্থ আইনস্টাইন, বাইরের পৃথিবীতে বিজ্ঞানের গুহা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছেন; তাঁর মতামতে, আচার-আচরণে সেই এলোমেলো ডানা ঝাপটানোর ইশারা।

এর আগে, ঠিক হয় ১৯১৮ সালের ডিসেম্বরে ক্ষুধার্ত জার্মানির খাদ্যের জন্য আইনস্টাইন প্যারিসে যাবেন। নানা কারণে প্যারিসে যাওয়া হলো না, তিনি গেলেন জুরিখে। কিছুদিন আগে জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয় আর E T H থেকে তার অধ্যাপকত্বের আমন্ত্রণ এসেছিল; আইনস্টাইন সেই অফার নাকচ করলেন। অন্যদিকে বছরে এক বা দুবার,এক বা দেড় মাসের জন্য সুইজারল্যানডে বক্তৃতা সফরে আসতে রাজি হলেন। কোন টাকা পয়সা নেবেন না, যাতায়াত আর রাহা খরচা এই পেলেই চলবে। বেসোকে লিখলেন, বার্লিনের বন্ধুরা তাকে ভুল বোঝে, এটি তিনি চান না। অন্যদিকে জুরিখ বা সুইজারল্যানডে আসার একটা সুবিধে আছে, ডিভোর্সের শেষ মুখে সুইজারল্যানডে থাকা নানা কারণে দরকার।

১৪ই জুন ১৯১৯ সালে ডিভোর্স অনুমোদিত হলো। মিলেভার সঙ্গে দেখা করতে আর বাধা নেই। চুক্তি অনুযায়ী মিলেভা খোরপোশ পাবেন আর পাবেন নোবেল পুরস্কার পেলে তার সব অর্থ আর তারপর আইনস্টাইনের কোন টাকা দেবার কড়ার নেই। মিলেভা তাঁর আইনস্টাইন পদবীটি বজায় রাখবেন। দুজনের ভুল বোঝাবুঝির কিছু অবসান হয়, দুটি সভ্য ভদ্র মন দুজনকে শ্রদ্ধা করে মেনে নিতে পারে। মিলেভা এলবার্টকে বলেন এলসাকে বিয়ে করতে। মিলেভা গণিতে দক্ষ, হয়তো অনেক বিষয়ে তাঁর অদক্ষতা। অন্যদিকে এলসা গণিত জানেন না, জানেন ঘর সংসার করতে, আপনভোলা জটিল লোকটিকে সামলে রাখতে। সুইজারল্যানড থেকে ফিরে ২রা জুলাই তারিখে এলসাকে তিনি বিয়ে করলেন। তারপর ছেলেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে বেসোর সঙ্গে কথা বলতে, বক্তৃতা ইত্যাদিতে কয়েকবার ঘনঘন সুইজারল্যানডে আসেন। এরপর আইনস্টাইন বার্লিনের বাসিন্দা, এলসার স্বামী—ভূতপূর্ব স্ত্রীর খবরাখবর বেসোর চিঠিতে জানেন। জীবনের একটি অধ্যায় শেষ করে দিলেন এলবার্ট আইনস্টাইন।

এই বছর এপ্রিল মাসে জার্মানির যুদ্ধকালীন অপরাধের বিচারের জন্য প্রতিষ্ঠিত একটি বেসরকারী কমিশনের তিনি সদস্য হলেন। অতি উৎসাহে লরেন্সকেও এই কমিশনের সভ্য হতে আমন্ত্রণ জানিয়ে চিঠি দিলেন। অভিজ্ঞ লরেন্স কমিশনকে পাশ কাটান আর আইনস্টাইনকে বলেন, এসব দিকে মাথা না ঘামাতে। এই সময়ে লেইডন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হয়ে যোগ দেবার আমন্ত্রণ আসে লরেন্সের কাছ থেকে—লেকচার দিতে হবে

না, নিজের কাজের নিরঙ্কুশ সুযোগ, মাইনে বার্ষিক ৭৫০০ গিল্ডার। আইনস্টাইন কিন্তু এ প্রস্তাবে অসম্মতি জানালেন। তাঁর মনে হয় বিধ্বস্ত জার্মানির গঠনের জন্য জার্মান রিপাবলিকের যে দাবি তাঁর উপরে আছে, তাকে নীতিগতভাবে তিনি এড়াতে পারেন না। জার্মানির অপরাধ আর নতুন জার্মানির চিন্তা এদুটিই ঘুণ পোকা হয়ে তাঁকে কুরে কুরে খায়। প্লাঙ্ক তাঁকে চিঠি লিখে বলেন, জার্মানি তাঁকে চায়। প্লাঙ্কের অনুরোধ তাঁর কাছে আদেশ। এলবার্ট আইনস্টাইন নতুন জার্মানির অভ্যুত্থানের জন্য শান্ত হয়ে অপেক্ষা করেন, যুদ্ধের অপরাধ ভুলে যেতে চান। লেইডনের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন ; আর তার এক পক্ষ কাল পরে ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯১৯ সালে লরেন্সের টেলিগ্রাম পান, "এডিংটন সূর্যের শিখার কাছে তারার গতিপথের পরিবর্তন দেখেছেন। প্রথম মাপের হিসেবে পরিবর্তন দেখা গেল $\frac{9}{10}$ সেকেনড ও তাঁর দুগুণ সংখ্যার মাঝে।"—সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বের প্রমাণের খবরের আওয়াজ শোনা গেল।

১৯০৫ সালে বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের প্রকাশ,—তত্ত্বটি থেকে যে ভবিষ্যদ্বুক্তি করা হয়েছে তার প্রমাণ ১৯১৯ সালে সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায়নি। নিউটনের গতিবিজ্ঞান আর ম্যাক্সওয়েলের ইলেকট্রা মেগনেটিক জগতের মেলবন্ধন ঘটালেন বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদে ; জানা গেল ভর পরিবর্তিত হবে শক্তিতে, $E=mc^2$; বিশেষ আপেক্ষিতাবাদ গতিবিজ্ঞানের গতিকে বোঝাবে, বোঝাবে না ত্বরণ বা একসিলারেশনকে। সেই ত্বরণের বিজ্ঞানের জন্য প্রয়োজন সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ। গতির পরিবর্তনের ফলাফল ত্বরণের তুলনা মহাকর্ষের আকর্ষণের সাদৃশ্যে পাওয়া গেল। সাদৃশ্য তত্ত্বে ত্বরণ আর মহাকর্ষের ফলাফল এক। এটিও তিনি আগে প্রকাশ করেছেন ; অন্যদিকে আলোকে কণারূপে প্রকাশ করেছেন—যে কণা নিউটনের কোর্পাসকুলার তত্ত্বের গঠনে গড়া হলেও ভিন্ন। আলোর কণার বিকিরণের ধারা অবিচ্ছিন্ন নয়। কোয়ানটাম গণিতের পরিমাপে আলোর কণার প্রবহমানতা। অন্যদিকে এই আলোক-কণার তরঙ্গ রূপ আছে ; বামারের উপপত্তি ও রুঁজের গণিতের উদ্ধৃতি দিয়ে আইনস্টাইন বললেন, আলোককণার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আর কম্পাঙ্ক বা স্পন্দন সংখ্যার গুনে পাওয়া যাবে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা—সেটি বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের গতিবিজ্ঞান ও ম্যাক্সওয়েলের জগতের সবচেয়ে দ্রুততম গতিটি, যেটি আলোর গতি, যার সাপেক্ষে অন্য গতি মাপা হবে। আলো যখন কণা, মহাকর্ষের আকর্ষণের টান তার উপরে পড়বে. সে পথ বিচ্যুত হবে। এই বিচ্যুতির ইঙ্গিত নিউটনের গণিতে আছে, বিজ্ঞানী সোল্ডনার সেই বাঁকের হিসেব করেছিলেন। এই বাঁকটি পরীক্ষায় পাওয়া গেলে, আলোর কণারূপ প্রতিষ্ঠিত।

দেশ-কালের নিরপেক্ষতা ত্যাগ করে আইনস্টাইন বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ গড়ে তুললেন —তাঁর নিবন্ধে তিনি যে বিভিন্ন গতিতে পরিভ্রমণকারী দর্শকদের কল্পনা করলেন, তাদের পরস্পরের আপেক্ষিক গতির হ্রাস-বৃদ্ধি আলোর গতির সাপেক্ষে হচ্ছে, এটি মেনে নিয়ে

তিনি আপেক্ষিকতাবাদের সূচনা করলেন। এই তত্ত্বের গঠনে মহাকর্ষ—মাধ্যাকর্ষণকে ধরা হলো না। অন্য দিকে নিউটনের কোর্পাসকুলার তত্ত্বে আলোর কণারূপ প্রতিষ্ঠিত হলেও আলোক-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মহাকর্ষের কোন ধারণা, কোন প্রস্তাব আবিষ্কৃত হয়নি। আইনস্টাইনের চোখে, বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের প্রয়োগের সীমাবদ্ধতা ধরা পড়ে। মহাকর্ষের প্রয়োগ ক্ষেত্রে আপেক্ষিকতাবাদকে যদি না বিস্তৃত করা যায় তবে সেই তত্ত্বের আপাতপঙ্গুতা বিশ্বলোকের নিয়ম বোঝাতে পারবে না। আপেক্ষিকতাবাদে মহাকর্ষকে গ্রহণ করতে হবে।

১৯০৮ সাল থেকে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে তিনি সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ সৃষ্টিতে ব্যস্ত। নকশা আঁকা হয়, পছন্দ হয় না; বাইরের লোকের মতামত বিশেষ কাজে লাগে না—নিজের গড়া নকশার ভুলত্রুটি নিজের চোখেই ধরা পড়ে; ভুল শোধরানো সেও নিজের হাতে। গণিতের কোন্ কাঠামোতে তত্ত্বটির রূপ বাঁধা পড়ে একমাত্র সেটি জানতে পারলে অন্য সব জানা-অজানা তথ্যগুলিকে একটি নিয়মে, একটি নকশায় বাঁধা যাবে। যে উপলব্ধি ও ইনটিউশন তাঁকে তত্ত্বটির গাঠনিক রূপ জানাচ্ছে—সেই উপলব্ধিকে ভাষার জগতে প্রকাশ করতে হবে—ভাষা এখানে অঙ্ক!

মহাকর্ষ কি—জানা নেই। আইনস্টাইন জানেন মহাকর্ষ আর ত্বরণের ফলাফল এক। অনন্ত দূরত্বে নিউটন মহাকর্ষের তাৎক্ষণিক প্রয়োগ খাটতে দেখেছিলেন। নিউটনের জগতে মহাকর্ষ একটি শক্তি। আইনস্টাইন দেখলেন, জড় পদার্থ বা মেটারের একটি বৃত্তি হলো মহাকর্ষ;—এই বৃত্তির প্রয়োগ দেশকালের জগতের সান্নিধ্যে ঘটে থাকে। যেখানে মেটার বা জড় আছে, সেখানেই আছে এই শক্তি। যে মেটারের ভর বেশি, তার শক্তিও বেশি; দেশকালের জগতে সেই শক্তির টান বেশি।

নিউটন জড় বস্তুর ত্বরণ বা গতি প্রভেদ বোঝাতে মহাকর্ষের ধারণা এনেছিলেন। দুটো বস্তুর মধ্যে যে ব্যবধানই থাক, আকর্ষণ শক্তি কাজ করবে—শক্তির প্রভাব শুধু দূরত্বের হ্রাস-বৃদ্ধির উপর বিপরীত বর্গ অনুপাতে বাড়ে কমে। এই টানের নির্দিষ্টতা আছে;—তরঙ্গের রূপে আকর্ষণের বৈচিত্র্য ফুটে ওঠে; এখানে তরঙ্গরূপ নেই, নেই জড়ক্ষেত্রের পরিকল্পনা,—যে ক্ষেত্রের কল্পনা থেকে ম্যাক্সওয়েল বিদ্যুৎতত্ত্ব আর চুম্বকতত্ত্বের সাযুজ্য গঠনে শেষ তুলির টান দিয়েছিলেন। সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, বিযুক্ত থেকেও জড় বস্তুরা দূর থেকে পরস্পর পরস্পরের উপর কিভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারে এই ধাঁধার সমাধান বিজ্ঞানীরা করতে পারেন নি। বিদ্যুৎ আর চুম্বকের আকর্ষণ-বিকর্ষণের ধারণা প্রথম যুগে বিজ্ঞানীরা নিউটনের গণিতের ভিত্তিতে গড়ে তুলতেন—এখানেও সেই বিচ্ছিন্ন বিযুক্ত চুম্বক বা বিদ্যুৎ কণা থেকে পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ-বিকর্ষণ করছে—আকর্ষণ-বিকর্ষণের শক্তি একইভাবে দূরত্বের বিপরীত বর্গের অনুপাতের সিদ্ধান্তে গড়ে তোলা। ফ্যারাডে আর ম্যাক্সওয়েল বিদ্যুৎ আর চুম্বকবাহী জড়কণার শক্তি বুঝতে গিয়ে ক্ষেত্রের কথা ভাবলেন—আর ভাবলেন ক্ষেত্রের

প্রভাব বিস্তারিত হবে বক্ররেখার ইঙ্গিতে, ভঙ্গীতে, এক কণা থেকে আরেক কণায় ; অর্থাৎ একটি জড় কণার চারদিকে এই আকর্ষণ-বিকর্ষণ শক্তি রবারের ইলাস্টিক ব্যানডের মতো টেনে নিতে হাজির। কাছে থাকলে এই শক্তির প্রাবল্য বেশি, দূরে গেলে শক্তির ঘাটতি। মহাকর্ষের তত্ত্বে নিউটন এই ক্ষেত্রের বোধ ঘোষণা করেননি। তা সত্ত্বেও নিউটনের মহাকর্ষের গণিতে গ্রহ-উপগ্রহের কক্ষরেখার বৈশিষ্ট্য, তাদের গতিপথের বৈচিত্র্য ইত্যাদি নির্দেশিত হয়েছে। নিউটনের এই গণিত দেশ ও কালের নিরপেক্ষতাবোধের উপর গড়া। আইনস্টাইন নিরপেক্ষ দেশ-কালের অবিসংবাদী রাজত্ব বিশেষ আপেক্ষিকতা-বাদে ধ্বংস করেছেন,—সেটি গতির জগৎ। গতির বৈচিত্র্যের জগতে একই নিয়ম খাটবে,—এখানেও থাকবে দেশ ও কালের আপেক্ষিকতা, আলোর গতির অনতিক্রমতার ধারণা। অথচ এই নতুন জগতে পুরনো তথ্যরা ঠাঁই পাবে ; পরীক্ষায় পাওয়া তথ্য যা নিউটনের গণিতে প্রতিষ্ঠিত, প্রমাণিত, নতুন তত্ত্বে তারা স্বমহিমায় হাজির থাকবে।

আকর্ষণের ব্যাপ্তি জানায় মহাকর্ষেরও ক্ষেত্র আছে—তবে সেই শক্তির ব্যাপ্তি ইলাস্টিক ব্যানডের মতো বর্তুলাকারে ছড়িয়ে আছে কিনা জানা যায় না। যুক্তি দিয়ে বিচার করলে বলা যাবে জড়পদার্থের ক্ষেত্র থেকে মহাকর্ষ শক্তির উৎপত্তি—আর এইটুকু মেনে নিলে, নিউটনের বক্তব্যের অসঙ্গতিটুকু থাকে না। যেটুকু প্রমাণ করা দরকার তা হলো ক্ষেত্র থেকে উৎপন্ন শক্তির টানের হেরফেরের ধারণা।

গ্রোসমানের সঙ্গে কাজের সময় উচ্চ গণিতের যে শাখা তাঁরা ব্যবহার করেছিলেন, সেটি মহাকর্ষের ক্ষেত্রতত্ত্বের প্রয়োগকে সম্পূর্ণ বোঝাতে পারে নি। গণিতের কাঠামোয় দুটো দিক ভেবে দেখতে হবে :—মহাকর্ষের প্রভাবযুক্ত বস্তুর ভর আর সেই বস্তুটির নিজস্ব মহাকর্ষ ক্ষেত্রের শক্তির ধর্মের স্বাজাত্য এবং দ্বিতীয়টি হলো মহাকর্ষ ক্ষেত্রের প্রভাবে, গতি-বৈচিত্র্যের ফলে গতিপথের ব্যাখ্যা। এই দুটির সমাধানে আইনস্টাইন এইবারে একটি নতুন গণিতের শাখার সাহায্য নিলেন—রীমানের জ্যামিতি।

ইউক্লিডের জ্যামিতি সমতল পৃষ্ঠের উপর গড়ে উঠেছে। রীমান ইউক্লিডের জ্যামিতিকে বিসর্জন দিয়ে এক নতুন বক্র পৃষ্ঠের উপর গড়া জ্যামিতি সৃষ্টি করলেন। আইনস্টাইন সেই রীমানের জ্যামিতি মহাকর্ষের নতুন গতিতে প্রয়োগ করলেন, কারণ তার মহাবিশ্ব সমতল নয় ; 'জড়ের গতিবৈচিত্র্যের কারণ দ্রষ্টার দেশকাল রূপ প্রক্ষেপ ভূমির অসমতা ও বর্তুলতা।' ইউক্লিডের জ্যামিতিতে গড়া পুরনো বিশ্বের প্রসার ছিল অসীম, বাধাহীন ও অপরিমেয়। আপেক্ষিকতাবাদে মহাবিশ্ব অবাধ, বাধাহীন, অথচ এটি অসীম নয়, অপরিমেয় নয়। দেশ-কালে গড়া এই বিশ্বলোক বর্তুল—বর্তুল বলেই এটি অবাধ, গতিতে বাধা নেই। আর এই বিশ্বলোকের প্রসারের পরিমাণ মাপা অসম্ভব নয়। বিশ্বলোক অসীম।

আইনস্টাইনের বিশ্বলোকের বর্ণনায় একটি শব্দ ব্যবহার করা হলো Space curvature

অর্থাৎ দেশের বর্তুলতা। গাণিতিক পরিভাষায় এই শব্দটির অর্থ হলো যে স্পেস বা দেশে ইউক্লিডীয় জ্যামিতির দুটি বিন্দুর দূরত্বের মাপ ভিন্ন। এই বর্তুলতা দেশের আকৃতির উপর নির্ভর করছে না—নির্ভর করছে দূরত্বের ব্যাখ্যার উপর। স্পেস বা দেশ বর্তুল নয়, বর্তুলতা প্রকাশ পাচ্ছে সেই স্পেস বা দেশে গড়া জ্যামিতির নন-ইউক্লিডীয় ব্যবহারে। গাণিতিক পারিভাষিক সংজ্ঞায় আইনস্টাইনের জগৎ চতুর্মাত্রিক এবং এই জগতে আছে দেশকালের বর্তুলতা—বিজ্ঞানের ব্যাখ্যায় আইনস্টাইনের জগতে চারটি পরিবর্তনীয় বিষম রাশি বা ভেরিএবল আছে—দেশের জন্য আছে দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-বেধ এই তিনটি উপস্থিতির জন্য তিন এবং আছে কালের জন্য একটি। চারটিই স্বতঃপ্রতিষ্ঠ, অথচ দর্শকের চোখে এদের চরিত্রে থাকে আপেক্ষিক রূপ। অন্যদিকে এই দেশকালের জগতের অসমতার জন্য জড়ের গতির বৈচিত্র্য ফুটে ওঠে।

সমারফেল্ডকে লেখা ১৯১৫ সালের একটি চিঠিতে আইনস্টাইন জানালেন, জীবনের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর এবং সৃষ্টিকালের মধ্য দিয়ে তিনি যাচ্ছেন। মহাকর্ষের ক্ষেত্রের গণিতের ত্রুটি তার চোখে ধরা পড়েছে—নতুনভাবে সবকিছু তিনি ভাবছেন; হয়তো বা তিনি সফল। ১৯১৬ সালে Annalen der Physik পত্রিকায় ৪৯ নম্বর ভলুমের ৭৬৯-৮২২ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হলো সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের মূল ধারণা। একটি লোকের একক প্রচেষ্টায় বিশ্বের রহস্য উদ্ঘাটনের অসম্ভব প্রয়াস। বার্লিনে কাইজার ভিল্‌হেলম ইনস্টিট্যুটে মাক্স প্লাঙ্ক-নার্নস্টের আইনস্টাইনের উপর বাজি ধরা সার্থক হলো, নতুন তত্ত্ব মহাযুদ্ধের মাঝখানে পাওয়া গেল।

নতুন তত্ত্বে জড়ের গতির মতো আলোর গতির উপর দেশকালের অসমতা আর বর্তুলতার প্রভাব থাকে ; আলোর গতি বাঁকে। বিভিন্ন বস্তুর উপর মহাকর্ষের আকর্ষণের বিভিন্নতার জন্য আলোর গতির উপর তার প্রভাব পড়ে। আপেক্ষিক জগতে আলোর গতির পরিবর্তন দর্শকের চোখে ধরা পড়ে না—যা জানা যায় তা তরঙ্গদৈর্ঘ্য আর কম্পাঙ্কের প্রভেদ। মহাবিশ্বে সময় বা কাল আলোর এই তরঙ্গদৈর্ঘ্য আর তার কম্পাঙ্কের নির্ভরতা নিয়ে থাকবে—একটি সেকেনডের হিসেব জানা যাবে একটি নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের কম্পাঙ্কের হার,—কারণ তরঙ্গদৈর্ঘ্য আর কম্পাঙ্কের গুণফলে পাওয়া যাবে আলোর গতি যা অনতিক্রম্য অপরিবর্তনীয়। কম্পাঙ্কের হার কমা মানে যেন আলোর গতিসময় কমা, আলোর আস্তে চলা। অন্যদিকে কম্পাঙ্ক বাড়া মানে যেন সময়ের জোরে ছোটা। কম্পাঙ্কের হ্রাস-বৃদ্ধি জানাবে সময়ের পরিবর্তন, সময় দ্রুত যাবে অথবা যাবে ধীরে।

আরো জানা গেল মার্কারি গ্রহের অনুসূর গতির অসঙ্গতির ব্যাখ্যা। রীমানের জ্যামিতির প্রয়োগে জানা যায়, একটি শক্তিশালী মহাকর্ষ শক্তি সৃষ্টিকারী কেন্দ্রের চারদিকে যখন একটি গ্রহ ঘোরে, তখন তার উপবৃত্তাকার পথের দিক পরিবর্তন হয়—এই পরিবর্তন সাধারণত খুবই সামান্য, তবে মার্কারি বা বুধ গ্রহটি সূর্যের সান্নিধ্যে দ্রুতবেগে ঘোরে বলে

এই মাপটিকে ধরা-বোঝা যাবে। আইনস্টাইন তার নতুন মহাকর্ষ ক্ষেত্রগণিত প্রয়োগ করে পেলেন পরিবর্তন ঘটে প্রতি বছরে ০·১ সেকেনড ডিগ্রির মাপে। গ্রহটি ১০০ বছরে ৪২০ বার ঘোরে, অতএব এক শতাব্দীতে পথের দিক পরিবর্তন হবে ৪২ সেকেনড। জ্যোতির্বিদ লেভেরার হিসেব করে জানিয়েছিলেন, মার্কারির অনুসূর গতির অসঙ্গতি একশ বছরে ৪৩ সেকেনড।

জ্যোতির্বিদ স্বওয়ারৎসচিল্ড আইনস্টাইনের ঘোষণার পর এই অনুসূর গতির মাপ রীমানিয়ান জ্যামিতির প্রয়োগে আরো সহজে করলেন—আইনস্টাইনের হিসেব আর লেভেরার মাপের সুসঙ্গতি প্রকাশ হলো। স্বওয়ারৎসচিল্ড এই নতুন তত্ত্বের গাণিতিক কাঠামোটি আরো সহজ, শুদ্ধ ও বিস্তৃত করলেন—রীমানের জ্যামিতি নবগণিতের প্রয়োগে আরো সুষমামণ্ডিত হয়ে ওঠে।

মহাকর্ষের ফলে আলোর গতিপথের যে বিচ্যুতি ঘটতে পারে, তার পরিমাপের গণিত এইবারে আইনস্টাইন জানালেন—এই মাপ নিউটনের গণিতে পাওয়া ফলের দ্বিগুণ।

মঙ্গলগ্রহের যিনি উপগ্রহ আবিষ্কার করেছিলেন, সেই জ্যোতির্বিদ আসাফ হল নিউটন গতি শাস্ত্রের অসঙ্গতির পরিবর্তন চেয়েছিলেন। নিউটনের গণিতে m_1 ও m_2 ভর দুটির মধ্যে যদি দূরত্ব থাকে d, তবে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির অনুপাত হবে $\frac{m_1 m}{d_2}$ এই d^2 টির প্রয়োগে জ্যোতির্বিজ্ঞানে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় পাওয়া তথ্যদের গাণিতিক ব্যাখ্যায় গোলমাল থাকে; হল বললেন d^2-এর বদলে $d^{2.0000001612}$ লেখা হলে, কোন গোলমাল থাকে না। কেন যে এরকম লেখা হবে সেটি অবশ্য হল জানালেন না। আইনস্টাইনের ক্ষেত্রতত্ত্বে জানা গেল d^2 টি হবে $d^{2.00000016}$। উল্টোদিক থেকে কষা অঙ্কের উত্তরের সঙ্গে আইনস্টাইনের নিয়মে পাওয়া উত্তরের মিল পাওয়া গেল।

মৌল পদার্থের পর্যায় সারণী গঠন করার পর মেনডালিভ ভবিষ্যৎ মৌলের উপস্থিতি ঘোষণা করেছিলেন, এই সব মৌলদের পরে আবিষ্কার করা হয়। আইনস্টাইনের তত্ত্বেও সেই ভবিষ্যৎ ঘটনার ঘোষণা। যুদ্ধের ডামাডোলের মধ্যেও এই তত্ত্বের সৌন্দর্য বিজ্ঞানীদের চোখে ধরা পড়ে। Annalen der Physik-এ তাঁর নিবন্ধটি প্রকাশ হবার পর, একটি কপি তিনি স্বয়ং হল্যানডের লেইডন বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিদ্যার অধ্যাপক উইলিয়াম ডিসিটারের কাছে পাঠালেন। ডিসিটার লনডনের রয়েল সোসাইটি অফ এস্ট্রোনমির বিদেশী সংবাদদাতা—তিনি তাঁর কপিটি লনডনের সোসাইটির সেক্রেটারি ৩৪ বছর বয়স্ক কেম্ব্রিজের জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্লুমিয়ান অধ্যাপক আর্থার এডিংটনের কাছে পাঠান। এডিংটন এবং ডিসিটার অজার্মানভাষীদের কাছে এই তত্ত্বের মনোহরত্ব প্রায় তৎক্ষণাৎ প্রকাশ করলেন। ডিসিটার রয়েল সোসাইটির মুখপত্রে তিনটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। যুদ্ধের অন্ধকার দিনগুলিতে বিজ্ঞানীরা আইনস্টাইনের তত্ত্বের সারল্যে, বিষয়-উত্থাপনের সৌন্দর্যে বিস্মিত হন; আর এডিংটন ঠিক করে ফেলেন, ১৯১৯ সালের পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণকালে তারাদের

অবস্থানের পরিবর্তন মেপে আলোর বাঁকের হিসেব কষবেন ; ১৯১৪ সালের ক্রয়েনড্-লিশের অভিযানের মত ১৯১৯ সাল বিফলে যাবে না। রিলেটিভিটি তত্ত্ব প্রমাণ এখন এডিংটনের একমাত্র কর্তব্য। তত্ত্বের সত্যতার তাঁর সন্দেহ নেই, শুধু প্রমাণের ওয়াস্তা। ব্রিটেনের এস্ট্রোনমার রয়েল বিখ্যাত অভিযাত্রী সার ফ্রাঙ্ক ডাইসনকে এই অভিযানের জন্য এডিংটন উত্তেজিত করে চলেন। এই সময়ে এডিংটন রিলেটিভিটির তাত্ত্বিক গঠনের বিশেষত্ব দুটি প্রবন্ধে প্রকাশ করেন—একটি প্রবন্ধ 'The mathematical theory of Relativity' এখানে তিনি রিকি-লেভিসিভিটা দুজনের বিমূর্ত বা এবসল্যুট ডিফারেনশ্যল কেলকুলাস, টেনসরস্ ও রীমানের জ্যামিতির প্রয়োগে কিভাবে আপেক্ষিকতাবাদ সৃষ্টি হলো তার বিশদ আলোচনা করলেন। শোনা যায়, এডিংটন রিলেভিটিতত্ত্ব হাতে পেয়ে উচ্চ গণিতের বিভিন্ন শাখায় দক্ষতা পেতে পড়াশোনা করেন এবং কয়েকমাসের মধ্যে এই সব শাখায় সহজে নিপুণ কুশলতায় বিচরণ করতে সক্ষম হন। গণিতের এই সহজাত দক্ষতার জন্য এডিংটন আপেক্ষিক-তত্ত্বের নতুনত্ব ও বিশেষত্ব সহজেই স্বীকার করে নিতে পারলেন। এই তত্ত্বের প্রমাণে এডিংটন তাঁর মনপ্রাণ দিয়ে বসলেন ; পূর্ণগ্রাস সূর্য গ্রহণের অভিযানটির বন্দোবস্ত করেন আর দিবস রজনী সেই দিনটির আসার আশায় থাকেন। সার ডাইসন এডিংটনের এই বিহ্বল ভাব দেখে পরিহাস-ঠাট্টা করেন। এডিংটন উদাসীন নির্বিকার, আলোর বাঁকের প্রমাণ তাঁর ধ্যান, তাঁর একমাত্র চিন্তা!

ইতিমধ্যে ১৯১৭ সালে আইনস্টাইন আরো দুটি পেপার প্রকাশ করলেন—একটি ১৯০৫ সালে প্রকাশিত আলোর তত্ত্বের অনুসন্ধানমূলক দৃষ্টিভঙ্গির বিস্তৃতি আর দ্বিতীয়টি সদ্য প্রকাশিত আপেক্ষিকতত্ত্বের আলোকে তাঁর মহাকাশতত্ত্ব গড়ে তোলা।

১৯১৭ সালের আগে বিজ্ঞানজগতে রাদারফোর্ড আর কুরীদের কাজের ফলে তেজস্ক্রিয় পদার্থের উপস্থিতি জানা গেছে। এই তেজস্ক্রিয় পদার্থ যে আলফা আর বিটা কণা ত্যাগ করে ভেঙ্গে যায়, ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হয়ে সীসায় স্থির হয়, সে তথ্যও তখন প্রতিষ্ঠিত। সোভি-ফাজানসের ইলেকট্রনের কাঠামোয় গড়া নতুন পর্যায় সারণীর খবরও জানা ; আর জানা নীয়েল বোরের এটম গঠনের কোয়ানটাম তত্ত্ব—এক স্থির কক্ষ থেকে আরেক কক্ষে ঝাঁপ দেবার সময় এনার্জি বা শক্তির যে প্রভেদটুকু পাওয়া যায়, সেটুকু বিদ্যুৎ-চুম্বক তরঙ্গাকারে বেড়িয়ে আসবে, পাওয়া যাবে দৃশ্য আলোর বর্ণালি বা অন্য কিছু।

আলোক-তড়িৎফল বোঝাতে আইনস্টাইন আলোকে কণা ভেবেছিলেন—যে কণা প্লাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত বিকিরণের নিয়ম মেনে চলে, যেখানে বিকিরণের ধারা নিরবিচ্ছন্ন নয়। এই কণার শক্তির ধাক্কায় ধাতু বা পদার্থ থেকে ইলেকট্রন বেরিয়ে আসে, পাওয়া যায় আলো থেকে তড়িৎ। এই ইলেকট্রন পর্যায় সারণীর প্রথম শ্রেণীর ক্ষার-ধাতু থেকে সহজে বেরিয়ে আসে এবং আসে দ্বিতীয় শ্রেণীর গা-থেকেও। এখানে নীয়েল বোরের

নিয়মে সুবদ্ধ শক্তি কম, আলোর কণার ধাক্কা এদের কক্ষচ্যুত করতে পারবে। আলোক-তড়িৎফল তখন সহজবোধ্য ; তবে তেজস্ক্রিয় পদার্থের ক্ষয় কেন যে হয়, জানা যায় না। ক্ষয় হয়, ক্ষয়ের হার জানা, এবং জানা ক্ষয়ের কালে আলফা-বিটাকণাদের উপস্থিতি। বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের প্রয়োগে বিটাকণাদের ইলেকট্রন বলে জানা গেছে আর আলফা কণা হলো নেগেটিভ চার্জ হারানো হিলিয়ামের এটম। এ সবই প্রতিষ্ঠিত হলো ১৯০৯ সালের মধ্যে।

তাপের বিশ্লেষণের কিরশোফীয় পদ্ধতির বিস্তৃতি ঘটিয়ে প্লাঙ্ক বিকিরণের কোয়ানটাম তত্ত্ব গঠন করেছিলেন। আইনস্টাইন সেই কোয়ানটাম তত্ত্বের ছক অন্যত্রও প্রতিষ্ঠা করলেন। আইনস্টাইন বললেন, বিকিরণের গ্রহণ-বর্জন রীতি যেমন স্বতস্ফূর্তভাবে ঘটে থাকে, তেমনি একই গ্রহণ-বর্জন রীতি উদ্দীপিত (stimulated) নির্গলণ পদ্ধতিতেও ঘটবে। সুতরাং উত্তেজিত বস্তু থেকে পাওয়া বিকিরণের ধারাতে একই গ্রহণ-বর্জন রীতি থাকবে। এই উত্তেজনা বিকিরণের মূল ধারা গ্রহণে হতে পারে, আবার বর্জনেও পারে ; ১৯১৭ সালের প্রকাশিত এই উপপত্তির ভিতের উপর পরবর্তীকালে লেসার ও মেসার রশ্মির টেকনোলজি গড়ে ওঠে। এই একই উপপত্তিতে আইনস্টাইন বললেন, বিকিরণের ফলে যে ভরবেগ বা মোমেনটামের স্থানান্তর ঘটে, সেটি নির্দিষ্ট দিকেই ঘটবে। তিনি বললেন, "বর্তমান উপপত্তির উপস্থাপনায় এই দিকের নির্দেশনা একমাত্র 'chance' বা সম্ভাব্য সুযোগের উপর নির্ভর করবে।" আইনস্টাইন চান্স শব্দটিকে ইনভার্টেড কমার মধ্যে রাখলেন। তার ধারণা আজকে যাকে ধরা হচ্ছে চান্স বা সম্ভাব্য পরিস্থিতি, জ্ঞানের বিস্তৃত পটভূমিতে, তথ্যের সংযোজনে সেটিকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রপঞ্চের জগতে নির্দিষ্ট করা যাবে। ভরবেগের অনির্দিষ্ট কারণে কোন কণাটি তেজস্ক্রিয় পদার্থে ভেঙে যাবে সেটি বিশেষ করে বলা যাবে না। তবু ভাঙনের রীতিনীতি সাংখ্যায়নিক গণিতের ছকে ধরা যায়, বিকিরণের কোয়ানটাম তত্ত্বে জানা যায় ; শুধু জানা যায় না, কখন কোন্ কণাটি ভাঙছে। ১৯১৭ সালের তত্ত্বে বিকিরণের ফলে একটি ইলেকট্রনের উত্তেজনার কথা জানা গেল ; জানা গেল, উত্তেজনার ইলেকট্রনটি কতটা লাফাবে ; জানা গেল না, কোন্ কণাটি লাফাবে এবং এই লাফের কোন্ দিকটি কণা বেছে নেবে ! কণার বেছে নেবার স্বাধীনতার কথা ১৯১৭ সালে তিনি জানালেন।

দ্বিতীয় পেপারটিতে আইনস্টাইন "সাধারণ আপেক্ষিকতার ভিত্তিতে মহাকাশ সম্বন্ধীয় চিন্তা' প্রকাশ করলেন। মহাকাশের বিধৃতির পরিমাপে তিনি আপেক্ষিকতার গণিতের প্রয়োগ করলেন। প্রতিটি স্থির ও নির্দিষ্ট তারার চারদিকে আছে কেন্দ্রাতিগশক্তি বা সেনট্রিফিউগল ফোর্স। কেন্দ্র থেকে গতির ফলে বস্তু সরে যেতে চায়, মহাকর্ষের বন্ধন এই কেন্দ্রাতিগশক্তির পরিপন্থী, তবু মহাকর্ষের আকর্ষণেও গ্রহ-উপগ্রহ কেন্দ্রে পড়ে না, বাঁধা পথে ঘোরে। আইনস্টাইন এই শক্তির পরিমাপের একটি সংজ্ঞা দিলেন। দূরের

তারার ঝিকিমিক আর চেনাজানা সূর্য-চাঁদের মহাকর্ষের টান আপেক্ষিকতাবাদে একটি মালার সূত্রে গাঁথা হয় ; তারপর প্রশ্ন জাগে, মহাকর্ষের আকর্ষণ জানা-বোঝা যায়, কেন্দ্রাতিগশক্তির পরিমাপ কি করা যাবে ? সব তারার কেন্দ্রাতিগশক্তির সমষ্টি কি জানা যাবে ? এই কেন্দ্রাতিগশক্তির পরিমাপ করতে পারলে মহাকর্ষের শক্তি আরো স্পষ্ট এবং বোধ্য হবে—এই উত্তর সারাজীবন আইনস্টাইন খুঁজে এলেন। গড বা ঈশ্বর কিভাবে বিশ্ব সৃষ্টি করলেন, শুধু এটি জানা নয়, জানতে হবে এই বিশ্বের সীমা। সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন ও তার উত্তর খোঁজা তাঁর বিজ্ঞানের কাছে স্বাভাবিক। মহাবিশ্বের আকার নিয়ে আদ্যিকাল থেকে ভাবনাচিন্তা হয়েছে। পৃথিবীকেন্দ্রী সসীম বিশ্বের ধারণা, যা আদি সভ্যতার যুগে গ্রিকদের হাতে গড়ে উঠেছিল, রেনাসাঁসের যুগে সেই ধারণা ভেঙে যায়। কোপার্নিকাস সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর ঘোরার তথ্য জানান। নিউটনের গণিতে সসীম বিশ্বের ধারণা টেঁকে না। এখানে গতির পথ সরলরৈখিক, যে সরল রেখার আকৃতি ইউক্লিডের জ্যামিতি নির্ভর করে গড়ে উঠেছে। সেই পথে, সরলরেখায়, যে কোন দিকে চললে কেন বাধা পাওয়া যাবে ? সেই বাধা কি ? বাধা কি দেয়াল ? যদি দেয়াল বা কোন বাধা থাকে, তার ওপারেও থাকবে দেশ বা স্পেস ; তা না হলে অবারিত পথকে বেঁধে রাখার মত বাধা কি করে গড়ে উঠবে ? সেই নতুন স্পেসের শেষ কোথায় ? সেখানেও কি আছে বাধা, নতুনতর স্পেস ? অথবা চেনাজানা বিশ্বলোক বাধাহীন ও অনন্ত ?

নিউটনের বিশ্বলোক অবাধ ও অপরিমেয়, অখণ্ড ও অসীম। এই নৈর্ব্যক্তিক মহাবিশ্বে তারাপুঞ্জ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে—আছে এই ইউক্লিডের সমতলিক জ্যামিতির স্পেসে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই অসীম বিশ্বলোকের উপস্থিতি নিয়ে সন্দেহ দেখা দেয়। ইতিমধ্যে নন-ইউক্লিডীয় জ্যামিতির সৃষ্টি হয়েছে। ১৮৩০ সালে রাশিয়ার লোবেচিওস্কি ও হাঙ্গেরির বোলাই—এই দুই গণিতবিদ প্রথম নন-ইউক্লিডীয় জ্যামিতির সূচনা করেন—যেখানে একটি বিন্দু থেকে একটি সরল রেখার সাপেক্ষে একাধিক সমান্তর রেখা টানা সম্ভব। ১৮৫৪ সালে রীমান তাঁর নতুন জ্যামিতি প্রকাশ করলেন—যেখানে সরলরেখা মানে বক্ররেখা আর সমান্তররেখা বলে কিছু নেই, আছে সমান্তর বৃত্তরেখা।

নন-ইউক্লিডীয় জ্যামিতি অসমতলের উপর গড়ে উঠল। বর্তুলাকৃতি গঠনের উপর গড়া জ্যামিতি সমতল পৃষ্ঠ বা কাগজের উপর আঁকা জ্যামিতি থেকে ভিন্ন। একটি গ্লোবের উপর টানা সরলরেখা সম্পূর্ণ গ্লোবটিকে ঘুরে এসে সেই একই যাত্রাবিন্দুতে মিলবে—রেখা টানতে বাধা নেই, অথচ গ্লোবের আকারের জন্য এই রেখা অনবরত টানা গেলেও এরা নির্দিষ্ট দূরত্বের পর একই যাত্রা বিন্দুতে মিলবে। গ্লোবের উপর আঁকা সরলরেখা অসমতলিক পৃষ্ঠের জন্য বাঁকা, সম্পূর্ণ একটি বৃত্ত, যার যে কোন অংশে আছে বৃত্তাভাস। এই রেখা অবাধে টানা যাবে অথচ এটি অপরিমেয় নয়, নির্দিষ্ট মাপের। গ্লোবের পৃষ্ঠ অবাধ এবং পরিমেয়।

পরিমেয় এবং অবাধ বিশ্বের ধারণা প্রকাশ করেন গণিতবিদ পোঁয়াকার, যিনি আলোর অনতিক্রম্য গতির কথা বলেছিলেন। তাঁর বিশ্বজগতে সীমার কাছে কোন বস্তুর আকার নেই ; কেন্দ্র থেকে যত দূরে যাওয়া যাবে, কোন দর্শকের কাছে মনে হবে সেই দূরগামী বস্তুটি আকার হারাচ্ছে, গতি ধীর হচ্ছে। দূরের জগতে অসমতল বর্তুলাকৃতির বোধ কমে আসে, সেখানে সমতলিক ইউক্লিডের জ্যামিতি খাটে। লোবেচিওস্কি-বোলাঈ এর গণিতে গড়া পোঁয়াকারের বিশ্বজগৎ—যে জগতে ত্রিভুজের তিনটি কোণের যোগফলের সমষ্টি ১৮০° নয়, তার চেয়ে কম। আবার অতিক্ষুদ্র অংশ আঁকা অতিক্ষুদ্র ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি এই জগতেও ১৮০° হবে, কারণ অতি ক্ষুদ্র জাগতিক অংশে ইউক্লিডের জ্যামিতিকে পাওয়া যাবে ; বর্তুল পৃষ্ঠের অতি সামান্য অংশ যেন সমতল।

আইনস্টাইন পোঁয়াকারের জগৎকে গ্রহণ করতে পারলেন না—এখানে মহাকর্ষেয় টানের ধারণা নেই, নেই ত্বরণের ব্যাখ্যা।

আইনস্টাইন মনে করেন মহাকর্ষের টানের ফলে মহাবিশ্বে সর্বত্র এবড়ো খেবড়ো চষা-জমির মত অবস্থা, তার পৃষ্ঠদেশ নিটোল সমতল নয়, অসমতল। এই অসমতলের আকার অনেকটা বর্তুলাকৃতি স্ফিয়ারের মতো যেখানে রীমানের জ্যামিতি খাটে, যে জ্যামিতিতে জানা যায় এখানে গড়ে ওঠা ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি ১৮০° চেয়ে বেশী। নিউটনের জগতের তারকাপুঞ্জের অনন্ত অবস্থানিক সম্ভাবনা এবং অসীম স্পেসে অনন্ত সংখ্যক তারকার বোধের অসঙ্গতি গণিতের রীতিতে ধরা পড়ে। অনন্ত তারকা বা বস্তুর আকর্ষণের ফলে গতিবৈচিত্র্য বা ত্বরণের ফলাফলে বস্তুর গতিবেগ আলোর গতির তুলনায় যথেষ্ট হবে। অন্যদিকে জ্যোতির্বিদদের সেকালীন পাওয়া তথ্যে জানা যায় তারকাদের গতি, আলোর গতির তুলনায় যথেষ্ট ধীর। তথ্যের ভিত্তিতে অনন্ত তারকার সম্ভাবনা নাকচ করা যাবে। অন্যদিকে অনন্ত স্পেসে তারকাপুঞ্জের অবস্থানিক সম্ভাবনার ধারণাতেও সংশয় থাকে। যে কোন বস্তু বা তারকার আকর্ষণের ফলে যে বর্তুলাকৃতি গড়ে ওঠে সেই আকার প্রকাশ পাবে তারকার বিশ্বদ্বীপে (Island Universe)। বিশ্বদ্বীপের বাইরে তারকা নেই, আছে সমতলিক সম্ভাবনা। গতিতে যে বাধা সৃষ্টি করে সেই জাড্য বা inertia মহাকর্ষের স্বজাতি ;—মহাবিশ্বের দূরান্তে সমতলিক ইউক্লিডের জগতে বাধা নেই, জাড্য নেই। সেখানে বস্তুর গতি সরলরৈখিক ও অতিদ্রুত। পোঁয়াকারের ধারণার জগতে দূরের বিশ্বের বর্তুলাকৃতির বোধ দর্শকের কাছে থাকে না এবং সেখানে বস্তুর গতি অতি ধীর। অন্যদিকে অনন্ত বিশ্বদ্বীপের সম্ভাবনার জগতে বর্তুলাকৃতি থাকে না, সেখানে গতি দ্রুত। বিশ্বদ্বীপের থেকে দূরে যে বস্তু থাকে সেখানে মহাকর্ষ নেই, অতএব জাড্য নেই। মোটর বা বস্তুর বণ্টনের উপর স্পেসের বর্তুলতা নির্ভর করবে ; স্পেস বিশ্বদ্বীপের কাছে বর্তুল, অথচ বিভিন্ন বিশ্বদ্বীপের মাঝে যে দূরত্ব, যা প্রায় সীমাহীন, সেখানে সমতলিক। এই অদ্ভুত আকৃতির অসঙ্গতি দূর করা যায় একটি সম্ভাবনায়—

মহাবিশ্বে নির্দিষ্ট সংখ্যক তারকারা নির্দিষ্ট ভাবে, সমানভাবে একটি অবাধ বিশ্বলোকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এই বিশ্বলোকের আকৃতি বর্তুল; যেখানে আলো একদিক থেকে বেরিয়ে বিশ্ব পরিভ্রমণ করে আবার সেই যাত্রাবিন্দু বা স্টার্টিং পয়েনটে ফিরে আসবে। আইনস্টাইনের বিশ্বলোক অবাধ, বর্তুল, সেখানে সব মহাজাগতিক বস্তুরা সমভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত হয়ে। মহাবিশ্বে অবস্থানের কোন আনুকূল্য নেই, প্রশ্রয় নেই—মহাবিশ্ব সর্বত্র সবদিকে সমান। এই বিশ্বে স্থানীয় অসমতলতা থাকবে, যেমন আছে পৃথিবীর বুকে, পাহাড় পর্বত নদীনালার এবড়ো খেবড়ো ভাব। তবু সব মিলিয়ে বিশ্বলোক পৃথিবীর মত বর্তুল, তার একটা নির্দিষ্ট মান আছে—যাকে বলা যেতে পারে ব্যাসার্ধ।

সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্বের সাহায্যে দুটো সমীকরণ পাওয়া যায়, যেখানে দুটি অজানারাশি আছে—একটি মহাবিশ্বের বর্তুলতার মাপ আর দ্বিতীয়টি বিশ্বলোকের সব বস্তুর সামগ্রিক ভরের ধারণা, তার ঘনত্ব বা Density; মহাকর্ষের রীতিতে গড়া অবাধ পরিমেয় আইনস্টাইনের বিশ্বজগতের একটি নির্দিষ্ট আকার থাকবে।

তাঁর চিন্তার ক্রমানুসারের ব্যাখ্যা অনেক পরে তিনি রাশিয়ান বিজ্ঞানী মস্কোওস্কিকে বললেন; বিশ্বলোকের একটা ব্যাসার্ধ ধরে নেওয়া যায়—সঠিক সংখ্যার বোধটা এখানে তুচ্ছ। দুরত্বের পরিমাপে এই মহাবিশ্ব যে একটি আবদ্ধ অথচ অনবচ্ছেদ ব্যাপার (closed continuum), এই ধারণাটাই প্রয়োজনের।

মহাবিশ্বের সাম্যের ধারণা বোঝাতে আইনস্টাইন আপেক্ষিকতত্ত্বের ক্ষেত্রগণিতের কাঠামোয় আরো একটি সংজ্ঞার প্রয়োগ করলেন—মহাজাগতিক ধ্রুবক (Cosmological constant)। মহাকর্ষের বিপরীত একটি শক্তির ধারণা করলেন, যেটি বিকর্ষণ জানাবে। এই বিকর্ষণের পরিমাণ বস্তুদের দূরত্বের সঙ্গে বেড়ে যাবে—যেখানে আকর্ষণ কমে যায়। এই ধ্রুবকটির যে সংখ্যা আইনস্টাইন জানালেন, তার উপর এই বিশ্বলোকের আকৃতি নির্ভর করছে।

আইনস্টাইন একটি ধ্রুবক জানালেন, অর্থচ এই ধ্রুবকটির সংজ্ঞা বা মান কোনো তথ্য জানাচ্ছে না। তাঁর জগতের আপাতস্থির মেটার বা বস্তুর বণ্টন-ব্যবস্থা (quasistatic distribution of matter) বিজ্ঞানী ডিসিটার মানতে পারলেন না। আইনস্টাইনের বিশ্বাস এ জগতের সব নিয়মে সাম্য থাকে, থাকে একসূত্রী বোধ। এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদে ম্যাক্সওয়েলীয় জগৎ আর নিউটনের গতি বিজ্ঞানের সমন্বয়তা গড়ে উঠেছিল। এই বিশ্বাসের কাঠামোয় গড়ে ওঠে আলোর কণাতরঙ্গতত্ত্ব এবং সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের মহাকর্ষ ও ত্বরণের সাদৃশ্য। একই বিশ্বাসে মহাবিশ্বের সর্বত্র সমানাকৃতি বোধ জাগে; একই কারণে মহাকর্ষের আকর্ষণের বিপরীত বিকর্ষণের চিন্তা—বিপরীতকে নিয়ে সাম্যবোধের সৃষ্টি; সমন্বয়ের ধারণা সমান ও অসমানকে মেনে নিয়ে। মহাকর্ষের বিচারে মহাজাগতিক ধ্রুবক না থাকলে মহাবিশ্বের আকারে সমাকৃতি থাকে না।

মহাজাগতিক ধ্রুবক আপেক্ষিকতাবাদে অতিরিক্ত হলেও প্রয়োজনীয়, আইনস্টাইনের বিশ্বজগৎ এই ধ্রুবক ছাড়া গড়ে উঠতে পারে না। ডিসিটার আপেক্ষিকতাবাদের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা মহাবিশ্বের বর্তুলতা মেনে নিচ্ছেন, মানছেন না তার সমাকৃতি। তাঁর মহাবিশ্ব আকারে ক্রমবর্ধমান, স্পেস প্রতিমুহূর্তে বর্তুল থেকে সমতলাকৃতি পেতে চলেছে – চলেছে নন-ইউক্লিডীয় জগৎ থেকে ইউক্লিডীয় জগতের দিকে।

১৯২০ সালে মাউনট উইলসন অবজারভেটরির পরীক্ষাতে যেমন জানা গেল, মহাবিশ্বে রীমানের জ্যামিতি প্রযোজ্য, এখানে ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি ১৮০° ডিগ্রির বেশি, তেমনি ছায়াপথের অপসারণ মহাবিশ্বের ক্রমবর্ধমান রূপ প্রকাশ করে। মহাবিশ্ব স্থির নয়, —এর আকারের পরিবর্তন আছে।

এদিকে, আইনস্টাইনের মহাকাশতত্ত্ব প্রকাশ হবার কিছু পরে বিখ্যাত বিজ্ঞানী জর্জ গেমোর শিক্ষক রাশিয়ান জ্যোতির্বিদ প্রফেসর ফ্রিডমান সম্পূর্ণ গাণিতিক কারণে আইনস্টাইনের মহাজাগতিক ধ্রুবকটিকে নাকচ করতে চাইলেন। কোন সংখ্যাকে শূন্য দিয়ে ভাগ করলে যে ভাগফল পাওয়া যাবে, সেটি নিশ্চিত নয়, এখানে সমস্ত সম্ভাবনা থাকে। অঙ্কের ফলাফলে এটিকে অনন্ত বা ইনফিনিটি বলা হয়। দুটি সমীকরণের একটি যদি শূন্য হয় সেটি ভাজক হলে এই গোলযোগ দেখা যাবে। ফ্রিডমান দেখলেন, আইনস্টাইন তাঁর সমীকরণের সমাধান কালে একটি ধাপে একটি রাশিকে এমন একটি সমীকরণ দিয়ে ভাগ করেছেন যেটির মান কোন অবস্থায় শূন্য হতে পারে। এই সমীকরণটি শূন্য হলে, আইনস্টাইনের বিশ্বলোক স্থির নয়, এটি সময়ের অনুবর্তনে বাড়ে, কমে—যেন স্পন্দনশীল, যেন তরঙ্গায়িত। অথচ শুধু আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের ভিত্তিতে গড়ে তোলা বিশ্বলোক স্থির—সেখানে গণিতের ছকে স্পন্দন পাওয়া যায় না।

১৯২০ সাল থেকে মাউনট উইলসন অবজারভেটরিতে হাবেল মহাকাশের রহস্যের উত্তর খুঁজে আসছেন। ১৯২৪ সালে এনড্রোমিডা M31 ছায়াপথে তিনি কিছু তারকার দেখা পেলেন যারা ৮ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। আমাদের সূর্য যে ছায়াপথের একটি অংশে তার ছোট পরিবারটি নিয়ে আছে, সেই ছায়াপথের তুলনায় এই তারারা আছে অনেকদূরে। আরো কিছুদিন পরে জানা গেল বিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরেও তারারা আছে। সৌর পরিমণ্ডলের ছায়াপথ মহাবিশ্বের একটি সামান্য অংশ। এনড্রোমিডার ছায়াপথের আবিষ্কার শুনে একজন বেলজিয়াম মঙ্ক, নাম লা মেটার, ১৯২৭ সালে একটি পেপার প্রকাশ করেন ; পেপারটিতে তিনি দেখান যে, আইনস্টাইনের আপাতস্থির জগৎ স্বভাবত অস্থির ;. এ জগৎ ক্রমবর্ধমান, এর ক্রমবর্ধন ডিসিটারের উপপত্তি মেনে চলবে। লা মেটারের প্রতিপাদ্যে জানা গেল, মহাবিশ্বের শুরু এক প্রকাণ্ড আদিম এটম বা ব্রহ্মাণ্ড বা Cosmic egg থেকে। এই প্রকাণ্ড আদিম এটম বা ডিমে মহাবিশ্বের নব পদার্থ ঘনীভূত হয়ে সঞ্চিত ছিল। দেশ ও কালের সূচনায় ডিমটি ফেটে যায়, ছড়িয়ে পড়তে

থাকে। আমাদের চেনা জানা বিশ্বলোক, এমন কি আইনস্টাইনের বিশ্বলোকও এই ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়া ক্রমবর্ধমান বর্ধিষ্ণু বিশ্বলোকের একটি পর্যায় মাত্র।

লা মেটারের প্রতিপাদ্য কিছুটা অবহেলিত থাকে। পরে বিজ্ঞানী এডিংটন এই পেপারটির পুনর্মূল্যায়ন করেন। ইতিমধ্যে হাবেলের আবিষ্কারের ফলে আরো জানা গেল দূরের ছায়াপথের তারারা যে গতিতে সরে যায়, সেই গতি দ্রুত, বেশ দ্রুত; তার তুলনা আলোর গতির সঙ্গে করা যাবে। আইনস্টাইনের মহাজাগতিক ধ্রুবকের চিন্তা চেনা-জানা নক্ষত্রের মন্দগতি ধরে। যেখানে তারাদের গতি দ্রুত, সেখানে আইনস্টাইনের ধ্রুবক পরিত্যজ্য; আবার লা মেটার তাঁর প্রতিপাদ্যে ছায়াপথের অপসারণের হারের একটি সমীকরণ দিয়েছিলেন। হাবেল এই সমীকরণে ঐ হারের একটি মান বা রাশি বসিয়ে আইনস্টাইনের গড়া জগতের ব্যাসার্ধটি পেলেন; আইনস্টাইনের জগৎ মিথ্যে নয়, এটি একটি ধাপ, অনন্ত সম্ভাবনাময় আকারের একটি রূপ, একটি বিশেষ পর্যায়। আইন-স্টাইনের মহাজাগতিক ধ্রুবকের সাপেক্ষে লা মেটারের বিশ্বলোকের তিনটি সম্ভাবনা। ধ্রুবকটি যদি শূন্য হয়, তবে মহাবিশ্বের শুরু ১০,০০০ মিলিয়ন বছর আগে বিরাট এক বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে—যে ঘটনাটিকে বলা হয় বিগ ব্যাঙ (Big bang)। এরপর মহাবিশ্ব নির্দিষ্ট হারে বেড়ে চলেছে। ধ্রুবকটির মান যদি হয় পজিটিভ, তবে ধরা হয় ৬০,০০০ মিলিয়ন বছর আগে আদিম এটমটি ভেঙে যায়। ধীরে ধীরে ৫০,০০০ মিলিয়ন বছর পর স্থিরতা দেখা দেয়। ইদানীংকার ক্রমর্ধমানতা এই স্থিরতার সহসা অবলুপ্তির ফলে গড়ে ওঠে, কোন বিগ ব্যাঙ জাতীয় বিস্ফোরণ এর কারণ নয়। ধ্রুবকটি নেগেটিভ হলে জানা যাবে মহাবিশ্ব ক্রমবর্ধনশীল, তবু এটি স্থিতাবস্থা বজায় রাখার চেষ্টা করবে—বজায় রাখবে নতুন বস্তু বা চিরন্তন সৃষ্টি অব্যাহত রেখে।

আইনস্টাইনের তত্ত্বের গঠন নিয়ে আলোচনা চলে, আন্দোলন হয়। তবু অবাধ সীমাবদ্ধ দেশের কল্পনা অব্যাহত থাকে। মাক্স বোর্ন বলেন, "এই উপপত্তি থেকে জানা গেল তারারা কেন দ্রুত সরে যায় না—অসীম স্পেসের পটভূমিকায় যা সম্ভব। জানা গেল মাক এর প্রতিপাদ্যের প্রকৃতিজ অর্থ—জাড্যের নিয়ম তারকাপুঞ্জের সাংগঠনিক রীতির সম্পূর্ণতার উপর নির্ভরশীল, এটি শূন্য স্পেসের ধর্ম নয়।—এবং ক্রমবর্ধমান দেশকালের মহাবিশ্বের অবারিত দ্বারে এ তত্ত্ব আধুনিক যুগকে পৌঁছে দিল।"

নতুন তথ্য যখন মহাবিশ্বের রহস্য উন্মোচনের জন্য প্রস্তুত, সেই সময়ে আইনস্টাইন মহাবিশ্ব সম্বন্ধে তাঁর ধ্যান-ধারনা চিন্তা-ভাবনা জানালেন। মহাজাগতিক ধ্রুবকটিকে তিনি পরে পরিত্যাগ করলেন; বললেন, এটি তার ভুল। তবুও আকর্ষণের বিপরীত বিকর্ষণের চিন্তাকে সম্পূর্ণ ভুলতে পারলেন না,—এরা অন্য সাজে তাঁর তত্ত্বে দেখা দিয়েছে।

মহাজাগতিক ধ্রুবকের প্রয়োগের জন্য মহাকাশতত্ত্বের সমালোচনা ১৯১৮ সালেই আরম্ভ অন্যদিকে হয়। ডিসিটার বা এডিংটন তাঁর সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের মূল উপপত্তির

সত্যতায় সন্দেহ করছেন না তাঁদের ধারণা মহাকর্ষের টানে স্পেসে বর্তুলাকৃতি ফুটে ওঠে। এই বর্তুল :পথে যাবার সময় আলোর সোজা পথ বাঁকবে—এটি প্রমাণ করা দরকার। এডিংটনের ঐকান্তিক চেষ্টায় একদিন অভিযানটির প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়। ১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে যুদ্ধবিরতিচুক্তি সাক্ষরিত হলো, আর তারপর এডিংটন সূর্য গ্রহণের ছবি তোলার শেষ পর্যায়ের খুঁটিনাটি কাজে মেতে ওঠেন। দুটি ব্রিটিশদল দু জায়গায় যায়। স্বয়ং এডিংটন গেলেন প্রিন্সিপে আর অন্য একটি দল গেল সোব্রালে। এডিংটনের উত্তেজনা দেখে ডাইসন বলেন, পরীক্ষায় আইনস্টাইন ভুল প্রমাণিত হলে, এডিংটন পাগল হয়ে যাবেন আর আমাদের এডিংটনকে ছেড়ে ফিরে আসতে হবে।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যে অভিযাত্রী দলদুটি সূর্য গ্রহণের সময় এবং তার আগে ও পরে তারাদের অবস্থানের বিভিন্ন ফটো তোলেন। প্রিন্সিপে তোলা অধিকাংশ ছবিই খারাপ, শুধু একটি স্পষ্ট এবং ছবির মাপজোকে যে আলোর বাঁক পাওয়া গেল, তা আইনস্টাইনের তত্ত্বটিকে প্রতিষ্ঠা করছে। উত্তেজনায় অস্থির, অথচ বাইরে শান্ত এডিংটন বললেন, আমাকে ছেড়ে তোমাদের ফিরতে হবে না।

সোব্রোলে পাওয়া ছবির প্লেট ব্রিটেনে এনে ডেভেলাপ করা হলো। প্রথমকটি প্লেট অস্পষ্ট, আর তারপর পাওয়া গেল সাতটি প্লেটের ছবি যারা আইনস্টাইনের তত্ত্বের প্রমাণ জানাল, প্রিন্সিপে পাওয়া তথ্যের সঙ্গে মিল রেখে। আলো বাঁকে, বাঁকের নিয়ম নিউটনের তত্ত্বে নেই, বাঁকের পরিমাণ আপেক্ষিকতাবাদের সূত্রে ঘোষণা করা আছে।

২৭শে সেপ্টেম্বর লরেন্সের টেলিগ্রামে আইনস্টাইন ব্রিটিশ অভিযানের সাফল্যের প্রথম খবর পান, তবে সরকারিভাবে এখবর তখনো জানা যায়নি। পরীক্ষার প্রমাণের সম্পূর্ণতা তখনো স্থির হয়নি। তবে লরেন্স, এরনফেস্ট ইত্যাদি হল্যানডের, লেইডনের বিজ্ঞানীরা আনন্দে উত্তেজনায় বিহ্বল হয়ে ওঠেন। জ্ঞানের রাজ্যে মানুষের কি প্রচণ্ড প্রবল পদার্পণ। নিউটনের বিশ্বলোক সহসা ক্রমবর্ধমান বিশ্বলোকের মতো বিস্ফোরণে ফেটে গিয়ে বিরাট হয়ে দাঁড়ায়।

অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে আইনস্টাইন লেইডনে আসেন। ২৫শে অক্টোবর আমস্টার-ডামে ডাচ রয়েল একাদমির অধিবেশন বসে। আইনস্টাইনকে সেই অধিবেশনে স্বাগত জানানো হলো। তারপর প্রফেসর লরেন্স একাদমিকে জানান, প্রফেসার আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বের প্রমাণ ব্রিটিশ অভিযানে পাওয়া গেছে। তবু এটি সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়নি বলে, স্বীকৃতির জন্য আরো কয়েকটা দিন অপেক্ষা করতে হবে।

কয়েকটা দিন—মাত্র দশটা দিন—তারপর ৬ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যেবেলা ইংলনডে রয়েল সোসাইটি আর রয়েল এস্ট্রোনমিকেল সোসাইটির, যুগ্ম অধিবেশনে সার ডাইসন, এডিংটন ও ডেভিডসন যুগান্তকারী রোমাঞ্চকর ঘোষণা করলেন—আলো বেঁকে যায়—বাঁকের মাপ আইনস্টাইনের তত্ত্বকে প্রমাণ করেছে।

সমস্ত সভ্য উত্তেজনায় অস্থির। একটি যুগের আবির্ভাব হলো। সেই যুগের ভগীরথ আইনস্টাইন; তাঁর কীর্তিচ্ছটায় মুগ্ধ সেদিনের ব্রিটিশ বিজ্ঞানী, দার্শনিক সমাজ। চেয়ারম্যান জে জে টমসন আবেগাপ্লুত গলায় বললেন, "মানুষের চিন্তার ইতিহাসে এ এক সুমহান কীর্তি।—একটি অনাবিষ্কৃত দূরান্তের দ্বীপের আবিষ্কার শুধু নয়, এটি বিজ্ঞানের চিন্তার এক নতুন মহাদেশের আবিষ্কার। নিউটনের মহাকর্ষতত্ত্বের উদ্ভাবনের পর এটি মহত্তর আবিষ্কার।"

The Times পত্রিকা সম্পাদকীয়তে লিখলেন, "আইনস্টাইনের তত্ত্ব বিশ্বলোকের বুনটের কারিগরি বিচার করছে (Einstein's Theory dealt with the fabric of the Universe)"

আর এডিংটন?—যুদ্ধের লোকক্ষয়ে, ধ্বংসে ইউরোপ সেদিন নতুন করে পৃথিবীকে ভালবাসতে শুরু করে;—জীবনের সীমাবদ্ধতা, আয়ুর দ্রুত ক্ষয় বর্তমানকে ভালবাসতে শেখায়। আরেকবার ফিটজিরাল্ডের অনূদিত ওমর খৈয়াম-এর রুবাইকে ইউরোপের নরনারী তুলে নেয়। সেই রুবাই-এর অনুসরণে এডিংটন তার মনের আবেগ প্রকাশ করেন। নিউটনের ২৫০ বছর পর নতুন ফ্রেমে বিজ্ঞানের সত্য সেজে দাঁড়িয়েছে, পুরোনো ফ্রেমের ক্ষয়িষ্ণু রূপ পালটে গেল নতুন ফ্রেমের কারুকৃতিতে।

এডিংটন লিখলেন এবং রয়েল এস্ট্রোনমিকেল সোসাইটির ডিনারে পড়লেন:—

The clock no question makes fasts or slows,
But steadily and with a constant rate it goes.
And Lo! The clouds are parting and the sun
A crescent glimmering on the Screen—It shows! It shows!

Five minutes not a moment left to waste,—
Five minutes, for the picture to be traced
The stars are shining and coronal height
Streams from the Orb of Darkness—Oh, make haste!

. or in and out, above, about, below,
Tis nothing but a magic shadow show
Played in a Box, whose candle is the sun
Round which are phantom figures come and go.

Oh, leave the wise out measures to collate
One thing at least is certain, Light has weight
One thing is certain and the rest debet
Light rays, when near the sun, Do Not Go STRAIGHT!!

ঘড়ির গতি, সন্দেহ নেই, কখনো ধীর, কখনো দ্রুত
তবুও দোলে স্থির ছন্দে এবং অপরিবর্তিত
চেয়ে দেখ মেঘের ফাঁকে সূর্য হঠাৎ কি উচ্ছ্বাসে
একটি ফালি আলোর শিখার পর্দা বুকে উঠল ভেসে

পাঁচটা মিনিট, তাই যথেষ্ট, সময় নেই দ্বিধা করার
পাঁচটা মিনিট, কাটুক বাধা এইতো সময় ছবি তোলার।
তারার আলোর ঝিকিমিকি, সূর্যকীরিট আলোর ভরা
অন্ধকারের জাগলো বুকে ; জলদি করো, করো ত্বরা !

ভেতর বার, উপর নীচ, চারিদেকের আগল টুটে
শূন্যতার মধ্যখানে ছায়াবাজি উঠছে ফুটে।
যাদুর দীপে সূর্য নিজে মোমের শিখায় উঠবে জ্বলি,
অশরীরী প্রেতের মতো আমরা ঘুরি, ফিরি, চলি।

জ্ঞানীদের দাও পাল্লাদাঁড়ি, মাপুক তারা খুশি যেমন ;—
আমরা জানি সুনিশ্চিত আলোর কণার আছে ওজন।
তর্কজাল মেলুক, মেলুক—আমরা জানি, নেইতো দ্বিধা—
সূর্য কাছে আলোর-গতির পথের দিশা নয়কো সিধা !

১৯১৯ সালের ৭ই নভেম্বর রাতারাতি আইনস্টাইন নিজেকে বিখ্যাত বলে জানলেন।

১৯০১ সাল থেকে যে বিজ্ঞানী বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞান-প্রতিমাটির নতুন রূপ দিতে উদ্যোগী হয়েছিলেন, সেই ধারা ১৯১৭ সাল পর্যন্ত প্রবহমাণ থাকল। বিজ্ঞানজগতে একটা বৌদ্ধিক বিপ্লব সৃষ্টি করলেন এলবার্ট আইনস্টাইন। পুরনো তত্ত্বের ও মতের সঙ্কীর্ণতা ও ভুল সাহস করে ঘোষণা করলেন, নতুন পথের ইঙ্গিত দিলেন; সেই পথ হয়তো সহজ সরল নয়, তবু সেই পথে চলার ইশারা জাগে। একটি একক মনীষা, নিঃসঙ্গ কর্মী অক্লান্ত পরিশ্রমে চিন্তায় ভাবনায় গড়ে তুললেন সেই পথের আকৃতি, তার ব্লুপ্রিনট। সেই পথ ধরে ভবিষ্যতের বিজ্ঞান-সাধকরা এগিয়ে চলেন; দলবদ্ধ কাজের প্রথা, সমবায়মূলক প্রক্রিয়ার বিকাশ আইনস্টাইনের একার চেষ্টায় গড়া পথে বিকশিত হলো। পথের কত ধারা: আলোর শক্তি কণাবাদ. ব্রাউনিয়ান মুভমেনটে আণুবীক্ষণিক বস্তুকণার অবিরাম আন্দোলনের কারণ, থারমোডাইনামিক্স—তাপগতি-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য-গুলিতে সাংখ্যায়নিক বলবিদ্যার রীতিতে বিচার এবং ঐ একই সাংখ্যায়নিক রীতিতে আলোর বিকিরণ ও শোষণের কারণ আর সবার উপরে দেশ-কালের পরিধিতে প্রাকৃতিক ঘটনাগুলিকে নিখুঁতভাবে জানার চেষ্টা—তাঁর আপেক্ষিকতাবাদের ইতিকথা।

বিজ্ঞানজগতে যিনি আলোড়ন এনেছেন, আন্দোলন করেছেন, সেই আলোড়ন আন্দোলন সাধারণ মানুষের জগতে জেগে উঠল। আইনস্টাইন এমন একজন মানুষ যিনি ভবিষ্যৎ ঘটনা জানাতে পারেন, সৃষ্টিকর্তা গডের রহস্য বুঝতে পারেন। তিনি নিউটনের বর্ণিত ভগবানের মস্তিষ্ক, একজন মন্ত্রদ্রষ্টা দার্শনিক, নতুন এক মেসিআ (Messiah), একজন ত্রাণকর্তা, মহাজ্ঞানী আপনভোলা অসাধারণ মহাপুরুষ। বিশ্ববিশ্রুত খ্যাতির শুরু ১৯১৯ সালের সূর্য গ্রহণের কাল থেকে, যখন তিনি রুগ্ণ, ক্লান্ত, বিষণ্ণ, অবসন্ন, পরিশ্রান্ত—অক্লান্ত কাজের পর সহসা কর্মহীনতার শূন্যতার মধ্যে নিমজ্জিত। তাঁর

পুরনো বিবাহ-বন্ধন ভেঙে গেছে, নতুন পারিবারিক জীবনের সূচনা সেই বছরেই শুরু ; তাঁর চার পাশে জার্মানির ধ্বংসস্তূপে নতুন জার্মানি গড়ে তোলার হাঁকডাক। এই পরিবর্তনের পটভূমিতে আইনস্টাইন নিজেকে সর্বসাধারণের কৌতূহলের বিষয় হয়ে উঠতে দেখলেন। নিঃসঙ্গ বিজ্ঞান-সাধকটি জনসাধারণের আলোচনার বিষয়—তাঁকে নিয়ে কৌতূহলের পরিসীমা নেই। গুটিপোকার নিভৃত একান্ত সাধনার কক্ষ থেকে আইনস্টাইন নামক একটি রঙিন প্রজাপতি বাইরে এল।

১৯১৯ সালের নভেম্বর মাসে আইনস্টাইনের বয়স চল্লিশ। চুলে তখনো সাদা ছোপ ধরেনি ; প্রশস্ত কপালে চিন্তার ভাঁজ গভীর হয়ে কেটে বসেনি ; চোখের কোণায় রহস্যময় হাসির সূক্ষ্ম রেখাগুলো ফুটি ফুটি হয়ে উঠেছে। পোশাকে-পরিচ্ছদে তখনো সম্পূর্ণ বোহেমিয়ান নন ; চুল কাটেন, অবশ্য মাঝে মাঝে। যখন তিনি বাইরের অতিথি অভ্যাগতের সঙ্গে দেখা করেন, তখন পোশাকে ক্রিজ থাকে। তবে ৫ নম্বর হেবার লেনডস্ট্রেস বাড়ির নিজের স্টাডিতে স্ত্রী এলসার প্রবেশ নিষিদ্ধ, ঝাঁটপাট ঝারপোঁছ য· করার তিনি নিজে করেন ; সিগারের ছাই, ছেঁড়াটুকরো কাগজ ভরা অগোছাল টেবিল নিয়ে মহা আরামে, বহাল তবিয়তে তিনি কাজ করেন—পায়ে মোজা নেই, গায়ে জ্যাকেট বা টাই নেই, প্যানট এত ঢোলা, এত ক্রীজহীন যেন স্লিপিং স্যুটের পাজামা। বাইরের জগতের যাঁরা এই বিখ্যাত লোকটিকে দেখতে তাঁর স্টাডিতে আসেন, তাঁর এই ছন্নছাড়া ভাব দেখে তাঁরা আরো বিস্মিত হন ; প্রতিভাবান পুরুষটি শুধু বিজ্ঞানী নন, আপনভোলা অধ্যাপক নন,—তিনি একজন অসম্ভব উচ্চ স্তরের মানুষ, জাগতিক বস্তু বা রীতি নীতিতে যাঁর অনীহা। আইনস্টাইন একজন গৃহী-সন্ন্যাসী!

যুদ্ধের ধ্বংসের পর আইনস্টাইন এক নতুন হাওয়া নিয়ে উদয় হলেন। সিনেমার নায়ক, প্রসিদ্ধ খেলোয়াড়, ধর্মের আচার্য, যুদ্ধের সেনাপতি, জটিল রাজনীতিবিদ—সবার থেকে আলাদা এই লোকটি বড়ই অদ্ভুত। তাঁর বিজ্ঞানের তত্ত্ব বোঝা যায় না, অথচ জগৎ সম্পর্কে অসম্ভব তথ্যের ঘোষণা করেন। সময়ের সুমহান প্রবল সাম্রাজ্যকে কেটে ছেঁটে সাধারণ করেছেন—যে সময় ছোট হয়, বড় হয়, বাড়ে বা কমে। আর বিশ্বের আরেকটি মহিমান্বিত চরিত্র আলো, তার সিধে পথ বাঁকিয়ে দিলেন। খবর কাগজের রিপোর্টার আর গল্পকারের হাতে এলবার্ট আইনস্টাইন অতি দ্রুত পুরাণ-পুরুষ হয়ে উঠলেন।

হাতের কাছে রাখা চেকটি বইয়ের ভাঁজে কখনো রাখেন আইনস্টাইন। এই ঘটনা গল্পে দাঁড়ায়, তিনি বইয়ের পাতায় চিহ্ন হিসেবে চেক রাখেন আর চেকসুদ্ধ সেই বই লাইব্রেরিতে ফেরত দেন। তাঁর চরিত্রের সাহায্য-করার-স্বাভাবিক-প্রবৃত্তি নিয়ে গল্প তৈরি হয় ; লজেন্সের পরিবর্তে ছোট মেয়ের অঙ্ক কষেন আইনস্টাইন,—গল্পের সেই মেয়েটি কখনো জার্মানির, কখনো স্যুইজারল্যানডের,কখনো বা এমেরিকার। তাঁর সহজাত আত্মকেন্দ্রিক ভাব নিয়ে গল্প হয়—ট্রামে বা বাসে ফেরত পাওয়া খুচরো পয়সা হাতে নিয়ে

নাড়াচড়া করেন আইনস্টাইন। কনডাক্টার বারবার বলে, খুচরো ঠিক আছে; আর তারপর চটে বলে,অঙ্ক জানেন না? আইনস্টাইন বলেন, না। এ গল্পের কনডাক্টার ব্রিটিশ, কখনো বা এমেরিকান।

চশমা ভুলে আসায় মেনু পড়তে পারেন না আইনস্টাইন—রেস্টুরেনটে খেতে এসেছেন, পোশাক-আশাক ক্রীজহীন। তিনি যখন ওয়েটারকে মেনুটা পড়তে বলেন, ওয়েটার তাঁর দিকে তাকিয়ে তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলে, আম্মো পড়তে জানি না। —অথবা সেই মেয়েটি যে আইনস্টাইনকে জিজ্ঞেস করে, আপনি কি করেন। আইনস্টাইন উত্তর দেন যে, উনি ফিজিক্স শিখছেন, ফিজিক্সর ছাত্র! আর সেই মেয়ের সবিস্ময় উক্তি, "সে কি! আমি তো কবে ফিজিক্স পড়া শেষ করেছি।" টুকরো টুকরো মুখরোচক গল্প আইনস্টাইনকে নিয়ে গড়ে ওঠে। বিশ্বের সব আপনভোলা অধ্যাপকের সব গল্প আইনস্টাইনের নামে চালু হতে থাকে, লোকে বিশ্বাস করে—আইনস্টাইনকে সব যেন মানায়।

আর সব গল্পের শুরু ১৯১৯ সালের শেষ থেকে ১৯২২ সালের মধ্যে। তাছাড়া বাজারে এলো আইনস্টাইন চুরুট, আইনস্টাইনের মতো এলোমেলো চুলের ঝাঁপি রাখা আর ঠোঁট ভর্তি গোঁফ। পত্র-পত্রিকায় কার্টুন। লনডনের পাল্লাডিয়াম থিয়েটার হল সব ভেবে টেবে আইনস্টাইনকে তিনসপ্তাহের জন্য স্টেজে দাঁড়াতে বললেন, শুধু দাঁড়ানো, কোন বিশেষ পোশাক না, বক্তব্য না, কিছু না। তাদের ধারণা আইনস্টাইনকে দেখবার জন্য ভিড় হবে, মোটা টাকার টিকিট বিক্রি হবে, আর আইনস্টাইনও টাকা পাবেন।

সাধারণ আম-জনতার কাছে আইনস্টাইনের সুলভ পপুলারিটি অন্য লোকের গাত্রদাহের কারণ। পপুল্যারিটি তার বাড়ছে জার্মানিতে, এবং জার্মানির বাইরেও, বিশেষ করে ইংলনডে ও আমেরিকায়। THE TIMES পত্রিকার FABRIC OF UNIVERSE সম্পাদকীয় ঘোষণার পর অনেক লেখা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হলো। কেভেনডিস লেবরেটরির এ. এ.'রব উপহাস করে একটি গান লিখলেন; তার কয়েকটি স্তবক হলো :—

Scientists so unbelieving have completely changed their ways.
Now they humbly sing to Einstein everlasting hymn of praise.
Journalists in search of copy first request an interview.
Then they boost him, boost him, boost him, boost him,
Until all is blue!
He the universe created, spoke the word and it was there.
Now he reigns in radiant glory on his professorial chair.
Editions of daily papers yellow, red and every hue
Boost him, boost him, boost him, boost him, boost him
Until all is blue!

Others Scientists neglected, may be feeling somewhat sick,
And imagine that the butter is laid on a trifle thick.
Heed no such considerations be they false or be they true
Boost him, boost him, boost him, boost him, boost him
Uutil all is blue !

বিজ্ঞানীদের যায় না বোঝা, বদলায় হঠাৎ পথটা ;
আইনস্টাইনের প্রশংসাতে সবাই ধরে গতটা !
কাগজঅলা খুঁজছে ফিরছে ইণ্টারভিউ চাইছে নিতে—
সবাই মিলে তোল্লা দিয়ে তুললো তাকে আকাশ ভিতে !
মহাবিশ্ব সেই গড়েছে—যেমনি বলা, অমনি যে সে—
অধ্যাপকের চেয়ার পেতে হাস্যমুখে বসল এসে।
দৈনিক পত্র যেমন বা হোক, ডান ও বাম, শত্রু-মিতে
সবাই মিলে তোল্লা দিয়ে তুললো তাকে আকাশ ভিতে।
বিজ্ঞানীরা রইল যারা ডামাডোলে একটি কোণে
ভাবছে বসে, সাবাস যতো পাচ্ছে দেখি একটি জনে।
কি সেই তত্ত্ব, মিথ্যে সত্য বাছবিছার তো নেই কো চিতে—
সবাই মিলে তোল্লা দিয়ে তুললো তাকে আকাশ ভিতে !

বিজ্ঞান-জগতের মিশ্র প্রতিক্রিয়ার কথা প্রফেসর রব তাঁর গানে জানালেন। জার্মানিতে নার্নস্ট, প্লাঙ্ক, সমারফেল্ড, মাক্স বোর্ন তাঁর সাফল্যে উল্লসিত। যে মানুষটিকে তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কাজ থেকে সরিয়ে একান্তে কাজ করার সুযোগ দিয়েছিলেন, তিনি সফল হয়েছেন, নিজে সম্মানিত হয়ে পরাজিত জার্মানির জন্য সম্মান এনেছেন ! ইংলনডে এডিংটন, জিনস বা লিনডামান নতুন বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠায় খুশি। অন্যদিকে জে. জে. টমসন, রাদারফোর্ড বা সার ডাইসনের নতুনকে মেনে নিতে সংশয়—দ্বিধা। রাদারফোর্ড, All experiment রাদারফোর্ড, বিজ্ঞানের জগতে All calculation আইনস্টাইনের এই খ্যাতিতে কিছুটা বিক্ষুব্ধ—সেই বিক্ষোভ পরে তাঁর আইনস্টাইনে এলার্জি হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে আইনস্টাইনের জার্মান জাতীয়তা, ধর্মে ইহুদিত্ব তাঁকে অজার্মান খ্রীষ্টান জগতে আপন করে মেনে নিতে বাধা সৃষ্টি করে। দি টাইমস তাঁর পরিচিতি বোঝাতে তাঁকে একজন জার্মান বিজ্ঞানী বলে জানিয়েছে এবং জানিয়েছে তিনি ধর্মে ইহুদি ও ইহুদিতত্ত্বে বিশ্বাসী। এছাড়া তার বামপন্থী বিশ্বাসের কথা, ৯৩ জনের মেনিফেস্টোর প্রতিবাদে সামিল হওয়া ইত্যাদি রাজনীতি মতবাদও জানিয়েছে। জার্মান এবং ইহুদি আইনস্টাইনকে মেনে নেওয়া কঠিন। বৃটিশ বিজ্ঞানী-বিদগ্ধ মহলে সেই সংশয় ; অন্যদিকে পরাজিত হৃতমান জার্মানির এক শ্রেণী বুদ্ধিজীবী মহলে জার্মানির যুদ্ধের সমালোচক আইনস্টাইনকে স্বীকার করার অর্থ হলো পরাজয়ের অপমানের বোঝা বাড়িয়ে তোলা। তার উপর

আইনস্টাইন ইহুদি ; দি টাইমস জানিয়েছে, তিনি ইহুদিতত্ত্বে বিশ্বাসী। যাঁর কাজের ভিত্তিতে আইনস্টাইন আলোকতড়িৎ ফল গঠন করেছিলেন, সেই প্রফেসর লেনার্ড জার্মানিতে আইনস্টাইন বিরোধীদলের নেতা। ১৯০৫ সালে লেনার্ড নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন—এই বিশ্ব-স্বীকৃত বিজ্ঞানীকে সামনে রেখে বিরোধী-বিদ্বেষীরা আন্দোলন গড়ে তোলেন। আইনস্টাইনের বিরোধিতা আর একটি কারণে বেড়ে ওঠে। The Times পত্রিকায় ডিসেম্বর মাসে রিলেটিভিটির উপর আইনস্টাইন একটি প্রবন্ধ লেখেন ; প্রবন্ধের শুরুতে তিনি লিখলেন, "বিজ্ঞান জগতের আন্তর্জাতিক সহযোগিতার বন্ধন সহসা ভেঙে যাবার পর, বৃটিশ বিজ্ঞানী আর জ্যোতির্বিদদের সঙ্গে মুখোমুখি হবার এই সুযোগ পেয়ে আমি কৃতজ্ঞ, আনন্দিত।' প্রবন্ধটির শেষ আইনস্টাইনের নিজস্ব ধারণামত নির্মল রসিকতা দিয়ে,—"পাঠকদের এই রিলেটিভিটির ভোজসভায় জার্মানিতে আমি জার্মান বিজ্ঞানী বলে চিহ্নিত হব; আর বৃটিশদের কাছে সুইস-জার্মান। আর কোন দিন এই তত্ত্ব যদি মিথ্যে বলে প্রমাণিত হয় তবে সেদিন এই পোড়ামুখো আমি জার্মানদের কাছে সাব্যস্ত হব সুইস জু বলে আর ইংরেজরা বলবে, উনি জার্মান বিজ্ঞানী।" আইনস্টাইনের প্রবন্ধটি বিনে সম্পাদনায় কোন কাটছাঁট না করে দি টাইমস ছাপিয়ে তাদের সম্পাদকীয়তে লিখলেন, "তাঁর নিজস্ব রসিকতাটুকু তাঁকে উপভোগ করতে দিচ্ছি। তবু মনে হচ্ছে ডক্টর আইনস্টাইন তাঁর নিজের পরিচয় সম্পূর্ণ জানাচ্ছেন না—এখানেও রিলেটিভিটি।"
দি টাইমস রসিকতার জবাবে রসিকতা করলেন, সকলেই রসিক নন। মনুষ্য চরিত্রে সেকালীন বুদ্ধিজীবী মহলে যে সাধারণ ধারণা প্রচলিত—সেই ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে আইনস্টাইনের ব্যাখ্যা হয়তো শতকরা একশভাগ খাঁটি ; তবে অপ্রিয় সত্য ভাষণের সময় সেটি নয়। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী রবীন্দ্রনাথ সংবর্ধনার উত্তরে অভিমানে যে ধরনের কথা বলেছিলেন, বিজ্ঞানী আইনস্টাইন রসিকতা করতে গিয়ে সেই একই ভুল করলেন। সময়ের ভুল, অনভূতি বা সেনটিমেনটকে যুক্তির উপর স্থান দেওয়া। অন্যদিকে, অন্তত আইনস্টাইনের কাছে অভিমানের কোন কারণ সেদিন ছিল না।
বিজ্ঞানসমাজে আরো একটি ধারণা গড়ে উঠেছিল—তাঁর তত্ত্ব মানে গণিতের বিভীষিকা! সেকালীন সনাতন বিজ্ঞানে যে ধরনের গাণিতিক ছক প্রতিষ্ঠিত, আইনস্টাইনের তত্ত্বে সেখানে সম্পূর্ণ এক আলাদা গণিতের কাঠামো। সে যুগের স্বনামধন্য বয়স্ক বিজ্ঞানীদের পক্ষে এ তত্ত্ব বোঝা কঠিন, কারণ গণিতের জটিলতা। সার ডাইসন প্রৌঢ় বয়সে অঙ্ক কষতে চেষ্টা করেন কারণ তাঁর নায়কত্বের অভিযানে আলোর পথ-বাঁকা প্রমাণিত হয়েছে ; তবু রিলেটিভিটি গণিতের জন্য অবোধ্য। মাউন্ট উইলসন অবজারভেটরির প্রফেসর হেল. যিনি একদিন ১৯১৪ সালে, সূর্যগ্রহণকালে তারাদের অবস্থান মেপে আলোর বাঁক প্রমাণ করা যেতে পারে এই প্রকল্প অনুমোদন করেছিলেন, সম্পূর্ণ রিলেটিভিটি তত্ত্বের আঁটসাঁট গঠন দেখে প্রথমে মুখ ফিরিয়েছিলেন, পরে বোঝার চেষ্টা করেন। এখানেও বাধা বয়স

এবং অঙ্ক! রাদারফোর্ড বিজ্ঞানের শুদ্ধ তাত্ত্বিক চিন্তার বহুল প্রচার চান না, চান না চিন্তাসমীক্ষা বা গেডাঙ্কের সীমাহীন প্রচেষ্টা।

তথ্য থেকে গড়ে ওঠা তত্ত্ব—বিজ্ঞানের এই প্রচলিত পথের বেনিয়ম আইনস্টাইন আর তার ফ্যাশানে সেজে দাঁড়াচ্ছে একদল নতুন বিজ্ঞানী; এইসব অলস, ছদ্ম চিন্তাবিদদের নাটের গুরু হলেন আইনস্টাইন। আইনস্টাইনকে রাদারফোর্ড যেন সইতে পারেন না। এমনকি ১৯২০ সালে কেম্ব্রিজে আইনস্টাইনকে অধ্যাপকত্ব দেবার চেষ্টা যখন হয়, তখন রাদারফোর্ডের মৌন-অসম্মতির ফলে সে চেষ্টা অসফল হয়। একই ঘটনা ঘটে ১৯৩৩ সালে; সেবারেও আরেকবার চেষ্টা হলো ইংলনডে আইনস্টাইনকে স্থান দেবার, এবারও সে-প্রচেষ্টার হন্তারক রাদারফোর্ড। এক পৃথিবীতে যেমন দুটি সূর্য থাকতে পারে না, কেভেনডিস লেবরেটেরিতে তেমনি থাকতে পারে না আইনস্টাইন এবং রাদারফোর্ড। অথচ এই রাদারফোর্ড আইনস্টাইনের রিলেটিভিটি থিয়োরি সম্পর্কে প্রথম দিকে রেখেঢেকে প্রশংসা করলেও ১৯২৯ সালে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, "আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বের সত্যতা ছাড়াও স্বীকার করি এটি একটি চমৎকার শিল্পকর্ম।" তত্ত্বকে মানছেন রাদারফোর্ড, মানতে পারছেন না আইনস্টাইনকে!

আইনস্টাইনকে পুরোপুরি জে. জে. টমসন মেনে নিতে পারছেন না। তত্ত্বের প্রমাণের প্রথম প্রশংসার উচ্ছ্বাস টমসন ব্যক্ত করেছিলেন। তবু আইনস্টাইনের তত্ত্ব নিয়ে এত লাফালাফি টমসনের না-পছন্দ। আর আইনস্টাইনের মহাবিশ্ব নিয়ে কথা উঠলে ব্যঙ্গ করে বলবেন, "আইনস্টাইনের স্পেস পেলাম, পেলাম ডিসিটারের স্পেস,—বর্ধমান বিশ্বলোক, সঙ্কুচিত মহাবিশ্ব, আন্দোলিত মহাবিশ্ব, রহস্যময় বিশ্বলোক,—কত যে! মনে হয় গণিতবিদরা একটা নতুন সমীকরণ লিখেই নতুন বিশ্বের ছক গড়তে পারেন। স্বাধীনচেতা হলেই তার নিজের একটা বিশ্বলোক থাকতে পারে।"

অন্যদল বিজ্ঞানী আইনস্টাইনকে প্রতিষ্ঠিত করে বিজ্ঞানের সর্বজনীন সহযোগিতার দিকটিকে ফিরে পেতে চান। তেজস্ক্রিয় পদার্থের রহস্য উন্মোচনের সময় ইংলনড, জার্মানি, ফ্রান্স, কেনাডা, হল্যানড, ইউ এস এ-র বিজ্ঞানীদের সহযোগিতা আন্তর্জাতিক বেড়া ভেঙেছিল; বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথে সেই সহযোগিতার দুর্বার গতি প্রয়োজন। আইনস্টাইনের স্বীকৃতি তারই প্রথম সোপান। এডিংটন আর তাঁর সহকর্মী সহযোগী বিজ্ঞানীরা রয়েল এস্ট্রোনমিকেল সোসাইটির গোল্ড মেডেল আইনস্টাইনকে দেবার জন্য অনুমোদন করেন—ঘটনাটি ঘটে ১৯২০ সালের জানুয়ারি মাসে। সব কিছু ঠিকঠাক, হঠাৎ প্রায় শেষমুহূর্তে সরকারী মহলের হস্তক্ষেপের ফলে এটি মুলতুবি হয়। জার্মান বিজ্ঞানী আইনস্টাইনকে রয়েল এস্ট্রোনমিকেল সোসাইটির মেডেল দেওয়া বৃটিশ সরকারের মনঃপুত নয়। মন্দের ভালো, সে বছর কাউকে মেডেল দেওয়া হলো না। ঘটনার বিস্ময়কর পরিবর্তনে এডিংটন ক্ষুব্ধ ও আহত; আইনস্টাইনের কাছে তিনি তাঁর আন্তরিক লজ্জা প্রকাশ

করে চিঠি লেখেন। আর আইনস্টাইন বৃটিশদের অদ্ভুত আচরণ দেখে মজা পান—"এরা এক হাতে পুরস্কার দিয়ে, আরেক হাতে কেড়ে নিতে পারে, সাংঘাতিক এই জাত!"
জার্মান ও অজার্মান ভাষায় রিলেটিভিটির উপর বই লেখা চলে। তাঁর নিজের লেখা বইয়ের জার্মান ও ইংরিজি সংস্করণের বহু পুনর্মুদ্রণ। বই লিখে আয় বাড়ে। তাছাড়া হল্যানডের লেইডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রফেসর ওনেস আইনস্টাইনকে স্পেশাল প্রফেসর-পদে বরণ করতে চান; তিন বছরের চুক্তি, বার্ষিক ২০০০ গিল্ডার সম্মান দক্ষিণা, কাজ বছরে এক বা দুবার কয়েক সপ্তাহের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা, আলোচনা করা, দু-একটা ক্লাস নেওয়া, সেমিনারে বক্তৃতা দেওয়া। বন্ধু এরনফেস্ট-এর অনুরোধে পদটি আইনস্টাইন গ্রহণ করলেন। লরেন্স মজা করে জানান, ওনেস, যিনি কুড়ি বছর আগে আইনস্টাইনকে তাঁর লেবরেটরিতে সহকারীর কাজে পর্যন্ত নেননি,সেই তিনি এখন আইনস্টাইনকে তাঁর লেবরেটরিতে পেলে বিশেষ সম্মানিত হবেন।
রিলেটিভিটি তত্ত্বটিকে সহজ সরল সাধারণের উপযোগী করে তোলার জন্য সায়েন্টিফিক এমেরিকান পত্রিকায় একটি ৫০০০ ডলার পুরস্কারের প্রতিযোগিতা হয়—৩০০০ শব্দের প্রবন্ধ রচনা। আইনস্টাইন হেসে বলেন, আমি ছাড়া প্রতিযোগিতায় আমার সব চেনা জানা বন্ধুরা যোগ দিল। আর আমি জানি, আমি যোগ দিলে জিততে পারতুম না।'—প্রতিযোগিতাটি খুব পপুলার হয়। বের্নের পেটেনট অফিসের কেরানীর আবিষ্কার রিলেটিভিটি থিয়োরির উপর লেখা প্রতিযোগিতায় প্রথম হলেন বৃটিশ পেটেনট অফিসের একজন সিনিয়র পরীক্ষক, নাম লিনডন বোল্টন!
বইয়ের রয়েলটি, বক্তৃতা, হল্যানডের স্পেশাল অধ্যাপকের পদ সব মিলিয়ে আর্থিক উন্নতি ঘটে। যুদ্ধোত্তর জার্মানির মার্কের অবমূল্যায়নের ফলে তাঁর মাইনে এক থাকলেও, মূল্যের দিকে সেটি আগের অর্থের এক-পঞ্চমাংশ। সেই সময়ে এই অর্থোপার্জন তাঁকে কোন কষ্ট পেতে দিল না। সহযোগী সহকর্মী অধ্যাপকরা অর্থাভাবে প্রয়োজনীয় বই পর্যন্ত যেখানে কিনতে পারছেন না, সেখানে আইনস্টাইনের সচ্ছলতা অনেকের কাছে ঈর্ষার। তাঁর সম্মান, অর্থপ্রাপ্তি, ইহুদি জাতীয়ত্ব সব নিয়ে আইনস্টাইন জার্মানির একাংশের আঘাতেরও টার্গেট। লেনার্ডকে নেতা করে এই দল যা কিছু আইনস্টাইনের বিশেষত্ব তারই সমালোচনা করেন। শেষে সমালোচনা কেন্দ্রীভূত হয় রিলেটিভিটি ভুল প্রমাণের চেষ্টায়। সাফল্যের রৌদ্রসুখের আমেজে আইনস্টাইন তখন মগ্ন, সেদিন এইসব সমালোচনার কাদা ছোঁড়াকে আক্ষরিক অর্থে অট্টহাস্যে উপেক্ষা করলেন; ওদিকে লেনার্ডরা একটি স্টাডিগ্রুপ করে সমালোচনার ব্যঙ্গ বাণ নিক্ষেপ করে চলেন। কিছুদিন পরে আইনস্টাইন দেখেন তাঁর তত্ত্বের সমালোচনা নয়, নিভৃতে গোপনে আরেকটি মনস্তত্ত্ব কাজ করছে, সেটি ইহুদি ঘৃণা। প্রচ্ছন্ন ঘৃণা ধীরে ধীরে আগ্রাসী 'গতিতে এগিয়ে চলেছে,

লেনার্ডের দল সেই ঘৃণার আগুনে সমিধ জুগিয়ে যাচ্ছেন—আইনস্টাইনকে আক্রমণ তার একটি দিকমাত্র—কারণ আইনস্টাইন সচ্ছল ইহুদিজাতির প্রতীক।

বিজ্ঞানী, কৃতী আইনস্টাইনকে নিজের বলে ঘোষণা করতে ইহুদিরা এগিয়ে এসেছে। আইনস্টাইন জাতে ইহুদি, তাঁর রিলেটিভিটি তত্ত্বের ইহুদি ধর্মীয় ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা হয়েছে—লেনার্ডের দলের মতে এও এক হাস্যকর প্রচেষ্টা। সেই ব্যাখ্যা দেখে আইনস্টাইন শিউরে উঠে বলেছেন, 'কি যাচ্ছেতাই!' ইংল্যাণ্ডের ইহুদিরা নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যে তাঁকে গ্রহণ করলেন একটি কবিতা দিয়ে,—আরেকজন ইহুদি বিখ্যাত ভাস্কর এপিস্টাইনের সঙ্গে যুক্ত করে :—

Einstein and Epstein are wonderful men,
Bringing new miracles into our kin,
Einstein upset the Newtonian rule ;
Epstein demolished the Pheidian school.
Einstein gave fits to Royal Society ;
Epstein delighted in loud notoriety.
Einstein made parallels meet in infinity ;
Epstein remodelled the form of divinity.

আইনস্টাইন এপস্টাইন দুজনা অদ্ভুত
আমাদের স্বজাতে ন ভবিষ্য ন ভূত!
আইনস্টাইন নিউটনের ভাঙলো নিয়ম ;
এপস্টাইনে চুরমার স্কুল ফীডিয়ন।
আইনস্টাইনে হতভম্ব রয়েল সোসাইটি ;
এপস্টাইনের কাজে রটে সুখ্যাতি-কুখ্যাতি!
আইনস্টাইনে সমান্তর অসীমেতে মেলে ;—
এপস্টাইনে দৈবীকর্ম নতুন করে তোলে!

ইহুদিদের এই উল্লাসের প্রকাশ একটি কবিতাতে একবারই শুধু হলো না। আরো ছড়া আইনস্টাইন এবং বিখ্যাত ইহুদিদের কেন্দ্র করে রচনা হলো। যেমন একটি :

Three wonderful People called Stein—
There's Gert and there's Ep and there's Ein.
Gert writes in-Blank Verse
Ep's Sculptures are worse
And nobody understands Ein!

ছিল তিন সেয়ানা নামেতে স্টাইন,
একে গার্ট, দুয়ে এপ, তিনেতে আইন।
গার্ট লেখে কবিতা—দুর্বোধ মিলছুট ;—
এপের ভাস্কর্য যতো বদখত কিম্ভুত!
আর কেহ নাহি বোঝেরে আইনের আইন!

কোন ধর্মের প্রতি আকর্ষণ আইনস্টাইনের ছিল না, এটি তিনি বাবার কাছ থেকে পেয়েছিলেন। ১৮৯৬ সালে নিজেকে নিরীশ্বর ধর্মহীন বলে প্রচার করতে চেয়েছিলেন। ঈশ্বর সম্পর্কে তাঁর ধারণা অজ্ঞেয়বাদীর ; ঈশ্বরে তাঁর প্রয়োজন নেই। অন্যদিকে এক মানবজাতীয়তত্ত্বে তাঁর বিশ্বাস। কোন গোষ্ঠী জাতীয়তাবাদে প্রচণ্ড বিতৃষ্ণা। প্রাগে অধ্যাপনার কালে, ধর্মের হুজ্জতি কাটাতে, নিজের কাজে মগ্ন থাকার জন্য, নিজেকে ইহুদি বলে ঘোষণা করেছিলেন। এখানেই ইহুদিদের হীন অবস্থা দেখে তাঁর কিছু সহানুভূতি জাগে, সহানুভূতি মানব জাতির একটি অবহেলিত ঘৃণিত অপমানিত একটি শ্রেণীর জন্য, যে শ্রেণী ইহুদি। জন্মসূত্রে যে তিনি ইহুদি, এই সত্য তাঁকে কোনদিন পীড়ন করেনি, উত্তেজিত করেনি। ইহুদি-সেমিটিকত্বের বিশেষত্ব তাঁর চেহারায়, আচার-আচরণে কোথাও ফুটে ওঠেনি। ইহুদিদের মৌখিক আইনকানুনের বিরাট সংকলন তালামুদের ব্যাখ্যায় অতিপ্রাকৃত অবাস্তবতা খুঁজে পান। ধর্মমতের ব্যাখ্যায় ১৯৩৪ সালে একবার বললেন,

"জুডাবাদ থেকে যদি তার পয়গম্বরদের ছাঁটাই করা যায়, আর যিশু প্রবর্তিত খ্রীষ্ট ধর্ম থেকে তার পরবর্তী প্রত্যেকটি সংযোজন—বিশেষত পুরোহিত সম্প্রদায়ের কারিগরি যদি বাদ দেওয়া হয়, তবে যে উপদেশাবলী থেকে যাবে, তা দিয়ে মানব সমাজের যাবতীয় রোগ মুক্ত করা যাবে।"

আর নিজস্ব ইহুদি আদর্শের বর্ণনায় সেই ১৯৩৪ সালে বললেন, "জ্ঞানের জন্য জ্ঞানের সাধনা, ন্যায় বিচারের প্রতি প্রায় অন্ধপ্রেম এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা—এই হলো ইহুদি ঐতিহ্যের ত্রিবিধ আধার।"

তাঁর ন্যায় বিচারের প্রতি প্রায় অন্ধপ্রেমের সুযোগ নিলেন, সেকালীন ইহুদি নেতা কুর্ট ব্লুমেনফেল্ড ও চাইম ওয়াইজমান। যুদ্ধের মাঝে বেলফুর ঘোষণায় প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের জন্য স্বতন্ত্র রাজ্য গঠন করা হয়েছে—বিজ্ঞানী ওয়াইজমান তাঁর পরিচালক। রাষ্ট্রের জন্য দরকার অর্থের ; সেই অর্থ সংগ্রহণ সহজ হয়, যদি আইনস্টাইনকে সঙ্গে পাওয়া যায়। লণ্ডনের প্যালাডিয়াম থিয়েটারের পরিচালকদের মত ইহুদি রাষ্ট্রনায়ক ওয়াইজমান আইনস্টাইনকে ব্যবহার করতে চাইলেন। ব্লুমেনফেল্ড এবং রোজেনব্লুথ (যিনি পরে ইহুদি রাষ্ট্রের বিচারমন্ত্রী হয়েছিলেন) এঁদের কাজ হলো আইনস্টাইনকে জপানো, জিওনিজম বা ইহুদি-জাতীয়তাবাদে তাঁকে দীক্ষিত করা। আইনস্টাইনের প্রথম দিকের উদাসীনতা এই দুই জনের অবিরাম প্রচেষ্টায় ভেঙে যায়। একদিন আইনস্টাইন বললেন,

'আমি কোন জাতীয়তা মানিনা, তবে জিওনিজমের সমর্থন করি। মানুষের দুটো হাত, তবু যদি সে ডান হাতের কথা শুধু বলে, তবে সে উৎকট স্বদেশ ভক্ত। যদি ডান হাতটি না থাকে, তবে সেই হারানো প্রত্যঙ্গটির জন্য মানুষকে আলাদা কিছু করতে হবে। সুতরাং মানুষ হিসেবে জাতীয়তাবাদের বিরোধী হলেও, ইহুদি হিসেবে আজ থেকে আমি ইহুদিদের জিওনিজমের সমর্থক।"

অবহেলিতদের জন্য তাঁর সমবেদনা সহজাত—তবু এই সোচ্চার জিওনিজমে সমর্থন ঘোষণা আইনস্টাইনের চরিত্রের পরিপন্থী, তাঁর প্রতিবেশের বিপরীত। তবু একবার এটিকে সমর্থন জানিয়ে ভদ্রলোকের মত আইনস্টাইন জিওনিজমকে খেলার নিয়মে মেনে

চললেন। বিজ্ঞানী হাবের স্বয়ং ইহুদি ; তিনি আইনস্টাইনের শুভানুধ্যায়ী ; তিনি তাঁকে ভিন্ন পরামর্শ দিলেন। পরামর্শ দিলেন অন্যান্য বন্ধুরা ; তাঁদের ধারণা, অন্য যেখানে যা ঘটে, ঘটতে পারে, জার্মানিতে জিওনিজম ইহুদিদের উপকারের বদলে অপকার করবে, জটিলতা বাড়াবে। যদি নিজস্ব জাতীয় রাষ্ট্র বা নেশনাল হোম গড়ে তোলার জন্য ইহুদিরা বেশী সচেষ্ট হয়, তবে যা ঘটবে তা হলো, জার্মানি থেকে ইহুদিদের বিতাড়ন। দক্ষিণপন্থী জার্মান জাতীয়তাবাদী দলগুলি, জিওনিজমের নেশনাল হোমের জিগিরিটি নিজেদের কাজে লাগাবে।

আইনস্টাইন কিছুটা দিশেহারা হন আর অন্যদিকে ব্লুমেনফেল্ড-এর চলে নিত্য কর্ণে মন্ত্র-জপন। মানুষকে দলে টানতে ব্লুমেনফেল্ডের অদ্ভুত সহজাত দক্ষতাটি চিনতে পেরে ওয়াইজমান তাঁকে আইনস্টাইনের কাছে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর শক্তির সমস্ত চমৎকারিত্ব তিনি আইনস্টাইনের উপর প্রয়োগ করলেন; অবশেষে ধৈর্য ও নিত্য চেষ্টার ফল পাওয়া যায় ; আইনস্টাইন প্যালেস্টাইনে একটি বিশ্ববিদ্যালয় গঠন করার জন্য অর্থ-সংগ্রহে রাজী হন। তাঁর এই প্রচেষ্টার কথা বর্ণনা করে ব্লুমেনফেল্ড পরে বলেছেন, "তাঁর মনোরাজ্যে নিরন্তর হানা দিয়ে আমি সফল হলাম। অবশেষে তাঁর ধারণা হলো বক্তব্যটি তাঁর মুখে জুগিয়ে দেওয়া হয়নি, তাঁর হৃদয় থেকে স্বতঃ উৎসারিত হয়েছে।" এককথায় ব্লুমেনফেল্ড আইনস্টাইনকে ব্রেনওয়াশড্ করতে পারলেন। পূর্ব ইউরোপের ইহুদিরা সাবাস জানিয়ে ব্লুমেনফেল্ডকে বললেন, "জিওনিজমের জন্য আপনি আইনস্টাইনকে এনে দিলেন।"

এবং বন্ধুরা যা ভেবেছিলেন তাই হলো। ইহুদিদের দিকে আইনস্টাইনের ঝোঁকটিকে দক্ষিণপন্থী জার্মান জাতীয়তাবাদীরা ভালো চোখে দেখেন না। তাঁর জীবন তারা দুর্বিষহ করে তোলে। লেনার্ডের স্টাডিগ্রুপের একাগ্রীবান আইনস্টাইনকে নিশানা করে ছোঁড়া হচ্ছে আর আছে জার্মান জাতীয়তাবাদীদের ঘৃণ্য সমালোচনা ও আঘাত—সব মিলিয়ে এক অসহ অবস্থার শিকার হয়ে দাঁড়ান আইনস্টাইন। এই সময়ে প্রায় ভারসাম্যবোধ হারিয়ে একটি হঠকারী কাজ করে বসেন। Berliner Tageblatt পত্রিকার বিজ্ঞাপন কলমে তিনি একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করলেন, "এন্টি-রিলেটিভিটি কোম্পানি লিমিটেডের প্রতি আমার জবাব।"

প্রত্যুত্তর হিসেবে বই প্রকাশ করা হয়েছে, গেলিলিও করেছেন, করেছেন রাজা রামমোহন ও বিদ্যাসাগর। কিন্তু একটি সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনের কলমের মাধ্যমে উত্তর প্রকাশে যে অশালীনতা আছে সেটি দেখে আইনস্টাইনের শুভানুধ্যায়ীরা হতচকিত হয়ে ওঠেন। এরনফেস্ট, ফন লাউএ, সমারফেল্ড এঁরা আইনস্টাইনের এই বাড়াবাড়ির নিন্দে করেন। আবার নার্নস্ট, রুবেন্স বোঝেন, কত দুঃখে, অপমানে আইনস্টাইন প্রতিরোধের এই পদ্ধতি বেছে

নিয়েছেন। ঐ একই পত্রিকায় আইনস্টাইনের থিয়োরি অব রিলেটিভিটির সমর্থনে শুভানুধ্যায়ী জার্মান বিজ্ঞানীরা একটি পত্র প্রকাশ করেন। সমারফেল্ড আইনস্টাইনকে লেখেন, যা ঘটে ঘটুক, তিনি যেন জার্মানি ছেড়ে না যান। নিজের জমিতে দাঁড়িয়ে আইনস্টাইন লেনার্ডের মোকাবিলা করুন, তাঁর বন্ধুরা তাঁর সঙ্গে আছে।

চিঠিটি লেখার আগে সমারফেল্ড প্লাঙ্কের সঙ্গে দেখা করেন। প্লাঙ্ক, বিজ্ঞানী প্লাঙ্ক, জার্মানিকে ভালবাসেন, স্নেহ করেন আইনস্টাইনকে। আইনস্টাইনের অভিমানের সূচনা তিনি দেখেন; তাঁর ভয়-অভিমানে আইনস্টাইন জার্মানি ছেড়ে যাবেন।

আইস্টাইনের সেই চিন্তা; সম্মানের বহুধা প্রকাশকালে, লেনার্ডের দলের অহেতুক আঘাতে অভিমানে জার্মানি ছেড়ে চলে যেতে চান। হলাণ্ড বা ইংলনডে একটা পছন্দসই কাজ পাওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয়। অন্য দিকে প্লাঙ্ক জানেন, আইনস্টাইন জার্মানিতে থাকলে, জার্মানির পক্ষে স্বাভাবিকতা ফিরে পাবার সম্ভাবনা বেশী। বিদেশীদের জঙ্গী মনোভাব পাল্টাবে, অজার্মান বিদগ্ধজনের সহনশীলতায় জার্মানির মর্যাদা ফিরে আসবে—সব কিছু ঘটতে পারে একজনের চেষ্টায়, তিনি আইনস্টাইন। ব্লুমেনফেল্ড-এর মত তিনিও আইনস্টাইনকে চান, তবে প্লাঙ্ক তাঁর সম্মানে আঘাত দিয়ে ব্রেনওয়াশর্ড করতে চান না, চান না তার বিচারবুদ্ধিকে কলুষিত করতে। প্লাঙ্ক চান না আইনস্টাইন জার্মানি ছেড়ে যান। আইনস্টাইনের জার্মানিতে স্থিতি ও উপস্থিতিতে, তাঁর সমবেদনার সংবেদে জার্মানির মঙ্গল হবে।

১৯২০ সালে জার্মানি ছাড়া বা না-ছাড়ার দোটানায় পড়লেন আইনস্টাইন। তাঁর ইনট্যুশন বড় বিপদের ইঙ্গিত জানাচ্ছে, যদিও তার প্রমাণ হাতের কাছে নেই। লেইডনে লরেন্সের সহায়তায় কাজ তিনি পাবেন—সেখানে আছে এরনফেস্ট-এর সাহচর্য, আর নীয়েল বোরের নৈকট্য; কোপেনহেগেন লেইডনের থেকে দূর নয়। আবার প্যারিস বা ইংলণ্ডের বিজ্ঞান-সমাজের সান্নিধ্য—সে তো উপরি পাওনা। ইংলণ্ডে লিণ্ডামান তাঁকে কেম্ব্রিজে আনার চেষ্টা করেন। বার্লিনের পত্রিকার ঘটনাটির পর স্বয়ং সার জেমস জিনস কেভেণ্ডিস লেবরেটরির অধ্যক্ষ রাদারফোর্ডের কাছে তাঁর কাজের সুপারিশ করেন; রাদারফোর্ড অবশ্য হাঁ বা না, কোন উচ্চবাচ্য করেন না। সুইজারল্যাণ্ডে জুরিখে আইনস্টাইনের ঢালাও আমন্ত্রণ। অপমানের জালা ভুলতে তিনি কি বাইরে যাবেন? অথবা তিনি কি জার্মানিতে থাকবেন তাঁর বন্ধুদের দুঃসময়ের পাশে, যাঁরা তাঁর কাজের প্রচেষ্টায় সামিল, তাঁকে দিয়েছে আর্থিক ও মানসিক শান্তি, নির্বিঘ্নে চিন্তা করার বিলাসিতা এবং বুদ্ধি ও যুক্তিকে শানিত করার জন্য পরিমণ্ডল? এই দ্বিধা সংশয়ের হেমলেটীয় কালে প্লাঙ্কের সঙ্গে জার্মানির শিক্ষামন্ত্রী হীনিখ এগিয়ে এলেন আইস্টাইনের হৃত সম্মান ফিরিয়ে আনতে, তাঁর অভিমান দূর করতে, তাঁকে জার্মানিতে রাখতে।

২৫শে সেপ্টেম্বর বাড নৌহীম শহরে এন্টি-রিলেটিভিটি সভা-কক্ষে যোগ দিল জঙ্গী Nahur-

foscher Gesellschoft দলের সভ্যরা। বস্তুত এই দক্ষিণপন্থী জাতীয়তাবাদী দলটি বিশেষ করে লেনার্ডের আক্রমণের মদত জুগিয়ে যাচ্ছে। বাড নৌহীম ফ্রাঙ্কফুর্ট শহর থেকে ৩০।৩২ কিলোমিটার দূরে ও মাক্সবোর্ন সেই শহরে অধ্যাপনা করেন। সেই শহরের মিটিং-এ যোগ দিতে এলেন, আইনস্টাইনের পক্ষের বিজ্ঞানীরা, প্লাঙ্ক, এরনহেফেট, মাক্স বোর্ন, অন্যান্যরা এবং স্বয়ং আইনস্টাইন ; অন্যদিকে যুযুধান লেনার্ডকে নায়ক করে হাজির এন্টি-রিলেটিভিটি দলের বিজ্ঞানীরা আর কয়েকশ মাস্তান, যাদের কাজ সভায় হট্টগোল করা, চিৎকার করা, বাধা দেওয়া। সভার সভাপতি বৃদ্ধ ও সর্বজনশ্রদ্ধেয় পিতামহ ভীষ্মের মত প্লাঙ্ক ; বিষয় রিলেটিভিটি। লেনার্ড তাঁর বক্তব্য রাখলেন ; প্রত্যুত্তর দিতে উঠলেন আইনস্টাইন ; ভিতরে যতই উত্তেজনা থাক বাইরে তিনি শান্ত, তবে তাঁর শান্ত ভাব মাস্তানদের বাধায় টিটকারিতে চিৎকারে টিঁকে থাকে না। প্রায় অস্থির হয়ে তিনি বিরূপ মন্তব্য করেন, তাতে গোলমাল আরও বেড়ে যায়। বৃদ্ধ প্লাঙ্ক তাঁর যথাসাধ্য শক্তি দিয়ে সভায় জার্মান বনেদী মর্যাদা বজায় রাখার চেষ্টা করেন। উত্তেজনার মধ্যে লেনার্ড আবার উঠলেন—আইনস্টাইনের বক্তব্যের উত্তর দিতে ; বললেন, "যে মহাকর্ষক্ষেত্রের কথা শুনলাম তার পরীক্ষায় কোন তথ্যের উদাহরণ করা হলো না, কারণ উদাহরণ নেই।" স্বভাবতই উদাহরণ হিসেবে বৃটিশ-বিজ্ঞানীদের পরীক্ষার কথা বলা যেত। লেনার্ডের বক্তব্যের জবাবে আইনস্টাইন সেই উদাহরণ দিলেন না। অত্যন্ত সংযত ভাষায় তিনি যে উত্তর দিলেন সেটি নব-বিজ্ঞানের মূলকথা। তিনি বললেন,

"লোকে যাকে ভাবে সম্ভব, স্বাভাবিক, আর যাকে ভাবতো অসম্ভব, অস্বাভাবিক, আমি মনে করি সেই ধারণার পরিবর্তন ঘটে। স্বাভাবিকত্বের ধারণা সময়ের নিরিখে বিচার করা হবে। ফিজিক্স কিছুটা বিমূর্ত এবং হয়তো বা অস্বাভাবিক, এ আমার বিশ্বাস। এই পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গীতে কোনটা স্পষ্ট আর কোনটা স্পষ্ট নয়, সেটি সম্যক বুঝতে হলে, আমার অনুরোধ, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানীরা গেলিলিওর মেকানিক্সের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, সেই সব ব্যাখ্যার বিবিধ সুস্পষ্ট সঙ্গতিটুকু আলোচনা করে দেখুন।"

আলোচনা চলে, আইনস্টাইন তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে বন্ধুদের উঠে দাঁড়াতে দেখেন। মাক্স-বোর্ন বিপক্ষ দলকে যুক্তিতর্কে বিপর্যস্ত করেন। এক সময় প্লাঙ্ক দেখেন সভার সময় শেষ। সভার বিরতি ঘোষণার সময় প্লাঙ্ক অইেনস্টাইনকে প্রচ্ছন্ন সমর্থন করে বললেন,

"সভার জন্য নির্দিষ্ট সময়টিকে পরম কাল পর্যন্ত বাড়াবার পদ্ধতি যখন আপেক্ষিকতাবাদ জানায় না, তখন আমাদের সভা এখানেই শেষ হলো।"

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের উদ্যোগ শেষ হলো। বিপদের সময় তাঁর পাশে বন্ধুদের দাঁড়াতে দেখলেন আইনস্টাইন ; জানলেন, তিনি জার্মানিতে একা নন, বিচ্ছিন্ন নন। তিনি বন্ধুদের কাছে জার্মানিতেই থাকবেন। মিনিস্টার হীনিশকে জানালেন, "বিজ্ঞান আর মানবতার বাঁধনে আমি বার্লিনে বাঁধা ; সব বুদ্ধিজীবী প্রগতিশীল মানুষের আজ একটাই কাজ —জার্মান রিপাবলিকের সম্মান বাড়িয়ে তোলা !"

১৯২০ সালে ঘরে বাইরে দেশে বিদেশে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছেন আইনস্টাইন। সর্বত্র তিনি জার্মান বিজ্ঞানী। এ সময়ে জুলাই মাসে পয়লা তারিখে জার্মানির নতুন ভাইমার সরকারের আনুগত্যের শপথ নেন। ন' মাস পরে প্রাশীয় সংবিধানের আনুগত্যের শপথ। সুইস নাগরিক এলবার্ট আইনস্টাইন নব-জার্মানির সংবিধানের সমর্থক এবং তিনি জার্মান নাগরিক।

এই সময়ে একটা ছোট্ট ঘটনা ঘটে। উত্তর জার্মানির উলম শহরে যেখানে এলবার্ট আইনস্টাইনের জন্ম, সেখানকার কিছু অধিবাসী আইনস্টাইনের সম্মানে নিজেদের সম্মানিত বোধ করেন। ঠিক হয়, আইনস্টাইনকে উলম শহরের স্বাধীন নাগরিক করা হবে। নগর-পিতারা আইনস্টাইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানলেন, নিউটনের পর এতবড় আবিষ্কর্তা আর জন্মায়নি। নগর-পিতারা অনেক বিবেচনা করে আইনস্টাইনকে একটা চিঠি দেন; স্বাধীন নাগরিকত্বের ঘোষণা সেই চিঠিতে নেই, আছে সাধারণ অভিনন্দন জ্ঞাপন। আইনস্টাইন ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি দেন—সে চিঠি নগর সভায় পড়া হয়। ১৯১৯ সালের মার্চ-এপ্রিলের এই ঘটনা। তিনবছর পর আইনস্টাইন নোবেল প্রাইজ পেলে উলম শহরের শান্ত পরিবেশে আরেকবার আলোড়ন ওঠে, নগর-কর্তারা নগরের সীমান্তে দরিদ্র অঞ্চলে একটি নগণ্য রাস্তার নামকরণ করেন আইনস্টাইনের নামে। হিটলারের অভ্যুত্থানের সময় যখন আইনস্টাইন জার্মানি থেকে বিতাড়িত হলেন, এই রাস্তার নাম আরেকবার পরিবর্তিত হয়, আইনস্টাইনের নাম মুছে দেওয়া হয়। ১৯৪৯ সালে উলম শহরের অধিবাসীরা সহসা তাঁকে স্বাধীন নাগরিকত্ব দিতে চান,—এইবার আইনস্টাইন প্রত্যাখ্যান করেন। উলম শহরের যে বাড়ীতে তিনি জন্মেছিলেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিমান হামলায় বাড়ীটি ধ্বংস হয়। জন্মস্থান উলম শহরে আইনস্টাইনের কোন স্মৃতি তাঁর জীবিতকালে রইল না।

১৯২১ সালে রয়েল সোসাইটির বিদেশী ফেলো হলেন আইনস্টাইন; ইতিমধ্যে প্রাগ আর ভিয়েনা ঘুরে এসেছেন। প্রাগের জার্মানরা তাঁকে জার্মান ভেবে আনন্দিত আর সুদাতনের লোকেরা তাঁকে সুদাতনী জার্মান ঘোষণা করে গর্বিত। আইনস্টাইনকে দলে পাওয়া ভারি সম্মানের।

ইতিমধ্যে জিওনিজম-এর পতাকাবাহী ওয়াইজমান—ব্লুমেনফেল্ড আইনস্টাইনকে দলে টানতে পেরেছেন—ভিয়েনা থেকে ফিরে এসে হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহের প্রোপাগাণ্ডা অভিযানে ওয়াইজমানের সঙ্গে ইউ এস এ যেতে তিনি সম্মত হলেন—ওয়াইজমানের জালে আইনস্টাইন নামক পাখিটি ধরা পড়ল।

ওদিকে ইংলণ্ডের ম্যাঞ্চেস্টার ইউনিভার্সিটি থেকে এডামসন বক্তৃতা দিতে তিনি আমন্ত্রিত হলেন। আইনস্টাইন শুধু একটি শর্তে রাজি হলেন, তিনি জার্মান ভাষায় বক্তৃতা দিবেন আর ইংলণ্ডে আসবেন যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণের পর। ম্যাঞ্চেস্টারে আসবেন শুনে অন্য বিশ্ব-

বিদ্যালয়গুলিও আমন্ত্রণ জানায় ; আমন্ত্রণ আসে অক্সফোর্ড থেকে, লণ্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে। নিজেকে কেউকেটা মনে হয়, প্রতিষ্ঠার সুখ-সম্মান দু হাত ভরে তুলে দেবার অপেক্ষাতে যেন সাজিয়ে রাখা হয়েছে। আত্মকেন্দ্রিক একাগ্র বিজ্ঞানবিলাসী সাধকটি বাইরের জগতের মানুষের মিছিলের সামনে দাঁড়াতে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে গেলেন।

২২শে মার্চ ১৯২১ সালে বার্লিন ছেড়ে হল্যাণ্ডে এলেন যুক্তরাষ্ট্রগামী জাহাজে উঠতে, সঙ্গে মিসেস আইনস্টাইন। জাহাজে ভারি হাসিখুশি মেজাজে আছেন তিনি ; মিসেস ওয়াইজমানের সঙ্গে একটু ফ্লার্ট নকশা করছেন ; এলসার তাতে আপত্তি নেই। এলসা বলেন, "বুদ্ধিমতী মেয়েরা ওঁকে পাত্তা দেন না—কাজে কাজে যে সব মেয়েরা কায়িক পরিশ্রম করেন তাদের কাছে এঁর আকর্ষণ।" যাত্রাটা ভাল কাটে। নিউইয়র্ক বন্দরে এসে আইনস্টাইন আমেরিকার প্রথম অভ্যর্থনা পেলেন। শহরের মেয়র, সিটি-কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট, ক্যামেরামান, রিপোর্টার, অভ্যর্থনা কমিটি, সব মিলিয়ে হই হই ব্যাপার। সব কিছু চুকে বুকে গেলে আইনস্টাইন রিপোর্টারদের দিকে ফিরে বললেন, 'বেশ ব্যালে নাচের প্রধান নর্তকীর মত লাগছে।'—আর তারপর এল সেই অবধারিত প্রশ্ন ; রিপোর্টাররা জিজ্ঞেস করেন, কম কথায় রিলেটিভিটি তত্ত্ব বুঝিয়ে বলুন তো ? আইনস্টাইন এক অসাধারণ তুলনারহিত উত্তর দিলেন,

> "আমার উত্তরটাকে যদি হাল্কা ভাবে নেন খুব একটা সিরিয়াসলি না ভাবেন, তবে বলি—আগে ভাবা হতো সব বস্তু অদৃশ্য হলেও দেশ আর কাল থাকে ; আর আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্বে বস্তু অদৃশ্য হলে দেশ ও কালের স্থিতি নেই, তারাও অদৃশ্য।"

প্রথম উত্তরেই আইনস্টাইন আমেরিকার রিপোর্টারদের মুগ্ধ করলেন। বাকি সব প্রশ্নের উত্তর সপ্রতিভভাবে দিয়ে একগাল হেসে আইনস্টাইন রিপোর্টারদের জিজ্ঞেস করেন, "কি মনে হয়, পাস করলাম তো ?" এলসাও রিপোর্টারদের জয় করে নিলেন। একজন তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি আইনস্টাইনের তত্ত্ব বোঝেন ? এলসার সাফ জবাব, "একদম না ; অনেকবার তিনি ওসব আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন—তবে সত্যি কি জানেন, আমার সুখের জন্য এসব না জানলেও চলে। আসলে এলবার্ট একটা রঙচঙে পুতুল নয়। ও ভালবাসে কাজ করতে, বেহালা বাজাতে আর বন-উপবনে ঘুরে বেড়াতে। আর যখন সমস্যার সমাধানে মাতে তখন দিন রাত্তিরের বোধ থাকে না।"

আমেরিকায় আইনস্টাইনের পদার্পণ, একজন অধ্যাপকের খোলসে মোড়া রসিক লোক। এ ধরনের রহস্যময় রসিক লোক আমেরিকানদের পছন্দ—আর আইনস্টাইন সম্পর্কে লেখাটেখা পড়ে তাদের ধারণাও তাই। সেই চিহ্নিত আইনস্টাইনের ভূমিকার খাঁটি আইনস্টাইন বেশ খাপ খেয়ে গেলেন ; তাঁর তত্ত্বের মত আসল মানুষটিও খানিকটা রহস্যময়, অদ্ভুত।

ওয়াইজমানদের সঙ্গে আইনস্টাইন অর্থসংগ্রহের অভিযানে নামেন। টাকা পয়সা যতটা

পাওয়া যাবে ভাবা যায়,তার অংশ মাত্র সংগ্রহ হয় না—অন্য দিকে যাঁরা টাকা পরে দিবেন বলে প্রতিশ্রুত হন, সেই হবু দাতারা তাঁদের অঙ্গীকারের কথা বেমালুম ভুলে যান।
যুক্তরাষ্ট্রে কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে আগের বছর বার্নাড মেডেল তাঁকে দেওয়া হয়েছিল ; সেটি গ্রহণ করতে তিনি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যান, সেখানে রিলেটিভিটি তত্ত্বের উপর বক্তৃতা দেন। ওয়াশিংটনে প্রেসিডেণ্ট হার্ডিং-এর সঙ্গে দেখা হয়। আর তারপর মে মাসের ৯ তারিখে প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে যান। এখানে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম সম্মানিত ডক্টরেট ডিগ্রি পেলেন। প্রিন্সটনে একটি আলোচনা সভায় তিনি একটি বাক্য ব্যবহার করেন—যে কথাটি প্রিন্সটনের মূলমন্ত্র হয়ে ভবিষ্যতে দাঁড়ায়। সত্যের নিত্যতা বোঝাতে আইনস্টাইন বলেন, "ঈশ্বর সূক্ষ্ম তবে তিনি বিদ্বেষপরায়ণ নন (Raffinirt ist der Herrgot aber boshaft ist en nicht)।" প্রিন্সটন থেকে এলেন শিকাগো - সেখানে মিলিক্যানের সঙ্গে দেখা হলো।
যুক্তরাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা ভালমন্দে মেশানো। হিব্রুবিশ্ববিদ্যালযের জন্য টাকা জোগাড় হলো না—অন্যদিকে আমেরিকার বিজ্ঞানীদের সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনায় দুপক্ষের লাভ। যুক্তরাষ্ট্রে আইনস্টাইন রিপোর্টারদের সঙ্গে কথা বলার সময় সাবধান হতে শিখলেন। তাঁর কথাবার্তায় দার্শনিকের ছাপ দেখা যায় ; দেখা যায় দীর্ঘ মননের চিন্তার পর গড়ে ওঠা প্রত্যয়ের প্রকাশ ভাষাতে! নেশনাল একাদমিতে বললেন,

"বহু বছর চেষ্টার পর কোন মানুষ যদি হঠাৎ রহস্যময় বিশ্বলোকের সৌন্দর্যের কিছু অংশ আবিষ্কারের ধারণা করে উঠতে পারেন তবে তাঁর ব্যক্তিগত পুরস্কারের আর দরকার নেই ; খোঁজা আর পাওয়া, এর অভিজ্ঞতাতেই তো পরম প্রাপ্তি।"

সংবাদপত্রগুলি তাঁর বক্তব্যের মহত্ত্বটুকু তুলে ধরার চেয়ে তাঁর রঙ্গরসিকতা, ব্যঙ্গ পরিহাস বেশী প্রকাশ করেন। বোস্টনে এক ধাঁধার প্রতিযোগিতায় আইনস্টাইন শব্দের গতি কত বলতে পারেন না—আইনস্টাইনের সাফ জবাব, রেফারেন্স বই খুলে এর উত্তর যখন দেখে নেওয়া যাবে, তখন এসব মনে রেখে লাভ কি ?
নেশনাল একাদমি অফ সায়েন্সের বার্ষিক ডিনারে আইনস্টাইনের নিমন্ত্রণ। সে ডিনার-সভায় একের পর এক বক্তা বক্তৃতা দিয়ে চলেছেন, একের পর এক বিজ্ঞানী পুরস্কার নিয়ে চলেছেন, বক্তৃতা ও পুরস্কার গ্রহণের অনন্ত প্রবাহ যেন। আইনস্টাইন তাঁর প্রতিবেশী নেদারল্যাণ্ডের এমবাসী সেক্রেটারিকে চুপিচুপি বললেন, "একটা নতুনতত্ত্ব এইমাত্র আবিষ্কার করে ফেলেছি—চিরকালের অসীমতার তত্ত্ব !"
বক্তৃতার বাড়াবাড়িতে তাঁর বিরক্তি ও অস্বস্তি হাবভাবে কথায় বার্তায় প্রকাশ করে ফেলতেন। ওয়াইজমান সভা-সমিতিতে সভ্য-ভদ্র হয়ে চুপচাপ বসে থাকতে অনেকবার অনুরোধ করেছিলেন। আইনস্টাইনও অনুরোধ মানতে চাইতেন। সভার প্রথমদিকে তিনি বেশ চুপচাপ ; যত সভা চলে, সময় কাটে, ততই তার ছটফটানি বাড়ে। মেডিসন

স্কোয়ার গার্ডেনের একসভায় বক্তাদের গলা কাঁপানো অভিনয়ের ভঙ্গী শুনে, বেশ সজোরে চলচিত্তচঞ্চরীর ভবতুলালী কায়দায় বলে বসলেন, 'একেবারে গাধা !'

যুক্তরাষ্ট্রের জনসাধারণ সম্পর্কে হুম করে কথা বলেন, মনের ভাব ঢাকতে পারেন না ; অন্যদিকে কোনটা যে তিনি রসিকতা করছেন, কোনখানে তিনি সিরিয়স, শ্রোতারা সব সময় বুঝে উঠতে পারে না। বললেন, এমেরিকানরা স্বভাবত এন্টি-জার্মান, বড় খরচে ইত্যাদি। এ সব কথা বলার জন্য পরে মনস্তাপে ভোগেন। NEW YORK TIMES-এ আইনস্টাইনের বক্তব্য বলে সাংবাদিকরা একটি লেখা প্রকাশ করেন। আইনস্টাইন নাকি বলেছিলেন, আমেরিকার পুরুষরা কঠিন পরিশ্রম করেন আর তাদের উপার্জিত টাকাটা আমেরিকান নারীরা অহেতুক, অন্তহীন উপায়ে খরচ করে নিজেদের অপব্যয়ের কুয়াশায় জড়িয়ে রাখেন। আমেরিকার পুরুষরা তাদের নারীদের পোষা কুকুর (Lap dog)। আইনস্টাইন ল্যাপডগ শব্দটি অবশ্য ব্যবহার করেনি, বলেছিলেন খেলার পুতুল (Toy dog)। মূল জার্মান শব্দের অনুবাদে অর্থান্তর ঘটে যায়। আমেরিকার পুরুষদের সম্মানে আঘাত লাগে—বিস্ফোরক অবস্থার সৃষ্টি হয়।

সাক্ষ্যাৎকারের ঝামেলা, সংবাদিকের কলমের খোঁচা সব সময়ে মধুর নয়। রেখে ঢেকে কথা বলতে পারেন না, মজা করতে গেলে ভুল বোঝাবুঝি ঘটে, ঝামেলা ঝঞ্ঝাটের সৃষ্টি হয়, এ এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। আমেরিকার এই অভিজ্ঞতার পর সংবাদ পত্রের রিপোটার-দের এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করেন। স্ত্রী এলসা স্বামীকে সামলে আড়ালে রাখতে চান। আইনস্টাইন নিজেই পারত পক্ষে একা সাংবাদিকদের সঙ্গে দেখা করতে চান না। বিচিত্র পরিস্থিতি।

প্রসঙ্গত ১৯৩৪ সালে এই ইন্টারভিউ নিয়ে আইনস্টাইন একটি হাল্কা লেখা লেখেন ; তার কিছুটা অংশ :

"রসিকতা করে বা উচ্ছ্বাসের মাত্রাধিক্য হওয়ায় অথবা সাময়িক উষ্মার বশে মানুষ যা কিছু বলে থাকে তা শেষ অবধি মারাত্মক মনে হলেও তার প্রতিটি শব্দের জন্য জবাবদিহি করা তার কাছে হয়তো বা যুক্তিযুক্ত স্বাভাবিক। কিন্তু একজনের নামে অন্যে কে কি বলেছে তার জন্য প্রকাশ্যে তার কাছে কৈফিয়ত চাওয়া নিঃসন্দেহে এক অস্বস্তিকর ব্যাপার। আপনারা জিজ্ঞেস করতে পারেন, কার আবার এমন দুর্ভাগ্য হলো ? তবে শুনুন। জনসাধারণ যার প্রতি আগ্রহী তার পেছনে সাক্ষাৎকারপ্রার্থীদল ধাওয়া করেন, আর তার কপালেই জোটে বিড়ম্বনা। আপনারা অবিশ্বাসের হাসি হাসছেন ; হাসুন। আমার কিন্তু এ সম্বন্ধে বেশ বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে ; বলছি শুনুন।......একদিন সকালে জনৈক সাংবাদিক বেশ বন্ধুভাবে আপনার পরিচিতি সুহৃৎ 'ক' সম্পর্কে আপনাকে কিছু বলতে অনুরোধ করলেন......আপনার পরিত্রাণের উপায় নেই। কিছু বলতে অস্বীকার করলে সেই ভদ্রলোক লিখবেন,—'ক' বাবুর এক অন্তরঙ্গ বন্ধুকে তার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম তিনি চতুরতার সঙ্গে আমার প্রশ্ন এড়িয়ে গেলেন'। এর থেকে অনিবার্য সিদ্ধান্ত পাঠকরা করতে পারেন।......আপনি বললেন, ক বাবু বেশ হাসি খুশি লোক, ঘোরপ্যাঁচ জানেন না, বন্ধুরা তাকে বেশ পছন্দ করেন। সব অবস্থার ভাল দিকটা তার নজরে পড়ে। তার উৎসাহ আর উদ্যম অপরিসীম। নিজের কাজ নিয়ে মগ্ন থাকেন। আবার তার পরিবারের উপর টান বেশ, উপার্জনের সব টাকাটাই স্ত্রীর হাতে তুলে দেন।—এবার দেখুন রিপোর্টারের কলমের কেরামতি ; 'ক' বাবু সবকিছুই হাল্কা ভাবে নেন ;

চেষ্টা চরিত্র করে লোকের চোখে পড়ার স্বভাব আর মেশার ক্ষমতা আছে বলে সকলের সঙ্গে ভাব জমান। কাজের কাছে তিনি নিজেকে বিকিয়ে দিয়ে আছেন. তার বাইরে সর্বজনীন বিষয় বা বৌদ্ধিক কারবার নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় তার নেই। স্ত্রীর মাথাটি তিনি অবিশ্রান্তভাবে খাচ্ছেন, আর একেবারে তার হাতের আঙুলের ইঙ্গিতে নাচছেন।······পরের দিন কাগজে আপনার বন্ধু এই মন্তব্যটি এবং আরো অতিরিক্ত কিছু পড়লেন। যতই উদার দিলদরিয়া তিনি হন না কেন এরপর আপনার বিরুদ্ধে তার আক্রোশের সীমা রইবে না। অন্যদিকে বন্ধুর ক্ষতি করার জন্য আপনার অকথ্য মানসিক যন্ত্রণা হচ্ছে—বিশেষত আপনি যখন সত্যি তার অনুরক্ত !······বলুন তো, মশাই, এরপর কি করা যাবে ? যদি জানেন তবে শিগগির জানান, আমি তা হলে আপনাদের পদ্ধতিটা গ্রহণ করব !"

ওয়াইজমানের কাছ থেকে গ্রহণযোগ্য কোন পদ্ধতি পাওয়া যায় না। অন্য দিকে ঢেকে কথা বলতে শেখেন নি ; কথা বলতেও অবশ্য হয়। ইংলণ্ডে যাবার পথে সেই এক অশান্তি। ১৯২১ সালের মার্চ মাসের শেষাশেষি ইংলণ্ড রওনা দিলেন। ইতিমধ্যে ইংলণ্ডে তার দোভাষী আর সহযোগী হিসাবে ফ্রয়েনড্লিশ থাকবেন এই ইচ্ছা লিণ্ডারমানকে জানিয়েছিলেন। ফ্রয়েনড্লিশ আধা জার্মান আধা স্কচ, তিনি থাকবেন ম্যানচেস্টারে তাঁর মাসীর কাছে—শুধু যাতায়াতের সরকারী ব্যবস্থা আর খরচাপাতি পেলেই চলবে। অন্যদিকে ফ্রয়েনড্লিশকে কাছে পেলে আইনস্টাইনের স্বস্তি বাড়ে। লিণ্ডারমান আইনস্টাইনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভাবেন, সুবিধা অসুবিধা বোঝেন, তাঁরই চেষ্টায় ফরেন সেক্রেটারি লর্ড কার্জন ফ্রয়েনড্লিশের ভিসা ইত্যাদির বন্দোবস্ত করে দেন। সুইস পাশপোর্টধারী আইনস্টাইনের অনুরোধে যুদ্ধজয়ী ইংলণ্ড পরাজিত জার্মান বিজ্ঞানীর ইংলণ্ড ভ্রমণের সুযোগ করে দিলেন।

৮ই জুন লিভারপুল বন্দরে সস্ত্রীক নেমে ফ্রয়েনড্লিশকে দেখে তিনি ভারি আশ্বস্ত হলেন। তিনমাস দীর্ঘ টুরের পর একজন পরিচিত জনকে দেখা কত যে আনন্দের, কত স্বস্তির! পরদিন সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইহুদি ছাত্রদের সংস্থার কাছে হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য আবেদন জানালেন। পরে মাঞ্চেস্টারের বিশ্ববিদ্যালয়ের মেন হলে রিলেটিভিটির উপর জার্মান ভাষায় তাঁর বিখ্যাত ভাষণ দিলেন—সহযোগিতা ও ভাষান্তর করলেন ফ্রয়েনড্লিশ। তাঁর বক্তব্যের যুক্তির অনুক্রমের গঠন, প্রয়োগে মনোহারিত্ব, প্রকাশের কল্পনা আর সবার উপর সুকঠিন তত্ত্বের ব্যাখ্যার সময় তাঁর সাবলীল ভঙ্গী, তাঁর চোখ-মুখের হাসি—সব মিলিয়ে আইনস্টাইন শ্রোতাদের আপনজন হয়ে উঠলেন। কঠিন রিলেটিভিটি তত্ত্ব উপস্থিত শ্রোতাদের সকলেই যে বুঝতে পারে, তা হয়তো নয়,—তবে বক্তার নৈকট্যের উষ্ণতা সকলেই উপভোগ করেন।

বিজ্ঞানে তাঁর সহজাত অধিকার ; বিজ্ঞানের বক্তব্য সহজ ভাষায় সুন্দর উপমায়, প্রচ্ছন্ন চতুরতায় বলতে পারেন। তাঁর বাচন ভঙ্গী, নড়াচড়া, হাত মুখ চোখের ভঙ্গী বক্তা-শ্রোতা, শিক্ষক ছাত্রদের বাধা ভেঙ্গে তাঁকে শ্রোতাদের কাছের মানুষ করে তোলে। এই আইনস্টাইন বিজ্ঞানী আইনস্টাইন, বিজ্ঞান-বক্তা আইনস্টাইন—সেখানে তিনি রসিকতা

বা মজা করে কিছু বললেও রসজ্ঞ মর্মজ্ঞ শ্রোতারা বক্তব্যের অন্তর্নিহিত রসটুকু আস্বাদন করতে পারেন, অতিরিক্ত খোসা আঁটি ইত্যাদি ছুঁড়ে ফেলতে পারেন। বিজ্ঞান-জগতের সর্বজনীন মানসে তাঁর আচার-আচরণ স্বাভাবিক, বক্তব্য সাবলীল। এখানে তিনি কিংবদন্তী বা প্রবচনের মানুষ নন, তিনি বিজ্ঞানী, বিজ্ঞানবিলাসী।

প্রথম বক্তৃতার ফলাফল সুদূরপ্রসারী হলো। যুদ্ধোত্তর জগতের সন্দেহ আর ঘৃণার পর্দা সরিয়ে ইংলণ্ডের বিজ্ঞান-জগৎ জার্মান আইনস্টাইনকে সাদরে বরণ করে নিল। তাঁর মধুর ব্যক্তিত্বের মধ্য দিয়ে প্রাচীন জার্মানির সংস্কৃতির ইতিহাস স্মৃতি পথে ভেসে আসে। জার্মানি শুধু যুদ্ধবাজ নয়, প্রাশিয়ান-জার্মানরা সংস্কৃতবান ; গ্যেটে, হাইনে, শিলার এবং মোৎসার্ট, বিটোফেন এবং স্ট্রাউসের দেশ ; এছাড়া তাদেরও আছে হার্টৎস, প্লাঙ্ক, লেভিসিভেটার মত বিজ্ঞানী-গণিতবিদ। বিশ্বমানবের অগ্রগতির পথে জার্মানির দান ভুলে থাকা যায় না। আইনস্টাইন সেই জার্মানির প্রতিভূ।

আইনস্টাইন ঠিক এই প্রতীকে অজার্মান জগতে দেখা দেবেন, প্লাঙ্কের সেই ধারণার সত্যতা প্রমাণ হলো। যুদ্ধে পর্যুদস্ত হতমান, বিধ্বস্ত জার্মানির নতুন করে গড়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষার স্বপ্ন প্লাঙ্ক, নার্নস্ট, ভাইমারের চোখে—আইনস্টাইন সেই জার্মানির বহির্বিশ্বের রাষ্ট্রদূত। জিওনিজম প্রচারের অংশী হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রে জার্মান-বিজ্ঞানের প্রতীক আইনস্টাইন তত সফল হননি। এখানে, ইংলণ্ডে, তিনি বিজ্ঞানের পথিক ; তিনি ইহুদি নন ; তিনি বিজ্ঞানী।

ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মান ডি এসসি উপাধি দিল। ম্যাঞ্চেস্টার থেকে রওনা হলেন লণ্ডনে। ২৫০ বছর আগে কবি পোপ নিউটনের আবির্ভাবকে স্বাগত জানিয়ে একটি দ্বিপদী লিখেছিলেন ;

> Nature and Nature's Law lay hid in night.
> God said, "Let Newton be" and all was light.
> প্রকৃতি আর তাহার আইন অন্ধকারে ছিল ঢাকা—
> গড বলেন, হোক নিউটন,—অমনি সব আলো-আঁকা !

সার জন স্কোয়ার আইনস্টাইনের উপস্থিতিতে পোপের কবিতার পাদপূরণ করলেন

> It did not last ; The Devil howling, "Ho,
> Let Einstein be !" restored the status quo.
> টিঁকলোনা তা চিরকাল ; শয়তান হাঁকে, "ওরে ওরে,
> আইনস্টাইন আসুক, আসুক !" পূর্বাবস্থা এলো ফিরে।

বিজ্ঞানী স্কোয়ার আইনস্টাইনকে বললেন, শয়তানের চেলা, যিনি গডের দূত নিউটনকে হাটিয়ে দিলেন ; আর, যত কিছু সহজবোধ্য ছিল সব কিছু দুর্বোধ্য গোলমেলে করে দিলেন। একটি ছবি বেরুলো—শিক্ষক নিউটন চেয়ারে বসতে যাচ্ছেন, আর বিচ্ছু শয়তান ছাত্র আইনস্টাইন পেছন থেকে চেয়ার সরিয়ে নিয়েছে ; নিউটন মাটিতে গড়াগড়ি !

ভদ্রসভা ইংরেজ নিউটনের পদচ্যুতি শয়তান জার্মান আইনস্টাইনের হাতে—বিজ্ঞান-জগৎ মজাটা অট্টহাস্যে উপভোগ করছেন, আইনস্টাইনের চোখে মুখে শয়তানী হাসি। এডিংটন বললেন, "নিউটনের টবে পোঁতা চারা গাছটি, টব ছাপিয়ে বেড়ে যাচ্ছে দেখে আইনস্টাইন এটিকে বড়সড় ক্ষেতে পুঁতেছেন।" সার জন স্কোয়ার বললেন, 'কচু! আইনস্টাইন নিউটনের টবটি ভেঙে এখন সাফাই গাইছেন।" নতুন আবিষ্কারের মজাটা চুটিয়ে বৃটিশ বিজ্ঞানীরা উপভোগ করছেন।

রিলেটিভিটি নিয়ে লিমেরিক লেখা হয়। আর্থার বাটলারের লেখা লিমেরিক তো কালাতীত হয়ে আছে ;

There was a young lady called Bright
Whose speed was much faster than light,
She went out one day
In a relative way
And came back the previous night.

দৌড়বাজ এক মেয়ে পুঁটে,
আলোর চেয়ে যান জোরে ছুটে—
একদিন বাহিরিয়ে—আপেক্ষিক গতি নিয়ে
আগের রাতে পারেন তো পৌছুতে।

প্রিভি কাউন্সিলের ক্লার্ক মিস্টার রেলে আইনস্টাইনের বক্তৃতা মন দিয়ে শুনে গম্ভীর হয়ে বললেন, "আপনার তত্ত্ব যদি ঠিক হয়, তবে যে সব ঘটনা আগে ঘটে গেছে, যেমন নর্মানদের বিজয় ইত্যাদি, এসবের সত্যতা প্রমাণ দরকার।"

রিলেটিভিটি মজার ব্যাপার আর তার আবিষ্কারকও মজার লোক—কি জোরে হা হা করে হাসেন!

লণ্ডন থেকে আইনস্টাইনের হোস্ট হলেন ভাইকাউন্ট হলডেন। হলডেন, কূটনীতিজ্ঞ, রাজনীতিবিদ এবং ব্যবসা ভাল বোঝেন। আইনস্টাইন আসার আগের মুহূর্তে তাঁর প্রকাশককে দিয়ে একটি বই ছাপালেন, "The Reign of Relativity" ; বইটির প্রথম মুদ্রণ ছয় সপ্তাহে শেষ। স্বয়ং হলডেন বইটির লেখক! এডিংটন রেখেঢেকে বইটি সম্পর্কে বললেন, "ব্রিটেনের যে কোন বিশুদ্ধ দার্শনিকের মত তিনি রিলেটিভিটি বুঝেছেন বললে খুব অন্যায় কথা বলা হবে।"—বিজ্ঞানের রিলেটিভিটি আর দর্শনের রিলেটিভিটিতে আসমান জমিন ফারাক ; এডিংটনের কথার অর্থ হলো, হলডেন রিলেটিভিটি না বুঝে লিখেছেন ;—তবু বইটির কি বিক্রি!

অন্য দিকে হলডেনের রিলেটিভিটির উপর বক্তৃতা শুনে এসকুইয়ের মনে হলো যেন চলচিত্তচঞ্চরীর ঈশান বাবুর সমীক্ষার অন্ধকার করা বক্তৃতা,"ধীরে ধীরে কুয়াশার মেঘ নেমে এল, হলডেনের জটিল ব্যাখ্যার চোটে মোমের শিখার ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে যেতে লাগল।"

লণ্ডনের সোসাইটি আইনস্টাইনের সঙ্গে পরিচিত হতে উদ্‌গ্রীব। নার্ভাস আইনস্টাইনকে এক হাতে সামলে রাখেন হলডেন, অন্য হাতে সোসাইটির মান্যগণ্যদের কড়াভাবে রুখে দেন। রিলেটিভিটি যেমন তেমন বুঝুন না কেন, হোস্ট হিসেবে, আইনস্টাইনের স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে হলডেনের সজাগ দৃষ্টি। তবে বিখ্যাত লোকদের সঙ্গে আইনস্টাইনের আলাপ হয়; শুধু উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ। জার্মান আইন-স্টাইনকে মেনে নিতে লয়েড জর্জের তখনো অনীহা। এ নিয়ে ব্রিটেনে সমালোচনা ওঠে; তবে অবস্থার পরিবর্তন হয় না। হলডেনের ডিনারে আইন-স্টাইনের সঙ্গে দেখা হয়, কেণ্টারবারির আর্চবিশপ, এডিংটন, হোয়াইটহেড, ডেভিডসন, বার্নাড শ', প্রফেসর লাস্কি, জেনারেল ইয়ান হেমিলটন এবং সেণ্ট পলের ডীন ডক্টর ইঙ্গের প্রমুখের সঙ্গে। পোশাক-আশাক পরা সভ্যভব্য আইনস্টাইনের মধ্য থেকে কিছু পরে আলুথালু চুলের পোশাক সম্বন্ধে মর্যাদাহীন, চেনাজানা আইনস্টাইনের চেহারা ফুটে ওঠে। ডিনারের সম্ভ্রান্ত পরিস্থিতিতে এই সৃষ্টিছাড়া বেমানান ঘটনা ঘটতে দেখে হলডেন আর তার বোন এলিজাবেথ দুজনে আতঙ্কিত হন। অতিথিরা অন্য দিকে স্ফূর্তিতে আইনস্টাইনকে দেখে ভারি খুশি। আর্চবিশপ ডেভিডসন তাঁর স্মৃতি কথায় বললেন, "বিরাট বিজ্ঞানীর ভূমিকায় অভিনেতা যেমন স্টেজে হাজির হন, আইনস্টাইন সেই চেনাজানা বিজ্ঞানী ভূমিকার চরিত্র যেন; লম্বা ঝাঁকড়া চুল পেছনে টেনে আঁচড়ানো পোশাকে কিছুটা বিজ্ঞানীসুলভ ঢিলেঢালা ভাব; কথা বলেন কম; বিনয়ী আর প্রশংসায় সঙ্কুচিত।" আর্চবিশপের স্ত্রী এলসাকে বলেন, তাঁর একবন্ধু তাকে রিলেটিভিটি বুঝিয়ে-ছিলেন, বিশেষ করে তার রহস্যের দিকটা। শুনে এলসা হাসিতে ভেঙ্গে পড়েন; 'রহস্য, রহস্যময়? আমার স্বামীর গবেষণায় রহস্য!"

রিলেটিভিটিতত্ত্বের দেশকালের জগতে চতুর্থমাত্রা আছে, তবু এটি বিজ্ঞানের তত্ত্ব—দর্শন নয়, মিস্টিক বা রহস্য নয়। আইনস্টাইন রহস্যজ্ঞানের পথিক নন!

হলডেনের পৈত্রিক বনেদী অট্টালিকায় আইনস্টাইনের রাত্রিবাস নিয়ে গল্প তৈরী হলো। বিরাট অট্টালিকার বিরাট ঘরের বিরাট বিছানায় শুতে গিয়ে দুজনের অপ্রতিভতা; বাটলা-রের নিঃশব্দ শাসনে আইনস্টাইনের অসহায়তা ইত্যাদি চ্যাপলিন জাতীয় খোশগল্প বাজারে ছড়িয়ে পড়ে। আইনস্টাইনের সেবা করার জন্য একজন চাপরাশ পরা বিরাট চেহারার ফুটম্যান খিদমদগার সর্বদা হাতের কাছে মজুত। তাকে দেখে আইনস্টাইন চুপি চুপি এলসাকে বলেন, "এলসা, আমরা চলে যেতে চাইলে, এরা যেতে দেবে? আটকে রাখবে না তো?" অথবা ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠে জানলার ভারি পর্দা আইনস্টাইন নিবিষ্ট হয়ে সরাচ্ছেন দেখে এলসা বলেন, ফুটম্যানটাকে ডাকলে না কেন? উত্তরে আইনস্টাইন শিউরে উঠে বলেন, "ওকে দেখলে আমার ভয় করে—ডাকব কি!" বনেদিয়ানা, মাপা

চালচলনের বৈশিষ্ট্য তাঁর কাছে অস্বস্তিকর ঠেকে—সেখানে তিনি নিজেকে ঠিক মতন খুঁজে পান না, চারপাশের অপর্যাপ্ত বিলাস ব্যসনের মধ্যে থেকে আরাম পান না, পান অস্বস্তি। শনিবার আর রবিবার দুটো দিন হলডেনের বাড়ীতে কাটিয়ে সোমবারে ঠাসা কর্মসূচীতে পড়লেন। ওয়েস্ট মিনিস্টার এবিতে নিউটনের সমাধিতে মাল্যদান, আর তারপরে লাঞ্চের পর লণ্ডনে তাঁর প্রথম জনসভা। সভার উদ্যোক্তা কিংস কলেজের প্রিন্সিপ্যাল সার আর্নেস্ট প্রথম দর্শনেই আইনস্টাইনকে ভালবেসে ফেললেন। সভায় হাজির ছিলেন হোয়াইটহেড, জেমস জিন্স, লিণ্ডামান আর বিখ্যাত চিত্রী রোদেনস্টাইন, যার আঁকা আইনস্টাইনের প্রতিচ্ছবি একটি বিখ্যাত শিল্পকর্ম। আইনস্টাইন এখানেও জার্মান ভাষায় বক্তৃতা দিলেন, বিষয় রিলেটিভিটি। কোন নোট নেই, কাগজ নেই, সম্পূর্ণ স্মৃতি থেকে দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন—শব্দে, তথ্যে গণিতে ভুল নেই, নেই ইতস্ততা বা অহেতুক বাগাড়ম্বর। এই বক্তৃতার একটি অংশে পূর্বসূরীদের কাজ এবং চিন্তার স্বীকৃতি ঘোষণা করলেন ; বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ গঠনে তিনি তাঁর পেপারে মাইকেল এঞ্জেলো বেসো ছাড়া আর কাউকে স্বীকৃতি দেননি, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন নি—অথচ—পূর্বসূরীদের কাজের ভিত্তিতে, বিশেষ করে মাইকেলসন-মরলের পরীক্ষায় পাওয়া তথ্যের নিরিখে তাঁর আপেক্ষিতাবাদের সৃষ্টি—এতদিন এই স্বীকৃতির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়নি—এদিনের বক্তৃতায় পূর্বসূরীদের নবমূল্যায়ন করলেন। তিনি বললেন,—

'একটা কথা পরিষ্কার ভাবে বলতে চাই. আপেক্ষিকতা বাদের গঠনে কোন সুদূরকল্পনা নেই, নেই ফাটকা বাজির ঝোঁক। যে তথ্য পাওয়া গিয়াছিল, দেখা গিয়েছে, পদার্থবিস্তার তত্ত্বের বন্ধনে তাদের বাঁধতে গিয়ে এটির সৃষ্টি।……এখানে কোন বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ নেই, আছে শতাব্দীর চিন্তাধারার অনুসৃতির সহজ স্বাভাবিকতা। দেশ, কাল ও গতির প্রচলিত ধারণার বিলোপের কারণ মৌলিক, এই তত্ত্ব আবার সার্বভৌম নয়, বরং প্রচলিত তথ্যের শর্তের উপর এ ট প্রতিষ্ঠিত।"

প্রমাণিত তথ্যের মধ্য থেকে বিশ্বলোকের নিয়মের সুসঙ্গতা খুঁজতে গিয়ে আপেক্ষিকতত্ত্ব গড়ে উঠেছিল ; প্রমাণিত তথ্যকে বাদ দিয়ে এই তত্ত্বের গঠন সম্ভব নয়, All calculation তাত্ত্বিক বিজ্ঞানীরা All experiment পরীক্ষক বিজ্ঞানীদের পাওয়া তথ্যের শর্তে, condition এ তত্ত্ব গড়ে তোলেন। বিজ্ঞানের গতি দ্বিমুখী স্রোত, পরস্পর পরস্পরের সহযোগী, নির্ভরশীল ; একটি অপরটিকে বাদ দিয়ে টিঁকতে পারে না। পরবর্তীকালে আইনস্টাইন রিলেটিভিটি তত্ত্বের গঠনে দার্শনিক চিন্তা রীতিতে বেশী ঝোঁকের কথা বলে-ছিলেন—মহাবিশ্বের সুসামঞ্জস্য বোধের কথা এনেছিলেন, তথ্যের নির্ভরশীলতা কম বলে জানিয়েছিলেন—তাত্ত্বিক পদার্থবিদের কাছে চিন্তা, বোধ, ধারণা নিশ্চয় প্রধান হাতিয়ার ; তবু চিন্তা গড়ে ওঠে: তথ্যের বিশ্লেষণে ও বিচারে, তাদের সুসামঞ্জস্য সজ্জার আলপনার উপরে'। তাত্ত্বিক পদার্থবিদদের পরীক্ষক পদার্থবিদদের প্রতি যে সঙ্কীর্ণতার প্রকাশ সচরাচর দেখা যায়, সেই সঙ্কীর্ণতা তাঁর সেদিনের ভাষণে প্রকাশ পায়নি। বিজ্ঞানের সহযোগিতার

কথা তিনি জানালেন, বিশ্বের সহযোগিতা চিন্তার কথা তাঁর মনে। সহযোগিতা, সহমর্মিতা, সমবেদনা, ত্যাগতিতীক্ষা—বিশ্বমানব সমাজ গঠণে এই কটি নিম্নতম শর্ত। মানবসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন বিজ্ঞানসমাজ বা বিজ্ঞানী নন।

ব্রিটেনে পরিভ্রমনকালে আইনস্টাইনের মনে এক নতুন চিন্তার অঙ্কুর জাগে। আত্মকেন্দ্রী যে মানুষটি বিজ্ঞানের গহণ-গভীর চৌহদ্দিতে বাস করছিলেন, ব্রিটেনের বুদ্ধিজীবী সমাজের সাদর সম্বর্ধনার আলিঙ্গনের মধ্যে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের বীজ খুঁজে পেলেন—বিজ্ঞানের সত্য মানবিক সত্যের মধ্যে ঠাঁই খোঁজে—কারণ মানুষই সুন্দর ; সুন্দরতা মানবতার অতিরিক্ত নয়। সুন্দরতার মধ্য দিয়ে সত্যের কঠিনরূপ প্রকাশ পায়। সেই কঠিন সত্য হয়তো বা মানব-অতিরিক্ত—তার উপলব্ধি আবার মানুষের মনে।

এই চিন্তার কথা ১৯৩০ সালে ১৪ই জুলাই তারিখে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনার কালে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বললেন ; সত্য মানব অতিরিক্ত, এটি তাঁর বিশ্বাস, যার অনুকূলে তিনি প্রমাণ দিতে পারেন না, তবু এ তাঁর ধর্ম। সুস্পষ্ট ঘোষণা করে বলেন,

বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে প্রমান করতে পারিনে যে মানুষকে বাদ দিয়েও সত্য থাকে, তবু এ সত্যের ধারণা করা চাই—এরই অনুকূল আমার সুদৃঢ় প্রতীতি। উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, জ্যামিতির পীথাগোরাসের উপপত্তিটি এমন একটি তত্ত্ব জানাচ্ছে যেখানে, বিশ্বসংসারে মানুষ থাক বা না থাক, সত্য হতে বাধা নেই। মোটকথা মানুষ থেকে স্বতন্ত্র কোন সৎ যদি থাকে তবে তার সত্যও নিশ্চয় আছে ; আর অমানব সৎ যদি না থাকে, তেমন সত্য কিছু নেই। ......সমস্যাটা হলো সত্য আমাদের জ্ঞান বা চেতনা নিরপেক্ষ কিনা। .....আমাদের ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান আর অভিজ্ঞতাকে যুক্তিসিদ্ধ একটি পদ্ধতি এবং শৃঙ্খলায় বাঁধতে হলে দরকার, মানুষ-নিরপেক্ষ একটি বাস্তবতা। . . .মানুষ নিরপেক্ষ সত্য সম্পর্কে মানুষের সহজ স্বাভাবিক ধারণা ব্যাখ্যা করা যায় না,অথবা প্রমাণ করা যায় না,মানি—তবু এ সব মানুষের ধারণা ; মানব অতিরিক্ত বাস্তবতা,সত্যে আমরা কল্পনাকরি। আমাদের অস্তিত্ব,আমাদের মন অভিজ্ঞতা,—এসবের অতীত একটা সত্যবস্তু না হলে আমাদের চলে না—সে যে কেন, কি অর্থে দরকার নিশ্চিত বলা যায় না।"

বিজ্ঞানের গুটিপোকা থেকে এক মানব-অতিরিক্ত সত্যান্বেষী রাত-প্রজাপতি মথের জন্মের সূচনা গড়ে ওঠে। বিশ্বচরাচরের ভিতর একটা সুসংবদ্ধ নিয়ম কাজ করে—সে সম্বন্ধে বোধ দানা বেঁধে ওঠে, তাকে জানার জন্য, উপলব্ধির জন্য, গভীর আকৃতির ভ্রূণ শরীরী রূপ পেতে চায়।

রিলেটিভিটির উপর তাঁর বক্তৃতায় অধিবাদের স্পর্শরেখা ধরা পড়ে। হোয়াইটহেড উপলব্ধির দার্শনিক আকৃতির গাণিতিক রূপ দেখেন আর স্কটল্যাণ্ডের এস্ট্রোনমার রয়েল সামসন গণিতের কাঠামোতে প্রপঞ্চের নিমিত্ত স্বরূপতা ও বিশ্বলোকের কার্যকারণ সম্বন্ধের (Causality hypothesis and Causation) সম্পর্কটির প্রকাশের ভাষাগত অস্পষ্টতা লক্ষ করেন। লিণ্ডামানকে লেখা একটি চিঠিতে সামসন তার এই উদ্বেগ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করলেন।

"খোলামনে বলছি। মহাকর্ষের ব্যাখ্যায় আইনস্টাইন কোন দ্বিধা সংশয়ের সুযোগ রাখেন নি। এ সম্পর্কে তার ব্যাখ্যা হলো শেষ কথা। এর বাইরে আমার কিছু কিছু আপত্তি থাকছে; তাঁর তত্ত্বের প্রমাণ সর্বত্র নেই এবং প্রমাণের চেষ্টাও যেন কিছুটা অগোছাল। এই ফর্মুলা এতই সাধারণ যে, যে কোন অর্থ খুঁজে পাওয়া যাবে; একটা নির্দিষ্ট অর্থ মেনে নেয়া এই কারণে সংগতহীন। এছাড়া, আমি তাঁর দার্শনিক বক্তব্যটাকেও মানতে পারছিনে—যেখানে তিনি বলছেন, যা জানি সবই আপেক্ষিক অনমুভবনীয় অথবা অবাস্তব। ধরে নিলাম বাস্তবের সংজ্ঞায় আমাদের অস্তিত্ব, তা' অন্য কোন ব্যাপক অস্তিত্বের সাপেক্ষে গড়া হলেও—সেতো বাস্তব। যদি নিজের বা অন্য কারো অস্তিত্বকে ব্যাখ্যা দিয়ে বোঝাতে না পারি, যা উপলব্ধি করছি সেই অনুযায়ী যদি বর্ণনা না করতে পারি, তবে এরা বাস্তবের শর্তে গড়া নয়। না জানা থাকলেও, আমার কাছে পরম ঘূর্ণন স্বীকার করতে, অতএব, কোন অসুবিধে নেই।......দেখছি আইনস্টাইনীয় পদ্ধতিতে গড়ে তোলা ঘূর্ণনের সংজ্ঞায় সাপেক্ষে পৃথিবী যে ঘোরে এটা আমরা জানি না। গণিত দিয়ে গড়ে তোলা যুক্তির সত্যতা যাই দেখাক,পৃথিবী যে ঘোরে এটা আমরা নিশ্চিত জানি। জিজ্ঞেস করতে পারেন অবশ্য—কার সাপেক্ষে এই ঘোরা। বোধহয় শেষ উত্তর জানা নেই। তবু কোন বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের বিবেচনাতে মনে হয়, ঘুরছে না এ ধারণাটা আপনারা যে ঘোষণা করছেন—এটি ভাবতে পারা যায় না।"

১৯২১ সালে সামসন আপেক্ষিকতাবাদের উপলব্ধি আর তার প্রপঞ্চের বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে প্রতীকী প্রকাশের ব্যঞ্জনায় সংশয় প্রকাশ করলেন; গণিতের শুদ্ধ উত্তরকে প্রপঞ্চের কার্যকারণ পদ্ধতিতে ঠিক মতন বোঝান যায় না—এই উদ্বেগটি জানালেন। ছয় বছর পর ১৯২৭ সালে সলভে কনফারেন্সে কণার দ্বৈত অস্তিত্বের প্রমাণে গণিতের বিরোধহীন উত্তরকে আইনস্টাইন মানতে পারলেন না। সামসনের সংশয় উদ্বেগ সেদিন তাঁর বক্তব্যে প্রকাশ পেল।

সর্বানুভবের ধারণার বীজ আপেক্ষিক তত্ত্বে নিহিত, তবে তার সমগ্র বোধ তখনো তত্ত্বে গড়ে ওঠেনি। উপলব্ধিকে অঙ্কের ভাষায় বাঁধা যাচ্ছে; প্রকাশের অভিব্যক্তি মুখের বা লেখার ভাষায় করতে চাইলে সেখানে বক্তব্যের অস্পষ্টতা দেখা দেয়।

বৃটেন থেকে বার্লিনে ফিরে এলেন, যেন রণজয় করে ফিরলেন। নব জার্মানির দূতিয়ালি সার্থক, সফল ও সম্মানিত। ১৯২২ সালের প্রথমদিকে ফ্রান্সে যাবার আমন্ত্রণ এল। জার্মান-বিদ্বেষে বিক্ষুব্ধ ফ্রান্সের আমন্ত্রণ সহজে ঘটেনি। বন্ধু বিজ্ঞানী লজেভাঁ এবং প্রধানমন্ত্রী ও চেম্বার অফ ডেপুটির প্রেসিডেণ্ট পল পেনলিভের প্রচেষ্টায় আইনস্টাইন আমন্ত্রিত হন। কিছুটা দ্বিধান্বিত আইনস্টাইন জার্মানির পুনর্গঠনের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী এবং ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট ইহুদি ওয়াল্টার রাথেনিউ-এর সঙ্গে পরামর্শ করে আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন।

২৮শে মার্চ ১৯২২ সালে বেলজিয়াম সীমান্তে ফরাসী জ্যোতির্বিদ চার্লস নর্ডমান আর লাজেভাঁ আইনস্টাইনকে অভ্যর্থনা করে প্যারিসে নিয়ে যেতে হাজির। সীমান্তের স্টেশনে নর্ডমান এই প্রথম আইনস্টাইনকে দেখেন। চাওড়া কাঁধ একটু ঝুঁকিয়ে ১·৭৬ মিটার লম্বা আইনস্টাইন যুবকের মত ট্রেনের সেকেণ্ড ক্লাস কম্পার্টমেণ্ট থেকে নেমে এলেন,

সুগঠিত মাথা ঝাঁকরা চুলে ভরা। কিশোর বীটোফেনের মত মুখে সরল গাম্ভীর্য। আর হঠাৎ সেই গম্ভীর মুখে অট্টহাসি ফুটে ওঠে—সারা মুখে ছেলেমানুষী আনন্দ জেগে থাকে আইনস্টাইনকে দেখে নর্ডমান মুগ্ধ। ট্রেনে তিনজনে প্যারিসে আসেন, পথে বিজ্ঞান নিয়ে কথা হতে হতে কোয়ান্টাম সমস্যার আলোচনা হয়। আইনস্টাইন বলেন, 'প্রত্যেকের একটা পথের শেষ থাকে, নইলে বড় কঠিন এই সমাধান পাওয়া। এই পরীক্ষায়, আমার উপহার হলো আপেক্ষিকতত্ত্ব।' তবু বেড়াভাঙার পাগলামো বিজ্ঞানীদের মনে জাগে। আইনস্টাইন বলেন, 'ঠিক, পদার্থবিদ্‌রা অল্পবিস্তর সবাই কিছুটা পাগল, তাই না? তবে এ যেন রেসের ঘোড়ার বৃত্তান্ত ; যে যা' কেনে, সে তাই বেচে।'

মধ্যরাত্রে প্যারিসে পৌঁছে সাংবাদিক আর ক্যামেরাম্যানদের ফাঁকি দিতে রেললাইন টপকে অন্য প্ল্যাটফরম দিয়ে আইনস্টাইকে নিয়ে সঙ্গীতুজন পালিয়ে আসেন। তারপর পাতাল রেল মেট্রো দিয়ে গন্তব্যস্থানে যাওয়া। সাংবাদিকদের ফাঁকি দিতে পেরে আইনস্টাইন মহাখুশি, আর যখন জানলেন মেট্রোর ট্রেনে অপেক্ষমান রিপোর্টারদের তলা নিয়ে যাচ্ছেন তখন ছেলেমানুষের মত হাততালি দিয়ে হেসে ওঠেন।

৩১শে মার্চ কলেজ দ্য ফ্রাঁসে ফরাসীভাষায় ক্লাসিকেল রিলেটিভিটি থিয়োরি ও তড়িৎগতি বিজ্ঞানের বৈষম্যের ধারণা নিয়ে প্রথম বক্তৃতাটি দিলেন। শ্রোতার সংখ্যা নির্দিষ্ট ও নিরূপিত ; এসেছেন মাদাম কুরী, বার্গসঁ এবং অন্যান্যরা। পরপর কয়েকদিন ফ্রান্সের বিশিষ্ট বিদগ্ধজনের সঙ্গে আলোচনা করেন, তাঁর নিজের বক্তব্য রাখেন। মাকের সঙ্গে তাঁর চিন্তার প্রভেদ বুঝিয়ে বলেন ; মাকের সম্পর্কে বলেন, ভাল গণিত বোঝেন, মেকানিকসে অগাধ জ্ঞান, তবে দর্শনের চিন্তায় বড়ই শোচনীয়!

ফ্রান্সে বিদগ্ধ জনের একাংশ তাঁকে কিন্তু গ্রহণ করে না। একাদমির ত্রিশজন সভ্য তাঁর সভা ছেড়ে চলে যান। ফরাসী প্রেসও দ্বিধাবিভক্ত। একদল আইনস্টাইনের বিজ্ঞানের আন্তর্জাতীয়তাকে তাঁর জাতীয়তার চেয়ে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেন। অন্যেরা শুধু তিনি জার্মান বলেই তাঁকে গ্রহণ করতে অপারগ, তিনি অচ্ছুত। একদল বলে, জার্মানি লিগ অফ নেশনে যোগ দেয়নি—সেই স্বতন্ত্রবাদী জার্মানির প্রতিভূ আইনস্টাইন। আরেক দল বলেন, জার্মানরা যদি ক্যানসার বা যক্ষ্মার প্রতিষেধক ওষুধ আবিষ্কার করতো, তবে ফরাসীরা, বিশেষ করে ঐ ত্রিশজন একাদমির সদস্যরা কি অসুখে পড়লে ঐ ওষুধ ব্যবহার না করে জার্মানি লিগ অফ নেশনে কবে যোগ দেয়, সেই সময়ের জন্য অপেক্ষা করতেন?

ফ্রান্সে আইনস্টাইনের সফলতা আংশিক। এই সফলতা জার্মান আইনস্টাইন হিসেবে এল না, এল বিজ্ঞানী আইনস্টাইন হিসেবে। পল পেনলিভের অক্লান্ত চেষ্টা সত্ত্বেও যুদ্ধোত্তর ফ্রান্স প্রতিদ্বন্দ্বী জার্মানিকে মেনে নিতে পারল না। ফ্রান্সের সীমান্তে যেখানে যুদ্ধের ফলে দেড় লক্ষাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে, সেই যুদ্ধফ্রন্টের বোমাচষা ধ্বংসস্তূপ দেখে

আইনস্টাইন দুঃখিত অভিভূত হয়ে পড়েন। ফরাসীদেশের এই ধ্বংসের ভীষণতা জার্মানদের অপরাধের বিশালতাকে চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে যেন দেয়। বারবার তিনি বলেন, "সকলের এ জায়গা দেখা উচিত, দেখুক যুদ্ধ কি ভয়ানক, কি অপরিসীম ক্ষয়ক্ষতি করে। সবার এই জায়গা দেখা উচিত, সবার! ফিরে গিয়ে ধ্বংসের এই বীভৎসতার কথা আমার বন্ধুদের বলব। কি ভয়ানক, কি ভীষণ বীভৎসতা।"

বার্লিনে ফিরে এলেন আইনস্টাইন। নতুন জার্মানির স্বপ্ন তাঁর চোখে। আমেরিকায়, ইউরোপে, বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে আলোচনা করে মনে হয়েছে, নতুন পৃথিবীর নতুন সমাজ গড়ে তুলতে বুদ্ধিজীবীদের সহযোগিতা দরকার। এই সময়ে লিগ অফ নেশনে International Committee on Intellectual Co-operation বা বুদ্ধিজীবীদের সহযোগিতার আন্তর্জাতিক কমিটির সভ্য হন। একটি বৌদ্ধিক শুভেচ্ছার বাতাবরণে জার্মানির ভাইমার রিপাবলিক এগিয়ে যাবে, প্রতিবেশীদের সঙ্গে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে অসামরিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রী ও গুণতন্ত্রী জার্মান-সমাজ প্রতিষ্ঠা—এই স্বপ্ন যখন চোখে, ঠিক তখন, ২৪শে জুলাই ১৯২২ সালে ওয়াল্টার রাথেনিউকে হত্যা করা হলো।

ইহুদী রাথেনিউ-এর হত্যার মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতে কি ঘটবে তার আভাস পাওয়া গেল। শোনা যায়, রুডল্‌ফ্‌ লীবাস নামে এক জার্মান যুবক আইনস্টাইনকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেন। ধরা পড়ার পর লীবাস বলেন, শান্তিবাদের সুড়সুড়ি যারা দিচ্ছেন তাদের সব নেতাদের খুন করা স্বাদেশিকতার লক্ষণ। বিচারে লীবাসের সাজা হয়, তিন পাউণ্ডের মত অর্থদণ্ড।

লিগ অফ নেশনেও আইনস্টাইনের সদস্য পদ নিয়ে কথা ওঠে। ফ্রান্সের কিছু সদস্য তাঁকে জার্মান বলে জানাচ্ছেন, জার্মানির কিছু লোকের কাছে তিনি সুইস ইহুদি। আইন-স্টাইনকে জার্মান বা সুইস জার্মান ব্যাখ্যা দেবার গোলমালে লিগ গেল না—কমিটি জানান, আইনস্টাইনের অন্তর্ভুক্তি জার্মান বিজ্ঞানের প্রতিভূ হিসেবে।

প্রথমদিকে বুদ্ধিজীবীদের সহযোগিতা প্রচারে আইনস্টাইনের উৎসাহ নজরে পড়ার মত। তাঁর চেষ্টায় মাদাম কুরী এবং লরেন্স কমিটিতে যোগ দেন। অন্য দিকে তাঁর নিরঙ্কুশ সততা বোধ, সব কিছুতেই ভাল দেখা, অবাস্তব ধ্যান ধারণা ইত্যাদি সামলে রাখতে গিয়ে চেয়ারম্যান গিলবার্ট মূরের প্রাণান্ত। সেই উৎসাহী আইনস্টাইন রাথেনিউ-এর হত্যার পর হঠাৎ কমিটিতে তাঁর পদত্যাগপত্র পেশ করলেন। মাদাম কুরী থাকতে অনুরোধ করেন। অনুরোধ আসে গিলবার্ট মূরের কাছ থেকে। মাদাম কুরীকে লেখা একটি পত্রে আইনস্টাইন জানালেন, জার্মানির ভিতরে কি ঘটছে সেই অবস্থা সম্পর্কে তাঁদের কোন ধারণা নেই; কোন ইহুদির পক্ষে একসঙ্গে জার্মানি বা কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার সেবা করার সুযোগ নেই।

বাইরের জগতের সঙ্গে মেলামেশার ফলে আইনস্টাইন ইহুদি বলে চিহ্নিত হচ্ছেন, নিজেকেও ইহুদি ভাবতে থাকেন।

তবু সেদিন বহির্জগতে আইনস্টাইন একটি বিশেষ নাম। একজন মানবতাবাদী, মানবদরদী বিজ্ঞানী ; তিনি শান্তিবাদী। লিগ অফ নেশনের কমিটিতে তাঁকে রাখতে পারলে লিগের আন্তর্জাতিকতা বজায় থাকে। আইনস্টাইন যদিও জার্মান, তবুও তাঁর সুইস নাগরিকত্ব থাকায় তাঁকে গ্রহণ করতে লিগের বিশেষ অসুবিধা হয় না ;—জার্মান বা অজার্মান যাই হন, তিনি জার্মান বিজ্ঞানের প্রতিভূ—তাঁর মাধ্যমে জার্মানির সঙ্গে লিগের লেনদেন। অতএব আইনস্টাইনের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করতে লিগ অনিচ্ছুক।

মাদাম কুরী এদিকে আইনস্টাইনের পদত্যাগের ছেলেমানুষিপনা দেখে ক্ষুব্ধ। তিনি আইনস্টাইনের চিঠি পাবার পর লিখলেন,

"আপনার বন্ধু রাথেনিউ যাঁকে আমি একজন সৎ সম্মানিত নাগরিক বলে মনে করি, আমার বিশ্বাস এই আন্তর্জাতিক বুদ্ধিজীবীদের সহযোগিতার শান্তি প্রচেষ্টায় তিনি আপনাকে যোগ দিতে উৎসাহ দিতেন। নিশ্চয় আপনার মতের পরিবর্তন হবে। আপনার জন্য আমাদের রয়েছে হৃদয়ের আনন্দভরা স্মৃতি সুখ।"

বার্গসঁ চাইলেন আইনস্টাইনের সঙ্গে কেউ একজন সোজাসুজি কথা বলুক। সেক্রেটারি কমোরট বার্লিনে আইনস্টাইনের সঙ্গে দেখা করলেন। দুদিনের দীর্ঘ আলোচনা করার পর বোঝা গেল পদত্যাগ করার কোন বিশেষ কারণ আইনস্টাইনের নেই। জার্মানিতে তাঁর সম্মান প্রতিষ্ঠা তখন তুঙ্গে, যেটুকু ভিন্ন মতের সুর শোনা যায়, যে কোন বিখ্যাত প্রতিষ্ঠিত মানুষের ভাগ্যে তা' জুটে থাকে। জোটেও। কমোরট-এর বক্তব্য, মানুষের অন্যায়ের প্রতিবাদে শান্তিবাদী বুদ্ধিজীবীদের রুখে দাঁড়ান দরকার। ইহুদিদের বিরুদ্ধে জার্মানজাতির ঘৃণা—অন্যায়, তার মোকাবেলা করা উচিত ; সেখানে মুখ ফিরিয়ে থাকা পলায়নের নামান্তর।

একই কথা মাদাম কুরীর চিঠিতে। এলবার্ট আইনস্টাইন জানালেন, জাপান মাদ্রিদ ঘুরে এসে তিনি লিগের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন। পদত্যাগপত্র নিয়ে আর কোন কথা উঠল না। আইনস্টাইন সহযোগিতায় রাজি, এ তথ্য সুখের, আনন্দের। উত্তপ্ত দিনগুলির মধ্যে আইনস্টাইন জানলেন যে তিনি ইহুদি বলে চিহ্নিত হলেও একা নন। তাঁর বন্ধুরা আছেন জার্মানিতে, আছেন বহির্জার্মানিতেও।

নিঃসঙ্গ একাকী ধ্যানী বিজ্ঞানীর জন্য আছে কোলাহলের কলরোলে ভরা ভয়ঙ্কর সুন্দর বিশ্বলোক!

জার্মানিতে আরেকবার এন্টি-রিলেটিভিটি কোম্পানির ঢেউ জেগে ওঠে। সমস্ত পরিস্থিতি কিছুটা উদাসীন সংশয়ের দৃষ্টি নিয়ে বিচার করেন আইনস্টাইন। এই সময়ে শরৎকালে ১৯২২ সালে জানা গেল তিনি ফিজিক্সে ১৯২১ সালের নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন—সেই

একই বছরে কেমিষ্ট্রিতে নোবেল প্রাইজ পেলেন আইসোটোপ বা সমস্থানিক তত্ত্বের প্রবক্তা সোডি।

১৯২১ সালের নোবেল পুরস্কারবিজয়ী আইনস্টাইন-সোডি, যার সরকারী ঘোষণা হলো ১৯২২ সালের মাঝামাঝি। মাত্র ১৯১৮ সালে প্লাঙ্ক নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। প্লাঙ্কের এনার্জি কোয়াণ্টামের আবিষ্কার ১৯০০ সালে আর আইনস্টাইনের যুগান্তকারী বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ ও আলোকতড়িৎ ফলের ঘোষণা ১৯০৫ সালে। এদিক দিয়ে বিচার করলে আইনস্টাইনের নোবেল পুরস্কার পেতে খুব একটা দেরী হয়নি—দেরী যেটুকু ঘটে তা নতুন তত্ত্বের স্বীকৃতিতে। অন্যদিকে ১৯০১ সাল থেকে ১৯১৭ সালের মধ্যে তেজ-ক্রিয় ও কেথড-রে, এক্স-রে বা ইলেকট্রন সংক্রান্ত আবিষ্কারের জন্য বিজ্ঞানীরা নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন; শুরু ১৯০১ সাল থেকে, এক্স-রে আবিষ্কারক জার্মানির রণ্টগেন থেকে। তারপর পরপর নোবেল প্রাইজ পেলেন লরেন্স, বেকারেল, কুরীদম্পতি, রামসে, র‍্যালে, লেনার্ড, জে জে টমসন, রাদারফোর্ড, মাইকেলসন, ভীন, ফন লাউএ, ব্রাগ ও বার্কলা। তাত্ত্বিক পদার্থবিদ নয়, তথ্য থেকে গড়ে তোলা তত্ত্বের আবিষ্কারক পরীক্ষক-তাত্ত্বিক বিজ্ঞানীরা পুরস্কৃত হয়েছিলেন; কারণ পুরস্কার সম্পর্কে আলফ্রেড নোবেলের ঘোষণা,—তাঁর মতে ফিজিক্স-এর পুরস্কার পাবেন আবিষ্কারক (Discoverer), আর সেই আবিষ্কার যেন মানুষের উপকারে লাগে, কাজে লাগে। ১৯০১ সালে এক্স-রের আবিষ্কারক রণ্টগেন নোবেলের শর্ত পূর্ণ করতে পেরেছিলেন। এদিক থেকে প্লাঙ্কের আবিষ্কার এনার্জি-কোয়া-ণ্টাকে ঠিক ডিসকভারি বলা যায় না। নোবেল পুরস্কার ঘোষণায় প্লাঙ্কের পুরস্কার প্রাপ্তি সম্বন্ধে বলা হলো, "In recognition of the services he rendered to the advancement of Physics by his discovery of Energy Quanta; এনার্জি কোয়া-ণ্টার আবিষ্কারের ফলে ফিজিক্স-এর অগ্রগতির স্বীকৃতিতে।" ডিসকভারি শব্দটি ১৯০১ সাল থেকে প্লাঙ্কের পুরস্কার প্রাপ্তির কাল ১৯১৮ সাল পর্যন্ত সব পুরস্কার বিজয়ীর ক্ষেত্রে বিবেচ্য হয়েছিল; প্লাঙ্ক ব্যতিক্রম নন। পরের বছর ১৯১৯ সালে পুরস্কার পেলেন জোহা-নেস স্টার্ক—সেখানেও আছে ডিসকভারির উল্লেখ; কেনাল-রেতে ডপলার এফেক্ট আবিষ্কার এবং বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে বর্ণালি রেখার বিভাজন আবিষ্কার। এই ডিসকভারি নিয়ে আইনস্টাইনের বেলা নোবেল কমিটির সংশয়। তাঁর আপেক্ষিকতত্ত্ব যুগান্তকারী হলেও, এটি মানবজাতির উপকারে লাগবে কিনা জানা যায় না; আর একে কি বলা যাবে ডিস-কভারি—তথ্য থেকে গড়ে তোলা তত্ত্ব? সাব-এটমিক জগতে রিলেটিভিটির প্রয়োগ হচ্ছে; বিটা-রের চরিত্র বোঝাতে রিলেটিভিটি ১৯০৯ সালে বিজ্ঞান জগতে এসে গেছে,—তবু রিলেটিভিটিকে ডিসকভারি বলতে বাধবাধ ঠেকে। অন্য দিকে তাঁর ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট বা আলোক তড়িৎফলকে ডিসকভারির আওতায় আনা যায়, ১৯২০ সালে থেকে

আলোক-তড়িৎফলের বাণিজ্যিক ব্যবহার হতে শুরু করেছে—অতএব, নিশ্চিন্তে আইন-স্টাইনকে ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট-এর জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়া হলো! ঘোষণা করা হলো, ,'For his service to the theory of Physics and especially for the law of the Photo-Electric Effect—তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার জগতে তাঁর মূল্যবান সহায়তার জন্য এবং বিশেষ করে, আলোক-তড়িৎ ফলের নিয়ম আবিষ্কারের জন্য।" ডিস-কভারি শব্দটি থাকল আরো থাকল অতিরিক্ত সংযোজন, "Independently of such value as may be ultimately attached to his theories of relativity and gravity if they are confirmed তাঁর আপেক্ষিক ও মহাকর্ষ তত্ত্ব, যদি কোনদিন প্রমাণিত হয়, তবে সে দুটির সর্বশেষ স্বাধীন মূল্যায়নের স্বীকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে।

নোবেল পুরস্কার পাবার পর আইনস্টাইনের জাতীয়তা নিয়ে সংশয় জেগে ওঠে—তিনি সুইস, না জার্মান? জার্মান একাদমি অফ সায়েন্স দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানাল, 'Einstein ist Reichsdentscher—আইনস্টাইন জার্মান।

কাইজার ভিলহেলম ইনস্টিট্যুটে যোগদানের একটি শর্ত আইনস্টাইন রেখেছিলেন, তিনি সুইস নাগরিকত্ব ত্যাগ করবেন না। নার্নস্ট ও প্লাঙ্ক বলেছিলেন, ওটা কোন বাধা নয়। ১৯১৪ সালে আইনস্টাইন বার্লিনে আসেন; একটি নিয়ম তিনি জানতেন না, নার্নস্ট ও প্লাঙ্ক তাঁকে জানান নি,—১৯১৩ সালের জার্মানির একটি আইন মোতাবেক জার্মানির সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং প্রাশিয়ান একাদমির সভ্য স্বাভাবিকভাবেই জার্মান নাগরিকত্ব পাবার অধিকারী। জার্মান পিতার সন্তান, কাইজার ভিলহেলম ইনস্টিট্যুটের অধ্যাপক আইনস্টাইন আইনত জার্মান অথবা প্রধানত (chietly) জার্মান। ১৯২০ বা ১৯২১ সালের সংবিধানের আনুগত্যের শপথ এখানে অবান্তর, তার আগে, ১৯১৩ সালের আইন অনুযায়ী আইনস্টাইন প্রাধানত জার্মান। নোবেল পুরস্কার কমিটি আইনস্টাইনকে জার্মান বলে অভিহিত করলেন।

প্লাঙ্ক-নার্নস্ট প্রমুখ শুভানুধ্যায়ীরা সুখী; আর লেনার্ডের দল নোবেল কমিটিকে লিখলেন, ভুয়ো আপেক্ষিকতত্ত্বকে আড়ালে রেখে, আইনস্টাইনকে এসময়ে নোবেল পুরস্কার দেওয়া অন্যায়, অবিবেচনার কাজ! অন্যদিকে জার্মান সরকার আইনস্টাইনের জার্মানত্ব প্রমাণের জন্য জার্মানির সম্মান বাড়াবার জন্য উৎসুক, উদগ্রীব। প্লাঙ্ক অভিনন্দন জানিয়ে বললেন, "নোবেল পুরস্কার পাওয়া আনন্দের, সম্মানটা সুখের; তার চেয়েও আনন্দের অর্থপ্রাপ্তির দিকটা। তোমার দৈনন্দিন জীবনের অসুবিধাগুলো আশা করি এবার কেটে যাবে।" বিবাহ বিচ্ছেদের শর্ত অনুযায়ী আইনস্টাইন পুরস্কারের টাকাটা মিলেভাকে পাঠালেন।

তখন, ১৯২২ সালে, এ তথ্য প্রকাশ পায় না। এদিকে আইনস্টাইন পুরস্কারের অর্থ সুইস টাকায় পরিবর্তন করছেন, এখবর বাজারে ছড়িয়ে পড়ায় একটা গুজব রটে যে তিনি পুরস্কা-

রের টাকাটা মানব জাতির উন্নতির জন্য দান করেছেন। এই গুজব বহুদিন ধরে, আইনস্টাইনের মৃত্যুকাল পর্যন্ত,সাধারণ্যে প্রচলিত ছিল ; সমকালীন জীবনীকাররাও এই তথ্যটিকে অসত্য বলে জানান নি। অন্যদিকে মিলেভা বা এলবার্ট আইনস্টাইন নিজেদের বিবাহ-জীবন সম্পর্কে নৈশব্দ্য বজায় রেখে গেছেন ! তাঁরাও কোন আলোকপাত করেন নি।

যা হোক, সুইডিশ-জার্মান-সুইস টাকা পয়সার লেনদেনে কিছু অর্থ ক্ষতি হলেও ৩০,০০০ ক্রোনের অর্থে মিলেভার সংসারে নিশ্চিন্ততা বাড়ে, আইনস্টাইনকেও আর তাঁদের টাকা দিতে হয় না। ১৯১৯ সালে মিলেভা যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন—আইনস্টাইন নোবেল প্রাইজ পাবেন—সেই ভবিষ্যদ্বাণী মিলে যায় দুবছরের মধ্যেই !

নোবেল পুরস্কার বিতরণী সভায় আইনস্টাইন উপস্থিত থাকতে পারলেন না—তিনি তখন জাপান ভ্রমণে গিয়েছেন। আইনস্টাইনের পক্ষ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেন সুইডেনের জার্মান রাষ্ট্রদূত। জাপান থেকে ফিরে আসার পর একটি হার্দ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বার্লিনে আইনস্টাইনকে পুরস্কারের প্রতীকটি দেওয়া হলো। আইনস্টাইনের অনুরোধ মত প্রতীকটি তাঁর হাতে তুলে দিলেন জার্মানিতে অবস্থিত সুইজ্যরল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত।

জাপানে আইনস্টাইন এলসার সঙ্গে এলেন। বক্তৃতা ইত্যাদির ফলাফল খুব একটা বোঝা গেল না। সম্রাট হিরোহিতোর সঙ্গে দেখা ও চা-পান হলো, আর দুজনে ঘুরে দেখলেন সুন্দরী জাপান, তার নিসর্গ শোভা। জাপান থেকে ফিরে আসার পথে প্যালেস্টাইনে এলেন। এক বর্ণাঢ্য পরিবেশে হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারোদ্ঘটন করলেন আইনস্টাইন ; প্রাচীন হিব্রু ভাষায় পাঠ করলেন ঘোষণা পত্র !

প্যালেস্টাইনে একজন মেসাআ রূপে আইনস্টাইন এলেন। ওয়াইজমান এবং অন্যান্য নেতাদের চতুর প্রচারের ফলে প্যালেস্টাইনের আমজনতার কাছে আইনস্টাইন একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি, যিনি গড়ের রহস্য জানেন ; একজন মহাশক্তিশালী মানুষ যিনি সাধারণ বলশালী লোকের মত লোহার পাত বাঁকান না, বাঁকিয়ে দেন আলোর পথ,বিধাতার ঐশ্বরিক জ্যোতিরেখা ! যেখানেই আইনস্টাইন যান, সেখানেই ভিড় ; তাঁকে দেখার জন্য, ছোঁয়ার জন্য হুড়োহুড়ি, গোলমাল। মানুষের শ্রদ্ধার অভিব্যক্তির এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশে আইনস্টাইন অভিভূত। সম্মানের বারিধারায় অভিষিঞ্চিত আইনস্টাইনের নিজেকে ইহুদিদের একজন বলে ভেবে নিতে ভাল লাগে। তেল আবিভ শহরের স্বাধীন নাগরিকত্ব পাবার পর তিনি বলেন, এ সম্মান তাঁর কাছে আগেও এসেছে. তিনি আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরের স্বাধীন নাগরিক। তবু তেল আবিভ-এর সম্মান তাঁর কাছে অনেক বড় মহান ও বাঞ্ছনীয়। এই নগরটিকে আপনার বলে ভাবতে তাঁর ভাল লাগে, নগরবাসীরা তাঁর আপনজন।

প্যালেস্টাইন ছাড়ার সময় আইনস্টাইন বলেন; আবার আসব।

প্যালেস্টাইনে আর তিনি ফিরে আসেন নি !

প্রায় রাজকীয় আড়ম্বরে প্যালেস্টাইন পরিভ্রমণ করে ১৯২৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি প্যালেস্টাইন ছাড়লেন—জাহাজে এলেন মাদ্রিদ। মাদ্রিদের অভ্যর্থনার কাছে মনে হয় সব কিছু ম্লান। সিজারের মত তিনি স্পেনে এলেন, দেখলেন আর জয় করলেন—স্পেনীয়রা তাঁকে জয়ী বলে বরণ করতে সেদিন জাহাজঘাটে হাজির। একাদমি সায়েন্সে তাঁর বক্তৃতাসভার শ্রোতার আসনে স্বয়ং স্পেনের সম্রাট দ্বাদশ এলফানসো উপস্থিত। মাদ্রিদ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর শুধু আইনস্টাইনকে নয়, তাঁর স্ত্রী এলসাকেও অনারারি ডক্টরেট ডিগ্রি দেবার কথা ঘোষণা করলেন; শিক্ষামন্ত্রী আইনস্টাইনকে একটি বাড়ী দিতে চাইলেন—যে কোনদিন চাইলে তিনি স্পেনের অধিবাসী হতে পারেন; যে কোনদিন চাইলে মাদ্রিদ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যাপনার অতি সম্মানজনক পদ পেতে পারেন। এই আড়ম্বরের মধ্যে এলসা পদে পদে বিপদে পড়েন। আপনভোলা অধ্যাপক হিসেবে আইনস্টাইনের ভুলত্রুটি চোখে পড়ে না, অন্যদিকে এলসার সেই নিরঙ্কুশতা নেই ভুল যাতে না ঘটে তার অদম্য প্রচেষ্টায় তিনি ব্যতিব্যস্ত।

এই সময়ে বার্সিলোনায় একটি বামপন্থী বিপ্লবীদের সমাবেশে আইনস্টাইন ভাষণ দেন। নিতান্ত সাদামাটা একটি বক্তৃতা, অথচ বামপন্থী ব্যাখ্যায় এটি একটি বৈপ্লবিক রূপ পায়। বামপন্থীরাও আইনস্টাইনকে দলে পেতে চান—তাঁকে কাছে পাওয়া মানে দলের ও মতের মর্যাদা সাধারণের চোখে বৃদ্ধি পাবে। দি টাইমস পত্রিকা আইনস্টাইনের ভাষণের অপব্যাখ্যার কথা প্রচার করেন, তবু ক্ষতি যা হবার তা ঘটে যায়। জার্মানিতে প্রচার হয়, আইনস্টাইন শুধু যে ইহুদি তা নয়, তিনি বামপন্থী বিপ্লববাদী, রাশিয়ার ভক্ত। এমন কি মাদ্রিদে আসার পথে তিনি যে রাশিয়া ঘুরে এসেছেন, সে বিষয়ে একদলের কোন সন্দেহ নেই। কিছু কিছু কাগজে পত্রিকায় আইনস্টাইনের মস্কো-পিটার্সবার্গ শহরের কার্যকলাপের নিজস্ব সংবাদদাতার প্রতিবেদন প্রকাশ হলো। এন্টি-রিলেটিভিটি দল এসব খবর প্রচার করতে থাকেন।

আন্তর্জাতিক নানা ঘটনায় তখন জার্মান জাতি ক্ষুব্ধ—যুদ্ধে তাদের ইণ্ডাষ্ট্রি ধ্বংস হয়েছে, সাম্রাজ্য-কলোনিগুলি হাতছাড়া, যুদ্ধোত্তর জার্মানির উন্নতির জন্য টাকার অভাব

আছে আর আছে যুদ্ধের জন্য ফ্রান্সের কাছে আকণ্ঠ ঋণ—যে দেনা শুধতে গিয়ে তাদের বিধ্বস্ত দেশ আরো ধ্বংস হচ্ছে। জার্মানরা দরিদ্র, নিপীড়িত; কোণঠাসা বেড়ালের মত রাগে ফুলছে, অসহায় নির্বীর্য ক্রোধ কয়েকজনকে উপলক্ষ করে, কয়েকটি পথ অনুসরণ করে ফেটে পড়ছে—এন্টি-রিলেটিভিটি, এন্টি-ফরাসী, এন্টি-ইহুদি চিন্তার পথে তাদের বহিপ্রকাশ। ১৯২২ সালে নেহাতই অপারগ হয়ে জার্মানরা ফরাসীদের ঋণের বকেয়া টাকার কিস্তি দিতে অস্বীকার করে। ফরাসীরা টাকা না পেয়ে জার্মানির একমাত্র খনিজ ও শিল্প অঞ্চল রূঢ় অংশ দখল করে নেয়। স্বদেশে ও বিদেশে ফরাসীদের এই অন্যায় আচরণের বহু বাচনিক প্রতিবাদ জেগে ওঠে—ফরাসী শাসকরা এই প্রতিবাদে কর্ণপাত করেন না। তাদের আচরণে, প্রাশিয়ার ফ্রেডরিখ দ্য গ্রেটের উপদেশের প্রকাশ; যিনি বলেছিলেন, 'যা পার জোর করে দখল করে নাও; ফেরত দিতে না হলে এটা কোন দোষ নয়।' ফরাসীদের ফেরত দিতে বাধ্য করার মত শক্তি ইউরোপে সেদিন ছিল না। মৌখিক প্রতিবাদের চিৎকারে রাজনীতিবিদরা তাদের আচরণ পালটান নি।

মাদ্রিদ থেকে ফিরে এসে আইনস্টাইন লিগ অফ নেশনের কমিটির সদস্যপদ ত্যাগ করলেন। পদত্যাগপত্র ডাকে গেল জেনেভায়, আর তারই একটি কপি তিনি জুরিখের একটি পত্রিকায় ছাপাতে দিলেন।

নিজেকে আইনস্টাইন শান্তিবাদী বলে প্রচার করেন—তাঁর শান্তিবাদে কোন দ্বিধা নেই, সংশয় নেই। যুদ্ধকে ঘৃণা করেন, এই ঘৃণা তাঁর সহজাত, হৃদয় থেকে উত্থিত। যুক্তিতর্কের বৌদ্ধিক বিশ্লেষণে তাঁর শান্তিবাদ গড়া নয়, হিংসা আর হননের অস্বীকৃতির ফলে তাঁর শান্তিবাদ গড়ে উঠেছে। বামপন্থী সমাজতন্ত্রী রাজনীতির স্পর্শ এডলারের সাহচর্যে পেয়েছিলেন; প্রথম মহাযুদ্ধের কালে সোশাল ডিমোক্রেটদের সঙ্গে মেলামেশার ফলে Bund-এর কর্মী ও সভ্য হলেন; জার্মানির মানবতাবোধ সংরক্ষণের তিনি প্রয়াসী। বিশ্বশান্তি, বিশ্বমানবতা ও বিশ্বজাতীয়তা—এই ত্রিধারার সূত্র তিনি খুঁজে চলেছেন। মহাবিশ্বলোকের আকৃতির সামঞ্জস্য চিন্তাকালে তিনি বেঢপ বেমানান কিছু থাকতে পারে সেই সম্ভাবনাটি নাকচ করেছিলেন; মহাজাগতিক কনস্ট্যাণ্ট ব্যবহার করে বিশ্বলোকের সুমসৃণ বর্তুলতার কথা প্রচার করলেন। তাঁর শান্তিবাদ আর আন্তর্জাতীয়তাবাদে সেই এক সামঞ্জস্যের ধারণা। সব দ্বিধা সংশয় খোঁচখাঁচ কেটে ছেঁটে বিশ্বভ্রাতৃত্ব বোধ সৃষ্টি করতে হবে। মানবমূল্যবোধ এখানে সেই কনস্ট্যাণ্ট—এর বিলুপ্তি দেখলে তিনি বিচলিত অসহায় হয়ে পড়েন; চিন্তার স্থৈর্য নষ্ট হয়, অস্থির দোলায়মান মানসিকতার শিকার হন।

রাথেনিউ-এর হত্যার পর লিগের কমিটি থেকে তাঁর পদত্যাগের কোন সুবোধ্য কারণ মাদাম কুরী খুঁজে পান নি। এলবার্ট আইনস্টাইনেরও নিজের হঠকারিতার জন্য লজ্জা

আর মনস্তাপ ছিল। মিটমাট হতে দেরী হয়নি, যদিও লিগ মিটমাটের জন্য আগেই এগিয়ে আসে।

দ্বিতীয় পদত্যাগপত্র তিনি পেশ করলেন স্পেন থেকে ফিরে এসে ;—জার্মানির অবস্থার সরজমিনে তদন্ত তখনো করেননি। জার্মানির অপমানের তিনি শরিক ; কারণ তাঁর পরিভ্রমণের কালে প্যালেস্টাইন ছাড়া সর্বত্র তিনি জার্মান বিজ্ঞানী। ১৯২৩ সালে তিনি নিজেকে জার্মান ভাবছেন—জার্মানির ব্যর্থতার গ্লানি তাঁকে মুহ্যমান করছে ; অন্যদিকে ফ্রান্সের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে লিগের অসফল অনুশাসন, লিগের বন্ধ্যাত্ব তিনি মেনে নিতে পারেন না ; ফ্রান্সের অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ লিগ থেকে পদত্যাগের রূপে দেখা দিল।

পদত্যাগপত্র পাবার আগেই খবর কাগজে আইনস্টাইনের পদত্যাগের চিঠির প্রকাশ দেখে লিগ বিস্মিত। তাঁর চিঠির জবাবে লিগের মুখপাত্র হিসেবে সচিব কমোরট একটি চিঠি আইনস্টাইনকে লেখেন। লিখলেন, তাঁর পদত্যাগপত্র পেয়ে তাঁরা বিচলিত, তার চেয়েও তাঁরা বিস্মিত লিগের প্রতি আইনস্টাইনের দোষারোপের বিকৃত পদ্ধতির বিকট রূপ দেখে। বিবাদীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হলো না, তার বক্তব্য শোনা হলো না, অথচ বিচারক এবং বাদী একযোগে তাকে দোষী বলে ঘোষণা করলেন! কমোরট বলেন, মানবদরদী বুদ্ধিজীবীদের ধারণা ছিল,

"বুদ্ধিজীবীদের সহযোগিতা কমিটির কাজে আপনার সাহচর্য সঠিক পথ জানাবে। মানবহিতৈষী সকলের সহায়তা ছাড়া লিগ অফ নেশন তার কর্তব্যকর্ম করতে পারে না—এটা জানা ছিল বলেই আপনার মত একজন প্রথিতযশা খ্যাতনামা ব্যক্তিকে সঙ্গে পেয়ে লিগ সুখী ছিল। তারা আজ সত্যি অসুখী।"

আইনস্টাইনকে ফিরে পেলে লিগ খুশি হবে—সেদিনের আশায় অপেক্ষা করে থাকবে লিগ!

এই চিঠির একটি প্রত্যুত্তর পাঠান আইনস্টাইন। লেখেন,

"আপনার প্রীতিপূর্ণ চিঠির উত্তর দিতেই হবে, নইলে আমার আচরণ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার অবকাশ থেকে যাচ্ছে······আমার অভিজ্ঞতা এই যে সবদিক দিয়ে কমিশন আন্তর্জাতিক সম্বন্ধের উন্নতির জন্য কোনরকম গুরুতর প্রচেষ্টার জন্য আগ্রহী নয়। কমিশনকে বরং 'ভয়ঙ্কর ও বন্য' এই আখ্যার প্রতীক বলে মনে হয়।······সত্য কথা বলতে কি, সবশক্তি দিয়ে রাষ্ট্রশক্তির ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক সালিসী ও নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার প্রতিষ্ঠার জন্য আমি কাজ করতে চাই—এই বাসনা আমার মনে উদগ্র হয়ে দেখা দিবার দরুন আমি কমিশনের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের তাগিদ প্রবলভাবে অনুভব করছি······কোন দেশের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এবং কমিশনের সঙ্গে একমাত্র যোগসূত্র হিসাবে প্রত্যেক দেশে একটি করে জাতীয় কমিশন গঠন করে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর অনুষ্ঠিত উৎপীড়নকে পরোক্ষে কমিশন সমর্থন জানিয়েছে—সজ্ঞানে সাংস্কৃতিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে জাতীয় সংখ্যালঘুদের সংগ্রামকে নৈতিক সমর্থন জানানোর কর্তব্যে জলাঞ্জলি দিয়েছে······বিভিন্ন দেশে প্রচলিত সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদ

মূলক ও জঙ্গীধাঁচের শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে কমিটি যে মনোভাব দেখিয়েছে তা এতই মৃদু যে এধরনের মৌলিক গুরুত্বের বিষয়ে কমিশনের কাছ থেকে কোনরকম সক্রিয় চেষ্টা আশা করা যায় না।......যেসব ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক সংহতির সপক্ষে ও যুদ্ধাগ্রহী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য নিঃশেষে নিজেদের উৎসর্গ করেছেন, কমিশন তাদের নৈতিক সমর্থনদানে নিঃসন্দেহে কর্তব্যচ্যুত ......যে মনোভাবকে উৎসাহিত করা দরকার তার বিরুদ্ধপক্ষীয়দের সদস্যরূপে নিয়োগ করার প্রতিরোধে কমিশন কখনো সচেষ্ট হয় নি।"

সংহতি, দলবদ্ধ কাজের রীতি, বিজ্ঞানের সমস্যা পূরণে এদের আইনস্টাইন বেছে নেননি। তিনি একাকী কাজ করার পক্ষপাতী। তিনি মনে প্রাণে স্বাতন্ত্র্যবাদী। কমিশনটি ভ্রূণ অবস্থায় যে দুর্যোগের ভিতর দিয়ে চলেছে সেটিকে সম্যকভাবে বিচার বা ধারণা করার ইচ্ছা আইনস্টাইনের ছিল না। রাষ্ট্র ব্যবস্থার ঊর্ধ্বে একটি আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ সংস্থা সৃষ্টির স্বপ্ন তাঁর চোখে,—সেই সৃষ্টিটি একজনের উদ্যমে হয় কিনা তাঁর জানা নেই, জানা নেই সঠিক পথের নিশানা, তার গাণিতিক রূপ, সাংখ্যায়নিক ভাবধারায় গড়া সেই আকৃতি বা গঠন। বিশ্বলোকের রহস্য উদ্‌ঘাটনের মত বিশ্ব সংস্থা তাঁর স্বপ্নের, তাঁর কামনার,—এটি না পেলে, মানুষের সঠিক মূল্যায়ন হয় না। যাঁরা এর সৃষ্টির বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তিনি তাঁদের সহযোগিতা চান না। তিনি সঙ্গী চান না। লিগকে ছাড়ছেন তিনি ; অন্যদিকে যার অপমান ও বঞ্চনার জ্বালায় তিনি ক্ষুব্ধ, সে জার্মানি তাঁর মনের কাছ থেকে অনেক দূরের।

মাদ্রিদের ভাষণের ফলে আইনস্টাইন জার্মানির একাংশের কাছে কম্যুনিষ্ট বলে চিহ্নিত। রাথেনিউ-এর বন্ধু ইহুদি ও কম্যুনিস্ট আইনস্টাইনকে হত্যা করার শাসানি শোনা যায়। ৭ই নভেম্বর ১৯২৩ সালে আইনস্টাইন জার্মানি ছেড়ে সহসা লেইডনে চলে আসেন ; এই চলে আসার নানা ব্যাখ্যা শোনা যায় ; একটি প্রচলিত ব্যাখ্যা হলো, আইনস্টাইনকে হত্যা করার হুমকি। যা' হোক প্লাঙ্কের অনুরোধে তিনি জার্মানিতে আবার ফিরে আসেন। মনের দিকে নিঃসঙ্গ আইনস্টাইন ;—ইহুদিদের সঙ্গে একাত্ম নন, শান্তিবাদী বুদ্ধিজীবীদের সহযোগিতার কমিশন ত্যাগ করে এসেছেন ; জার্মান হতে চান, সম্পূর্ণ জার্মান হ'তে পারছেন না। অন্যদিকে জার্মানির একাংশের কাছে তিনি গ্রহণযোগ্য নন।

ইহুদিদেরা তাঁকে নিয়ে যে উচ্ছ্বাস, তাঁতে তিনি বিব্রত বোধ করেন। রিলেটিভিটির ব্যাখ্যা করে ইহুদিরা বই লিখে "Hidden secret in Einstein's Theory of Relativity : Spiritualism—আইনস্টাইনের রিলেটিভিটি তত্ত্বের গূঢ় রহস্য : ধর্ম-চেতনা।" অপব্যাখ্যার ফলে জার্মানিতে এন্টি-রিলেটিভিটি দলের হাতে আরো হাতিয়ার জোটে। বন্ধুদের ভালবাসার আধিক্যে তাঁর ভাগ্যে মন্দটাই জোটে। আইনস্টাইন বলেন, "বন্ধুদের হাত থেকে ঈশ্বর আমাকে বাঁচান!"

১৯১৭ সাল থেকে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত বাইরের জগতে পরিব্রাজক হয়ে তিনি ঘুরে

বেড়ালেন। 'জিওনিজম, শান্তিবাদ, বাইরের বিজ্ঞানীদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ, আলোচনা, ভাষণ, বক্তৃতা—এরই ফাঁকে ফাঁকে বার্লিনে এসেছেন ; কাইজার ভিলহেলম ইনস্টিট্যুটের বৃহস্পতিবারের সেমিনারে যোগ দিয়েছেন, ছাত্র-গবেষক-শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনায় মেতে উঠেছেন—তাঁর চিন্তার স্বচ্ছতায় ছাত্রেরা মুগ্ধ ; ফিজিক্স তার নখ দর্পণে, জিভের আগায়। অবসর সময় সহকারী লিও শীলার্ড (Leo Szilard)-এর সঙ্গে নতুন যন্ত্র উদ্ভাবন করে পেটেণ্ট নিয়ে বড়লোক হবার স্বপ্ন দেখেন। দুজনে মিলে নতুন ধরণের হীট এক্সচেঞ্জার, আর হীট পাম্পের তত্ত্ব খাড়া করেন। ব্যবসা হয় না—শুধু মুখে সবাইকে বলেন, বিরাট বড়লোক হতে আর দেরী নেই। তাঁদের তত্ত্বে গড়া এই সব হীট এক্সচেঞ্জার আর হীট পাম্পের প্রয়োগ সেকালে হলো না, অনেক পরে নিউক্লিয়ার পাওয়ার স্টেশনে এই যন্ত্রের তত্ত্বের প্রয়োগ হলো।

বাইরের জগতে পালে হাওয়া লাগিয়ে ভেসে যাচ্ছেন—বিজ্ঞান তখন তাঁর অবসর বিনোদনের খেলা। বাইরের আকর্ষণ সাময়িকভাবে তাঁর প্রথম প্রেম বিজ্ঞান থেকে তাঁকে যেন সরিয়ে রেখেছে। নিঃসঙ্গ বিজ্ঞানী অনেকের সঙ্গসুখ ভোগ করেছেন, সাফল্যের মাধুর্য স্বাদের মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ বিরূপতার তিক্ততা উপভোগের আমেজ নষ্ট করছে। নিজের কৃতিত্বের জন্য আছে গর্ব, অহঙ্কার, অহমিকা ; আবার কৃতি হবার জ্বালাও ভোগ করছেন। বিজ্ঞানের তাত্ত্বিকদিকের তিনি সাধক ; কি বিজ্ঞান বা কি জীবনে তাঁর ব্যবহারিক বাস্তব জ্ঞান কম। নিজের ধারণা মত জিওনিজম বা শান্তিবাদের স্বরূপ গড়তে গিয়ে আঘাত পাচ্ছেন ; অবাস্তব স্বপ্নের ইশারায় ভুল করছেন ; বন্ধুরা ভুল বোঝে। অহমিকায় ঘা লাগে আর অভিমান জেগে ওঠে।

এই অভিমান বোধ 'থেকে আরেকবার তিনি তাঁর প্রথম প্রেম, প্রথম আকর্ষণ ফিজিক্সের দিকে চোখ ফেরালেন। আরেকবার তিনি জগৎ সংসার ভুলে একাগ্র বিজ্ঞানী হয়ে উঠলেন। ১৯২৩ সালের শেষ যুগের কথা—বাইরের জগতের আকর্ষণ ভুলে আরেকবার একান্তে বিজ্ঞানের চর্চা করতে শুরু করলেন।

বিজ্ঞান মানে একাগ্রতা, বিশ্বসংসার ভুলে থাকা, নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে কাজে নিমগ্ন হওয়া। এ ঘটনা আগেও ঘটেছে, আবার তার পুনরাবৃত্তি হলো। নতুন যা দেখা গেল,তা তাঁর পোশাকে বীতস্পৃহা। বাইরের জগতে সরকারী-বেসরকারী আসরে আদব-কায়দার সমারোহ তাঁকে সব ফর্মাল বিষয়ে বীতরাগ করে তুলেছিল। ডিনার জ্যাকেট পরতে চান না, পোশাকে টেলের চিন্তা হাস্যকর—বাঁদরের মত লাগে। চুল কাটাতে অনিচ্ছা—চুল কাটতে সময় নষ্ট, অহেতুক অপব্যয়। মোজা পরতে চান না ; দিব্বি মোজা না পরে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যান। এলসা মোজা কেন পরে আসেন নি চুপিচুপি জিজ্ঞেস করলে, উচ্চস্বরে হেসে বলেন, মোজা পরে আসিনি সে কথা তো হোস্টেসকে আগেই জানিয়ে দিয়েছি।—

সিগারের ছাই-এ পোশাকভরা ; যদি কোন পোশাক ইস্ত্রি করে রাখা থাকে, সেটি বাদ দিয়ে ক্রিজহীন পোশাক পরে বাইরে ঘুরে আসবেন। ক্রিজ-ছাড়া পোশাকে বড় আরাম !
আবার বিজ্ঞানের আলোচনা সভায় তিনি বলতে উঠলে দুরূহ বক্তব্য সহজ হয়ে ওঠে। কঠিন প্রশ্নের উত্তর মুহূর্তে বলে দেন। প্লাঙ্ক বলেন, 'আমার উত্তর দিতে সময় লাগবে, আমি আইনস্টাইন নই।' তাঁর ছেলেমানুষী সহকর্মীদের সঙ্গে ; রঙ্গরসিকতায় ফেটে পড়েন আলোচনা সভায়। অট্টহাস্যে নিজেই হেসে উঠছেন, আবার হয়তো গম্ভীর হয়ে বিজ্ঞানের কঠিনতম সমস্যার সমাধানে পরের মুহূর্তে ব্যস্ত। লরেন্স বলেন, 'সব কিছু আইনস্টাইনকে মানায়।'
পটসডামে নতুন অবজারভেটারি তৈরি হয়। নাম রাখা হয় আইনস্টাইন ইনস্টিট্যুট। ফ্রয়েনড্‌লিশ নানাভাবে জার্মান ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিস্টদের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করে ইনস্টিট্যুটটি তৈরীর কাজে লাগেন। রয়েল অবজারভেটরির সঙ্গে মিলে পরে এই প্রতিষ্ঠানটির নাম হয় Institute of Solar Research—সৌর গবেষণা গৃহ। একটি টাওয়ার তৈরী হয়—আইনস্টাইনের নামে এই টাওয়ারের নাম। আর্কিটেক্ট মেণ্ডালেসন নতুন স্থাপত্যের নকশা ইনস্টিট্যুটির অঙ্গে প্রত্যঙ্গে ফুটিয়ে তোলেন।—আইনস্টাইন সম্মানিত জার্মান বিজ্ঞানী ; এন্টি-রিলেটিভিটির ঢেউ আছে—তবে সবার উপরে আছে একটি সর্বজনশ্রদ্ধেয় প্রিয় নাম—এলবার্ট আইনস্টাইন।
১৯২৩ সালে মাদ্রিদ থেকে ফিরে এসে সুখবর শোনেন। ক্রিসমাস আইল্যাণ্ডে সূর্যগ্রহণ-কালে সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্বে জানানো তারার অবস্থিতির পার্থক্য মাপতে ফ্রয়েনড্‌লিশ-এর নেতৃত্বে জার্মান বিজ্ঞানী আর ইঞ্জিনিয়ারের দল হাজির। পটাসডামে তৈরি করা নতুন ধরনের যন্ত্রপাতি—মাপের হিসেবে এখানে ভুলের সম্ভাবনা কম। তারাদের অবস্থান মেপে যে ফল পাওয়া গেল তা আইনস্টাইনের বলা আলোর বাঁকের কাছাকাছি। আইন-স্টাইনের বক্তব্য আরেকবার প্রমাণিত হলো। এডিংটন বললেন, "বারবার তিনবার তারারা জানালো স্বীকৃতি, আর সংশয় কেন?"—বিজ্ঞান আবার মর্যাদা আনে—যে বিজ্ঞান তাঁর প্রিয়, তাঁর আত্মার সঙ্গী। আরেকবার শুরু হয় সত্যকে জানার চেষ্টা, সত্যকে খোঁজা।
১৯১১ সালে নীয়েল বোর ইলেকট্রনের অবস্থান নির্দেশ করতে গিয়ে রাদারফোর্ডের তথ্য-ভিত্তিক মডেলের কিছু পরিবর্তন এনেছিলেন, এনেছিলেন স্থির কক্ষের ধারণা। ইলেকট্রনরা এই স্থির কক্ষে থাকলে তাদের শক্তির হেরফের হবে না। এক স্থির কক্ষ থেকে আরেক স্থির কক্ষে ঝাঁপ দিতে গেলে শক্তির যে তারতম্য ঘটে সেই শক্তিটুকু বর্ণালির আকারে বাইরে বেরিয়ে আসবে। প্লাঙ্ক-আইনস্টাইনের গণিতের ছকে বোর তাঁর উপপত্তির গাণিতিক ছক দিলেন। এখানেও প্রয়োগ হলো প্লাঙ্কের ধ্রুবক h এবং কোয়ান্টাম তত্ত্বের।

আইনস্টাইন এর আগে আলোর কণাতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন ; জানিয়েছেন আলো কণা এবং তরঙ্গ—দুই ; তবে দুটিকে একসূত্রে বাঁধার জন্য তিনি যে গণিতের ইঙ্গিত দিয়েছেন, সেটি সম্পূর্ণ নয় ; তখনো কণার দ্বৈতরূপের সুসংহত রূপ প্রকাশ করা যায় নি। ইতিমধ্যে ১৯২৩ সালে আর্থার কম্পটন এক্স-রের ছড়িয়ে পড়ার ছবি দেখে যা দেখলেন সেটি এক্স-রের তরঙ্গাকারের ব্যাবর্তন শুধু নয়, অনেক জায়গায় তরঙ্গের ঢেউ এ-গড়া ঝিল্লির ফাঁকে ফাঁকে, বাইরে থাকে কিছু অসঙ্গতি। এই অসঙ্গতির ব্যাখ্যায় একটা কারণ পাওয়া যায়—ছড়িয়ে পড়া এক্স-রের ছবির কিছু অংশে আছে কণায় কণায় ঠোকাঠুকি হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাওয়া। ঢেউয়ের মিলনে গড়া ঝিল্লি আর কণায় কণায় ঠোকাঠুকি হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাওয়া দুটিকেই দেখা গেল এক্স-রের ছড়িয়ে পড়া ছবির ব্যাখ্যায়। কণা ও তরঙ্গ রূপ বিদ্যুৎ-চুম্বক শক্তিতে গড়া সব তরঙ্গেই পাওয়া যাবে। এখানে তরঙ্গের নিরঙ্কুশতা থাকে না ; সব বিদ্যুৎচুম্বক শক্তি-তরঙ্গে আছে আলোর মত কণা। পরীক্ষায় পাওয়া তথ্যের বিশ্লেষণে তত্ত্ব গড়ে তোলার জন্য দরকার অন্য বিজ্ঞানীদের যাঁরা ম্যাক্সওয়েল, প্লাঙ্ক, আইনস্টাইনের উত্তরসূরী।

নতুন একদল:তাত্ত্বিক বিজ্ঞানীদের দেখা পাওয়া গেল। সবার আগে এলেন ভিক্টর পিয়ের রেমঁদ প্রিন্স দ্য ব্রলী—ত্রিশ বছরের ফরাসী রাজ পরিবারের বনেদী এক বিজ্ঞানী, প্রথম সলভে কনফারেন্সের অন্যতম যুগ্মসচিব দ্য ব্রলীর ছোট ভাই। প্রথম মহাযুদ্ধে যোগ দেবার জন্য পড়াশোনা কিছুদিন বন্ধ ছিল। যুদ্ধ শেষে পেছনে ফেলে আসা চিন্তার সূত্রটি আবার হাতে টেনে নিলেন—চিন্তা এটমে কেন স্থির কক্ষ থাকবে ? বোরের উপপত্তির সঠিক ব্যাখ্যা কি ? আইনস্টাইনের মত দ্য ব্রলীও বিশ্বের একত্বে বিশ্বাসী। কণা-তরঙ্গ রূপ শুধু যে আলোতে থাকবে এ ধারণা সমগ্র বিশ্বের একীভূত নিয়মের পরিপন্থী ; বেনিয়ম থাকতে পারে না। যে নিয়ম আলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সে নিয়ম বা রূপের কাঠামো জড় পদার্থ বা মেটারে থাকবে। দ্য ব্রলী বললেন, প্রকৃতির সব বস্তু কণা ও তরঙ্গ দিয়ে গড়া। আলো শুধু তরঙ্গ নয় ; জড়বস্তু বা মেটার, যেমন ইলেকট্রন বা প্রোটন, এরা কণা শুধু নয়,—আলোর আছে কণারূপ আর মেটারে আছে তরঙ্গভঙ্গী। বিশ্বচরাচরের সব কিছুর মূলে আছে দ্বৈত আকৃতি ; আছে কণা, আছে তরঙ্গরূপ। দ্য ব্রলী কণার তরঙ্গভঙ্গীতে তারযন্ত্রের কম্পনের সাযুজ্যবোধের ধারণা আনলেন। এক একটি সুরের কম্পনে নির্দিষ্ট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য থাকে, তরঙ্গের দৈর্ঘ্য ও রূপের উপর সুরের শুদ্ধতা নির্ভর করে। বোরের স্থির কক্ষের শুদ্ধ-পবিত্র ধ্যানের ব্যাখ্যায় দ্য ব্রলী বললেন, স্থির কক্ষ হচ্ছে সেই কক্ষ যেখানে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের কোন ভগ্নাংশ থাকে না। একজাতীয় তরঙ্গ এক বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে নির্দিষ্ট উচ্চাবচ রূপ নিয়ে কক্ষটি পরিভ্রমণ করে সেই এক বিন্দুতে একইরূপে ফিরে আসবে। কক্ষের পরিসীমাকে নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্য দিয়ে ভাগ করলে, ভাগফল পূর্ণ সংখ্যা হবে, অবশিষ্ট কিছু

থাকবে না। পূর্ণ সংখ্যা জানাবে স্থির কক্ষের নিয়ম। বোরের ইলেকট্রনের শক্তিকণারূপ দ্য ব্রলীর হাতে শক্তিতরঙ্গ রূপেও সেজে দাঁড়ায়।

দ্য ব্রলী তাঁর রিসার্চে পেপারটি তাঁর শিক্ষক, আইনস্টাইনের সুহৃদ পল লাজে'ভ্যাঁ'র কাছে পেশ করলেন। লাজে'ভ্যাঁ থিসিসটির বক্তব্যের নতুনত্বে চমকিত হয়ে এর আরেকটি কপি বার্লিনে এলবার্ট আইনস্টাইনের কাছে পাঠালেন। আইনস্টাইন এটি পড়ে সচকিত হয়ে মাক্স বোর্নকে বললেন, "পড়ে দেখ, মনে হয় পাগলের প্রলাপ, তবু কি সুদৃঢ় যুক্তি।"

ঘটনাটি ঘটে ১৯২৪ সালে। এর কিছু আগে ভারতীয় বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্লাঙ্কের কোয়াণ্টা গণিতের ব্যাখ্যায় সাংখ্যায়নিক রীতি প্রয়োগ করে একটি তত্ত্ব প্রকাশ করেন, "Plank's Law and Hypothesis of light-quanta—আলোর কেয়োণ্টা সম্পর্কে প্লাঙ্কের নিয়ম ও উপপত্তি।" প্রফেসর বসু তাঁর তত্ত্বটি পাঠালেন আইনস্টাইনের কাছে—আইনস্টাইন তত্ত্বটি পড়ে চমৎকৃত হয়ে সমগ্র পেপারটি নিজে জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করলেন, তলায় ফুটনোটে লিখলেন, 'এ তত্ত্বের প্রয়োগের বিরাট সম্ভাবনা—আমি পরে এবিষয়ে আলোচনা করছি।' ১৯২৪ সালে বসুর তত্ত্বের বিস্তৃতি ঘটিয়ে আইনস্টাইন দুটি পেপার প্রকাশ করলেন—বোস-আইনস্টাইন স্ট্যাটিসটিকস-এর সৃষ্টি হলো। বোসের কণাবাদ আর দ্য ব্রলীর তরঙ্গবাদ এ দুটিকে একসূত্রে গাঁথার ইঙ্গিত দিলেন দ্বিতীয় পেপারটিতে, আলো যেখানে কণা, আলো যেখানে তরঙ্গ। ১৯২৬ সালে আলোর কণায় আইনস্টাইনের দেওয়া নাম Light arrow বা আলোর তীরের পরিবর্তন হলো আমেরিকার কেমিস্ট গিলবার্ট নিউটন লুইসের হাতে—আলোর কোয়াণ্টার, শক্তি-কণার নতুন নাম হলো ফোটন।

দ্য ব্রলীর পেপারটির প্রচার করলেন আইনস্টাইন। মাক্সবোর্নের সহকর্মী গটেনগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বিজ্ঞানী শ্রোয়েডিঞ্জারকে দ্য ব্রলীর তত্ত্বটি পড়তে দিলেন। দ্য ব্রলীর তত্ত্বের ভিত্তির উপর দাঁড়ালো শ্রোয়েডিঞ্জারের ওয়েভ মেকানিক্স। সেই একই ১৯২৬ সালে। শ্রোয়েডিঞ্জারের বয়স তখন ৩৭।

অন্যদিকে ১৯০১ সালে যাঁর জন্ম, এমন একজন তরুণ বিজ্ঞানী ১৯২৪-২৫ সালে প্রকৃতির নিয়মের দ্বৈত রূপ ভাবছেন। তিনি হাইসেনবার্গ। বিভিন্ন মূল পদার্থের বর্ণালির রেখা আবিষ্কার হয়েছে ; এরা হলো পলাতক আসামীর আঙুলের ছাপের মতো মূল পদার্থের বিশেষত্বের দ্যোতক। আইনস্টাইনের শিক্ষাগুরু মাক-এর তত্ত্বকে অনুসরণ করে প্রকৃতির রাজ্যে প্রপঞ্চময় ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে হাইসেনবার্গ একটি গণিত তৈরি করলেন—যে গণিত ম্যাট্রিক্স রীতিতে গড়া ; কোয়াণ্টার সম্ভাবনাময় রূপ এই গণিতের কাঠামোয় ধরা পড়ে। মুখের ভাষায় বিজ্ঞানের তত্ত্বের বর্ণনা দেবার পালা যেন শেষ হলো, রূপের বর্ণনা হলো গণিতভিত্তিক। এটিও ঘটে ১৯২৬ সালে।

বোরের কণার ঝাঁপের কথা ভাবতে গিয়ে দেখা গেছে, এককক্ষ থেকে আরেক কক্ষে যাবার সময় কণার কিছুটা যাত্রা আছে—যেমন কেঙারুরা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় লাফিয়ে যাবার সময় কিছুটা পথ শূন্যে ভর করে যায়। এই দুটি কক্ষের মাঝে লাফের সময় কণার চরিত্র কি? এই চরিত্রটি বুঝতে গিয়ে শ্রোয়েডিঙ্গার ভাবলেন, ছড়িয়ে থাকা মেঘের মত কণার আকৃতি—তার এক কক্ষ থেকে আরেক কক্ষে যাত্রার সময় চেনাজানা ঢিলের আদল মনে আসে না। মেঘের মত ছড়িয়ে থাকা শক্তি-কণাকে যে গাণিতিক নিয়মে ধরা যাবে তার অর্থ তখনো পরিষ্কার নয়। অন্যদিকে হাইসেনবার্গ এই যাত্রা পথের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বললেন, কণার অবস্থিতি একটি কক্ষের শুরু-শেষ ও আরেকটি কক্ষের শুরু-শেষ এই অঞ্চলের যে কোন জায়গায় থাকবে। যেমন দাবা খেলা—গুটির চালের কতগুলো নিয়ম আছে, সেই নিয়ম দাবা খেলার নিয়ম, তার নিজস্ব। দাবার ঘরে গুটিদের যাতায়াত বোঝান হয় যাত্রা শুরু আর যাত্রা শেষের সংখ্যা দিয়ে। এখানে, ইলেকট্রন প্রোটনের জগতে, একই রীতি। ইলেকট্রনের যাত্রাপথ শূন্যে ঝাঁপ দেবার সময় নিউটনের ট্রাজেকটরির মত ধনুকের বাঁকে বোঝান যাবে না; এই লাফ বা যাতায়াত নির্দিষ্ট কয়েকটি নিয়মে হবে, যেমন দাবার গুটির চাল; আর এই গতি বা স্থান পরিবর্তন বোঝা যাবে ইলেকট্রনের প্রথম ও শেষ অবস্থানের সাপেক্ষে।

দুটি তত্ত্ব, শ্রোয়েডিঙ্গারের ওয়েভ মেকানিক্স এবং হাইসেনবার্গের ম্যাট্রিক্সের ছক পাওয়া গেল ১৯২৬ সালে। আরো জানা গেল, সাব-এটমিক জগতে কোন কণার ভর বা অবস্থান দুটিকে একত্রে নিশ্চিতে জানা যাবে না। একটিকে স্থির জানা গেলে, অন্যটি অনিশ্চিত হবে। এই সংশয়ে ভরা অনিশ্চয় তত্ত্ব বা অনিশ্চয়তাবাদ হাইসেনবার্গ প্রচার করলেন। ফিজিক্স ধোঁয়াশার ভরে ওঠে, পথের নিশানা পাওয়া যায় না। বিজ্ঞানীরা সাব-এটমিক জগতকে বুঝতে চেয়ে অনিশ্চয়তার গহ্বরে পড়েন।

ম্যাক্সবোর্ন এদিকে শ্রোয়েডিঙ্গারের তরঙ্গবৃত্তি আর হাইসেনবার্গের ম্যাট্রিক্স গণিতের ছক—এদুটিকে সম্ভাবনার তরঙ্গের (Probability waves) নিয়মে বাঁধেন। তাঁর ব্যাখ্যা হলো অনেক ঘটনা থেকে যেমন তেমন ভাবে বেছে নেওয়া কয়েকটা জিনিসের গুণাবলী থেকে সবকটা জিনিসের গুণবর্ণনা করা। সম্ভাবনাকে প্রতিষ্ঠিত করে নিশ্চিতকে বুঝতে চাওয়া। সাব-এটমিক জগতে সম্ভাবনার সূত্রে যা দেখতে চাওয়া যাবে, সেটি নিশ্চিত বোঝা যাবে—হয় বোঝা যাবে অবস্থান, নয় বোঝা যাবে ভরবেগ। দ্বৈতসত্তা কণা-তরঙ্গের দুটিকে একসঙ্গে ভাবা যায় না, বোঝাও যাবে যে কোন একটিকে। অথচ এরা দুটি মিলিয়ে এক।

এই অনিশ্চয়তা আইনস্টাইন মেনেতে পারেন না। সৃষ্টির রাজ্যে বেনিয়ম কেন থাকবে? সত্যকে কেন জানা যাবে না? সৃষ্টিকর্তা গডের এই রসিকতার কোন অর্থ নেই। ঈশ্বর

পাশার দান ফেলছেন না—পাশার দানের সম্ভাবনাকে নিশ্চিতভাবে জানা যাবে অনন্তকালে ; সম্ভাবনার সব চরিত্র জানা গেলে কিছু অনিশ্চয় হতে পারে না। ভগবান মানুষকে নিয়ে জুয়া খেলছেন না। ফিলিপ ফ্রাঙ্ক বলেন, 'chance আর দ্বৈত সত্তা—এদুটিকে ফিজিক্সে আপনি এনেছেন।' আইনস্টাইন বলেন, 'মানি ; রসিকতা ভাল হলেও পুনরাবৃত্তিতে রস গেঁজে যায়, লেবু বেশী চটকালে তা তেতো হয়ে যায়। chance-কে মানা হবে সীমায়িত জ্ঞানের জগতে, সে ধ্রুব নয়। অংশকে কেন সত্য বলে ভাবা হবে? অনিশ্চয়তার জগৎকে সম্পূর্ণ করে না জানলে সার্থকতা কোথায়?'

নীয়েল বোর বলেন, সব জিনিসের দুটো দিক—যেমন কণা বা তরঙ্গ, অবস্থান বা ভরবেগ, তরঙ্গবৃত্তি বা মেট্রিক্স গণিত। এরা পরিপূরক, দুটি মিলিয়ে এক, অথচ দুটিই সত্য ; দুটি ধারণাই নিশ্চিত, অথচ একটিকে জানতে চাইলে অন্যটি অপ্রধান হয়ে দাঁড়ায়। উদাহরণ দিয়ে বোর বলেন,

"যেমন ফুজিয়ামা পাহাড়। সন্ধ্যার গোধুলির আলোতে তার শিখরদেশের শোভা কি বর্ণাঢ্য, কত ভয়ঙ্কর অথচ কত সুন্দর। আবার সকলের আলোর ভোরের শান্ত পরিবেশে সেই একই শিখর শান্তির রাজা যেন—তেমনি শান্ত, নিরুদ্বেগ, মধুর। দুটি রূপ একই শিখরের—দেখার সময়ের জন্য তারা আলাদা। দেখার আলোর উৎসও এক—সে সূর্য। দ্রষ্টার কাছে দুটি অনুভূতি একটি শিখরই জাগাবে—দুটিই বিশিষ্ট, নির্দিষ্ট রূপ ও অনুভূতি—দেখার সময়ের জন্য এরা আলাদা।"

আইনস্টাইনের বক্তব্য, সাজার বাইরেও সে শিখর থাকে ; সূর্যের আলোর সাহায্যে দেখা ছাড়াও সে থাকে, তার অবস্থান আছে, উপস্থিতি আছে, অপরূপ এক রূপ আছে, যা তার নিজের, তার নিজস্ব। কেন তাকে সম্ভাবনায় ধরা যাবে, স্থির করে জানা যাবে না?

ফিজিক্সের তত্ত্বের গোলমাল মেটাতে সলভে কনফারেন্স ডাকা হয়। যুদ্ধের পর আরো তিনটি কনফারেন্স ডাকা হয় ১৯২০ থেকে ১৯২৫ সালের মধ্যে। আমন্ত্রিত হয়েও আইনস্টাইন কনফারেন্সে যোগ দেন না। কারণ অন্যান্য জার্মান-বিজ্ঞানীদের ডাকা হয়নি—তাঁকে আহ্বান করলেই জার্মান বিজ্ঞানের মর্যাদা সম্পূর্ণ হয় না। জার্মান বিজ্ঞান জগতে আইনস্টাইন বিশেষ হলেও, অসাধারণ হলেও, তিনি একমাত্র নন। হল্যাণ্ডের রাজনীতি অন্য দিকে জার্মান বিজ্ঞানীদের গ্রহণ করতে পারছে না। —ইতিমধ্যে জার্মানী লিগ অফ নেশনের সভ্য হয়েছে, অন্য দিকে কোয়াণ্টাম মেকানিক্সের জগতের নতুন রূপ মাক্স বোর্ন-হাইসেনবার্গ-শ্রোয়েডিঙ্গারের তত্ত্বে, গণিতে ফুটে উঠেছে ; এরা প্রাশিয়ান, জার্মান। এদের বাদ দিয়ে নতুন বিজ্ঞানের উপর আলোচনা চলতে পারে না। অতএব পঞ্চম সলভে কনফারেন্সে ১৯২৭ সালে জার্মান বিজ্ঞানীরা আমন্ত্রিত হলেন। ধর্মক্ষেত্রে, সলভে কনফারেন্সে, যুযুৎসুরা সমবেত হলেন। একদিকে প্লাঙ্ক, আইনস্টাইন, লরেন্স, দুইজন ব্রাগ (বাবা-ছেলে), এবং হয়তো বা, দ্য ব্রলী ; অন্যদিকে বোর, বোর্ন, শ্রোয়েডিঙ্গার,

হাইসেনবার্গ, পলডিরাক এবং আইনস্টাইনের বন্ধু এরনফেস্ট। আলোচনার বিষয় "ইলেকট্রন-প্রোটন।"

সাব-এটমিক জগতের অনিশ্চয়তা সংশয় নিয়ে আলোচনা। যুযুধান দুই পক্ষের ভীষ্ম ও অর্জুন হলেন আইনস্টাইন এবং বোর। আইনস্টাইন অনিশ্চয়তার দিশেহারা মতবাদ মানত পারেন না। বোর বলেন, এটি স্বাভাবিক, প্রকৃতির রাজ্যে,সাব-এটমিক জগতে সংশয় আছে, সেটিই স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়ম। অন্য দিকে ক্লাসিকাল মেকানিক্স-এর জগৎ থেকে বহুদূরে দাঁড়িয়ে থাকে কোয়াণ্টাম মেকানিক্স। এটি কি সৃষ্টি ছাড়া ? নতুন জগতের মধ্যে পুরনো জগৎ ঠাঁই পাবে ; একটি নিয়মের বাঁধনে চেনা-জানা সব তথ্যের ব্যাখ্যা প্রয়োজন। কোয়াণ্টার গতিকে ক্লাসিকাস সংজ্ঞায় বা মডেলে-প্রতীকে বোঝান যায় না। ক্লাসিকেল গণিত এবং তার নিয়ম—তার নিজস্ব জগতে প্রতিষ্ঠিত সত্য। এরনফেস্ট নতুন রীতির কথা বললেন। এটলান্টিক সাগর পার হতে যে সব যাত্রীরা আছেন তাদের একটি গ্লোবে ধরা-ছোঁয়ার আকারে আনা যায় না—অনেক গতি, অনেক যাত্রী, অনেক দিক। তবু তরঙ্গের দোলায় জাহাজ যে ভাবেই দুলুক, যাত্রার কালে যাত্রীরা যা করে করুক, সবকিছুর গড় ধরে দেখা যাবে, যাত্রী যেদিকে যেতে চায়, সে যাবে। 'কোয়াণ্টার জগতে সেই নির্দেশনা—এখানে তাদের ভরবেগ বা অবস্থিতি—দুটিকে নিশ্চিতে বুঝি না ; তবু জানি গড়পরতা কষলে, Mean Value নিলে কোয়াণ্টার সংখ্যা ক্ল্যাসিকাল গণিতের সূত্রে জানা যাবে।' অনেক দর্শকের সমাহারে জনতার বিভিন্ন আন্দোলনের গড়ে পাওয়া যাবে আন্দোলনের শৃঙ্খলিত রূপ—অথচ প্রতিটি লোকের নির্দিষ্ট অবস্থান আছে, আছে নির্দিষ্ট ফিরে যাবার দিক ও গতি। একটি ঢেউ বহুজলকণার সৃষ্টি—কণাদের নির্দিষ্ট গতি থাকে—তারা ঢেউ-এর সামনে গতি সৃষ্টি করে না। কণা সৃষ্টি করে ঢেউ ; ঢেউ আনে সামনে গতি যাকে জানা যাবে হাইড্রো-ডাইনামিক্সের নিয়মে। একটি ইলেক্ট্রন—কণা অথবা তরঙ্গ। অনেক ইলেক্ট্রনের মধ্যে পাওয়া যায় কণা-তরঙ্গের রূপের দ্যোতনা। সম্ভাবনার তরঙ্গকেও জানা যাবে কোয়াণ্টাম মেকানিক্স-এর গণিতের ছকে।

আইনস্টাইনের তেজস্ক্রিয় পদার্থের ভেঙে যাবার তত্ত্বের বিস্তৃতি ঘটালেন এরনফেস্ট ; বোরের পরিপূরক-তত্ত্বের প্রমাণ দিলেন। অন্য দিকে মাক্স বোর্ন বলেন, দ্বৈত চরিত্রের ধারণা জীবনে, যেখানে জীবন স্বয়ং দর্শক আবার সে নিজেই অভিনেতা। জীবন যখন দর্শক তখন অভিনেতার অভিনয়ে সে অভিভূত ; যখন সে অভিনেতা সে তখন অভিনীত চরিত্রের রূপায়ণে ব্যস্ত ; সেই চরিত্রটির সে দর্শক। অথচ দুটি মিলিয়ে সে এক, একটি জীবন। একটি টাকার আছে দুটো পিঠ—টাকাটি ছুঁড়লে কোনদিকে পড়বে নিশ্চিন্ত বলা যায় না ; কারণ, টাকাটির অবস্থান, গতি, ভরবেগ, কোথায় ধাক্কা দেওয়া হচ্ছে অথবা বাতাসের কি প্রভাব ইত্যাদি বহু ক্রিয়া কাজ করে। তবু বলা যায় অনেকবার চেষ্টার পর জানা যাবে টাকাটি অর্ধেকবার পড়ে হেডের দিকে, অর্ধেকবার

টেলের দিকে। সম্ভাবনার তরঙ্গে আছে বহু ঘটনার নির্দিষ্ট চারিত্রিক বিশেষত্ব। সম্ভাবনার গণিতে জানা যাবে কণা-তরঙ্গের গতি-প্রকৃতি—একটি চরিত্রকে নির্দিষ্ট করে জানা গেলে অন্যটি অপ্রধান হবে। হেড বা টেল দুটিই নির্দিষ্ট, তবু ছোঁড়ার ফলে পাওয়া যাবে হেড বা টেল এবং জানা যাবে বহুবার ছোঁড়ার ফলে এদের প্রাপ্তির সম্ভাবনা অর্ধেক। বিজ্ঞানী ডিরাক স্ট্যাটিসটিকেল ব্যঞ্জনায় কোয়ান্টাম তত্ত্বের অনিশ্চয়তার অর্থ বর্ণনা করেন। বোর্নের বক্তব্য গড়ে উঠল আইনস্টাইনের উপলব্ধি, chance এবং ইনটিউশনের ভিতের উপর। তবুও আইনস্টাইন অনড়!

সৃষ্টির অপার রহস্যের অতি নগণ্য অংশের সন্ধান মানুষের চেতনায় ধরা পড়ে। তার সম্পূর্ণ উপলব্ধি মানব বুদ্ধির অতীত হলেও তাকে নিরন্তর খোঁজার নাম, আইনস্টাইনের মতে, বিজ্ঞান। ব্যক্তির গণ্ডির বাইরে যে জগৎ, তাকে বিজ্ঞানী বুঝতে চায়। বিজ্ঞানে প্রতিটি কার্য 'কি' এটি হয়তো জানা যায় না, যা জানার চেষ্টা করা হয়, সেটি কার্যটি 'কেন' ঘটছে, কি তার হেতু বা কারণ। কার্যকারণের সম্পর্কের রীতিতে বিজ্ঞানী মনোমত প্রতিকৃতি গড়ে তোলার চেষ্টা করে, সেইভাবে সে জানতে চায় কার্যটি কি? 'কেন' প্রশ্নের জবাব খোঁজা হবে; কার্যকরণে পাওয়া উত্তরের সাপেক্ষে গড়া মডেলটি জানাবে 'কি' প্রশ্নের উত্তর। এই যে মডেল, সেই মডেল বা প্রতীক সেটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রপঞ্চের জগতের পরিবেশে গড়ে ওঠে। বিদ্যুতের প্রবাহ বোঝাতে কারেন্টের বা স্রোতের প্রতীক ব্যবহার হলো; আকর্ষণ বিকর্ষণের বিযুক্ত ক্রিয়া বোঝাতে কল্পনা করা হয় ক্ষেত্রের, যে ক্ষেত্রে আকর্ষণ-বিকর্ষণের শক্তি ছড়িয়ে আছে—লাইন অফ ফোর্স বা শক্তির রেখাতে গড়া এই ক্ষেত্র—যেমন জ্যামিতিতে সরলরেখায় গড়ে তোলা হয় ক্ষেত্র বা তল। যে তথ্য পাওয়া যায় তাকে প্রতীকের জগতে সরল সাধাসিধে সুবোধ্য করে নেওয়া হলো বিজ্ঞানীদের চিরন্তন চেষ্টা। প্রপঞ্চের পরিবেশে গড়ে ওঠা প্রতীকের সাহায্যে বিজ্ঞানী বহির্জগতের অতীন্দ্রিয় সত্তার স্বরূপকে ভাষা-গণিতের কাঠামোর বোধিতে মেলাতে চায়। প্রতীকের জগৎ সরল, হয়তো বা নির্ভুল এবং স্পষ্ট। তবু চেতনার বাইরের জগতের উপলব্ধি বা রহস্যকে ভাষা ও প্রতীকে সম্পূর্ণ প্রকাশ করা যায় না। সে প্রকাশ অংশের। যুক্তির বিশ্লেষণ-রীতির ক্রমপরম্পরা ভাষার সীমাবদ্ধতাই প্রকাশ করে। বেকনের লজিক অথবা ন্যায় শাস্ত্র বর্তমান বিজ্ঞানের মূল সোপান—তবু যুক্তি দিয়ে গড়ে তোলা প্রতীক, অংশকে প্রকাশ করে; যুক্তির ব্যাপ্তি এবং বিস্তৃতির জন্য প্রয়োজন ভাষা-অতিরিক্ত আরো একটি হাতিয়ারের—সেটি প্রবল যুক্তিনিষ্ঠ ও যুক্তিবদ্ধ গণিত। পদার্থবিদরা জানেন, যাকে জানতে চাওয়া হবে জিজ্ঞাসুর কাছে তাকে স্পষ্ট হতে হবে, জানা হবে নির্ভুল, তর্করহিত, যুক্তিগ্রাহ্য ও ন্যায়ানুগ। প্রতীকের মডেলের সরলীকৃত রীতি মেনে নিয়েও পদার্থবিদ নির্ভুলত্ব প্রকাশের জন্য গণিতের পরিভাষার জন্য হাত:বাড়িয়েছেন। মুখের ভাষা—চেতনা সম্পর্কিত ভাষা: সে ভাষার দৈন্য চেতনা-অতিরিক্ত জগতের যুক্তিনিষ্ঠ বর্ণনায়। তারই

জন্য প্রয়োজন হলো অন্য একটি ভাষা, যেটি গণিত। গাউস ও ম্যাক্সওয়েল সনাতন বিজ্ঞানে তত্ত্বগুলির বিস্তৃতি ঘটাতে গণিতের প্রয়োগ করলেন—সে গণিতের ফলে তত্ত্বের যে নতুন রূপ পাওয়া গেল, সেটিরও প্রকাশের চেষ্টা ভাষার প্রতীকী চিহ্নে প্রকাশ করা হলো—দেখা গেল প্রকাশ করা যায়। সনাতন বিজ্ঞানে বহির্জগতের নিরপেক্ষ অস্তিত্ব আর কার্যকারণবাদ প্রতিষ্ঠিত, ভাষা ও গণিতের মেল বন্ধনকে নির্ভুল ও স্পষ্ট করে এটি জানাতে পারে।

যুক্তির সংযোজনের বিশ্লেষণ পদ্ধতি এবং ন্যায়শাস্ত্র অনুমোদিত বিকলন পদ্ধতি অনুসারে প্রতিটি ঘটনার কার্যের কারণ জানা সম্ভব, এটি আইনস্টাইনের প্রত্যয়। সনাতন বিজ্ঞানে এ জাতীয় চিন্তা ছিল ; বিজ্ঞানের ভিত্তিতে আছে এই জাতীয় চিন্তা, এই উপলব্ধি। অভিজ্ঞতার নিরিখে প্রচলিত তথ্যগুলি বিচার করার সময় সনাতন বিজ্ঞানীরা কতগুলো স্বতঃসিদ্ধান্তের ধারণা করেছিলেন—এদের প্রয়োগে কার্যকারণের ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। আপেক্ষিকতাবাদের ব্যাখ্যায় প্রচলিত স্বতঃসিদ্ধাগুলির বিস্তৃতি ঘটালেন আইনস্টাইন—অভিজ্ঞতা-বহির্ভূত,উপলব্ধি-সঞ্জাত অন্য একদল স্বতঃসিদ্ধান্তের আকারে এদের দেখা গেল,এরা ভিন্ন হলেও এদের সাহায্যে পুরনো তথ্যের বা তত্ত্বের, ঘটনা বা সত্যের কার্য-কারণ সম্বন্ধের ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে, এবং সম্ভব হবে সেকালীন পরীক্ষায় পাওয়া নতুন তথ্যগুলির কারণ নির্দেশ। সনাতন বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল অভিজ্ঞতার সঙ্গে পুরনো স্বতঃসিদ্ধান্তগুলির ন্যায় সূত্রে গাঁথা ; আইনস্টাইনের নতুন স্বতঃসিদ্ধান্ত এ ধারণার ব্যতিক্রম। যে প্রাথমিক বোধ, উপলব্ধি বা সংজ্ঞা ও প্রত্যয়ের উপর নববিজ্ঞান গড়ে উঠল, মানুষের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সেখানে নিত্যযোগ নেই। উপলব্ধি ও ইনটিউশনের ভিত্তিতে বিজ্ঞানের নতুন প্রতিকৃতির নতুন নির্দেশনা পাওয়া গেল—এখানেও থাকে যুক্তির ক্রমপরম্পরার শৃঙ্খলা, কার্যের সঙ্গে কারণের সম্পর্ক ও নির্দেশ।

আইনস্টাইনের নতুন প্রত্যয়ের যুক্তি হলো যে,প্রকৃতিতে পাওয়া নিয়ম বা বিধান কেবল পরীক্ষায় পাওয়া বা দেখা তথ্যের পরিণাম (Magnitude) বর্ণনা শুধু যে করছে তা নয়, এই বিধানের পরিধিটিও নির্দেশ করছে। আপেক্ষিকতার জগতে আলোর বেগ অনতিক্রম্য। আলোর বেগ সীমাবদ্ধ; সুতরাং এই বেগের সাপেক্ষে গড়া জগৎটির পরিধিটিও নির্দিষ্ট। এই যে আইনস্টাইনের জগৎ, যা কার্যকারণের প্রতীকের সাহায্যে ব্যাখ্যাত হচ্ছে, সেটিও সীমাবদ্ধ। বহির্জগতের স্বরূপ—সেও কি সীমাবদ্ধ? ইনটিউশন ও উপলব্ধিতে পাওয়া স্বাধীনতা—যা প্রত্যয়ের জগতের সীমার বন্ধন ভেঙে ফেলতে সাহায্য করে—তার ভাণ্ডার পরিসর কতদূর? সেকি বাহ্য জগৎ আর বিজ্ঞানীর কল্পনার সাহচর্যে গড়া জগৎ—এই দুই-এর মিলটিকে ভেঙে দেবে? প্রপঞ্চের প্রতীকের জগতে পাওয়া প্রত্যয় ও স্বতঃসিদ্ধান্তগুলি যুক্তি-বিচারে নির্দিষ্ট বিধানে, বা নিয়মে কি জানা যাবে না?

আইনস্টাইন এটি মানতে পারেন না। যুক্তি-বিচারে বর্তমানে সবিশেষভাবে ধরা যায় না ; তবুও একটি অজানা পদ্ধিতিতে, একটি অজ্ঞেয় উপায়ে বর্হিজগৎ আমাদের প্রপঞ্চের ইন্দ্রিয়ের প্রতীক জগতের স্বতঃসিদ্ধান্ত ও প্রত্যয়গুলিকে নির্দিষ্ট করে জানাচ্ছে এ তাঁর বিশ্বাস। এদের জানা যাবে অনুপ্রেরণা আর উপলব্ধি পথে, এদের প্রমাণ করা হবে অভিজ্ঞতাসঞ্জাত সম্ভাবনার সংযোজন এবং বিশ্লেষণে। গণিতের পরিভাষায় যে বিজ্ঞান গড়ে উঠল, সেখানে কোন বিরোধ নেই—পরীক্ষালব্ধ তথ্যগুলিকে সুস্পষ্ট করে এটি জানাচ্ছে ; এখানে সংশয় নেই, নেই দ্বিধা ! আবার ছকে গড়া বিজ্ঞানের জগতের সঙ্গে প্রপঞ্চের আর বর্হির্জগতের মিলে সুসম্বদ্ধতা নেই—সুসামঞ্জস্যতার অভাব থাকে। বিজ্ঞানের গাণিতিক সূত্রগুলিকে বর্হিজগতের বস্তু-সত্তার উপর আরোপ করে দেখতে হবে বর্হির্জগতের ঘটনাবলী আমরা বুঝি কি না। বর্হির্জগতের ঘটনার অবশ্যম্ভাবিতা স্থির প্রত্যয় ; গণিতের সূত্রে সম্ভাবনার আলোচনা শুদ্ধ হলেও এটি বিজ্ঞানের প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়। অনিশ্চয়তায় গড়া গণিতের কাঠামো বহিজর্গতের নিশ্চয়তা-নির্দেশনাকে স্থির করে রাখতে পারে না—এটি আইনস্টাইনের বিশ্বাস !

কার্যকারণের নির্দেশনা খুঁজতে চেয়ে তিনি আলোর কণারূপ খুঁজে পান, তার সম্ভাবনাকে গ্রহণ করেন। ইলেকট্রনের ঝাঁপ শুধু এক কক্ষ থেকে যাবার কালে ঘটে থাকে তা নয়, আইনস্টাইনের মতে ইলেকট্রন তার পুরনো কক্ষেও ফিরে আসে, আসতে পারে। কখন ফিরে আসে, কোন কণাটি ফিরে আসে, তার সম্ভাবনাটি তিনি সুস্পষ্ট জানেন না। মহাবিশ্বের আকৃতির ব্যাখায় সুষমার অভাব দেখে তিনি তাঁর নিজের গণিতের সমাধান মেনে নিতে পারেন নি .—তাঁর গণিতে পাওয়া যায় বর্ধমান বিশ্বলোকের ছবি—সে ছবি মুছে ফেলতে তিনি কনস্ট্যান্ট ব্যবহার করেন। সম্ভাবনার জগৎটিকে সৃষ্টি করে তিনি নিশ্চিত-প্রত্যয় খোঁজেন। বিষম-বিরূপ প্রতিকৃতির নকশা তৈরি করেও তিনি ছাঁচ বদল করবেন !—প্রকৃতি রহস্যময়ী নয়। তাঁর রহস্যে বেঢপ কিছু থাকবে না, থাকবে না সম্ভাবনার অনিশ্চয়তার ছলনা। প্রকৃতি সূক্ষ্ম,তবে তিনি বিদ্বেষপরায়ণ নন। ধরা না দেবার ছলচাতুরি ভেঙে তাকে নিশ্চিত করে জানা যাবে। সেখানে অসঙ্গতি, বৈষম্য বা অনিশ্চয়তা থাকতে পারে না !

হাইসেনবার্গ-শ্রোয়েডিঞ্জারের গণিতে পাওয়া উত্তর শুদ্ধ, সেখানে বিরোধ নেই। তবু এরা ঘটনার অবশ্যম্ভাবিতা স্থির করে বোঝায় না—অজ্ঞেয়কে খোঁজার প্রচেষ্টায় সুস্পষ্ট নির্দেশনা এনে দেয় না। সীমাবদ্ধতার বেড়াজালে প্রতীক বিশ্বলোক আটকে থাকে। সত্যকে স্থির করে জানা কি যাবে ?

এরনফেস্ট এবং বোর বললেন, এই অস্পষ্টতা প্রকৃতির বিধান। তার লুকিয়ে থাকা ছল-চাতুরির খেলায় ধরা পড়ে সম্ভাবনার ছবি। সম্ভাবনার পথে সঠিক পথের নিশানা খুঁজে পাওয়া যাবে। গণিতের ভাষায় সেই নিয়মটি জানা যাবে—এখানে অন্তর্বিরোধ নেই।

অথচ অন্তর্বিরোধে গড়া দ্ব্যর্থবোধে পূর্ণ প্রপঞ্চের মডেলে এটিকে ব্যাখ্যা করা যাবে না। দেখা মানে চোখ দিয়ে দেখা নয়—দেখা উপলব্ধি দিয়ে। কোয়ান্টাম গণিতে আলোর চরিত্রের সীমাবদ্ধতার আদল থাকে। সেখানে যেভাবে দেখা হচ্ছে এবং দেখার জন্য যে যন্ত্র ব্যবহার হচ্ছে তাদের আদান-প্রদানের সূক্ষ্মতার পার্থক্য বোঝা যাবে প্লাঙ্কের ধ্রুবকে। প্লাঙ্কের ধ্রুবক একটি নতুন প্রত্যয়,একটি স্বতঃসিদ্ধান্ত। পারমাণবিক জগতে ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্রের জগতে এই পার্থক্য প্রবল,অথচ প্রপঞ্চের জগতে এই পার্থক্য তুচ্ছ। প্রকৃতি রহস্যময়ী ; সে যখন বিশাল, তাকে ইন্দ্রিয়ের জগতে বোঝা যায় ; সে যখন সূক্ষ্ম, তখন তাকে বোঝা যায় উপলব্ধিতে, নতুন স্বতঃসিদ্ধান্তের সহায়তায়। এই নতুন স্বতঃসিদ্ধান্তটি স্বীকৃতির জন্য পারমাণবিক জগতে অনিশ্চয়তার ধারণা থাকে, কারণ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জগতে প্লাঙ্কের ধ্রুবক তুলনায় তুচ্ছ নয়। পর্যবেক্ষণের যন্ত্রের সাহায্যে সক্রিয় শক্তিকণা কোয়ান্টাকে নির্দেশ করতে গেলে পার্থক্য ধরা পরে—গতি ও অবস্থান দুটিকে স্থির করে জানা যায় না। অতি সূক্ষ্ম পার্থক্য,তবু তাকে ত্যাগ করা যাবে না।

আইনস্টাইন পার্থক্যের ধারণার প্রতিবাদ করেন। যন্ত্রের ও পদ্ধতির সামঞ্জস্য বিধান করতে চেয়ে নতুন নতুন গেডাঙ্কে বা চিন্তাসমীক্ষার কথা তোলেন। আইনস্টাইনের চিন্তাসমীক্ষার ক্রমে বিরোধটি খোঁজার চেষ্টা করেন বোর ; চিন্তা করেন আইনস্টাইনের চিন্তাসমীক্ষার অসঙ্গতি প্রকাশ করতে। আইনস্টাইন ও বোর, দুটি ধারণার ধারক, দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ; দুই মতের, দুটি ধারার প্রতীক হয়ে শ্রদ্ধা, স্নেহ ও আন্তরিকতা নিয়ে হাদ্য পরিবেশে এই দুই বিজ্ঞানী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে গেলেন। নব-বিজ্ঞানের নতুন স্বতঃসিদ্ধান্তের ঘোষণা আইনস্টাইন সম্পূর্ণভাবে মানতে পারছেন না—এখানে অনিশ্চয়তা থাকে ; বিজ্ঞানের ভিত্তিভূমি কঠিনভূমির উপর গড়ে উঠেছে—সেখানে অনিশ্চয়তা নেই। ১৯৩০ সালের ষষ্ঠ সলভে কনফারেন্সেও একই ঘটনা। নতুন যুগের অনিশ্চয়তাবাদী বিজ্ঞানীদের সঙ্গে স্থির প্রত্যয়ী আইনস্টাইনের বনিবনাও হয় না।

বিজ্ঞানী হাইসেনবার্গ নতুন জগতের চিন্তাধারণার কথা ব্যক্ত করেন। প্রপঞ্চময় জগৎ ছাড়িয়ে বিবিধ-সম্বন্ধ রীতিনীতির জগৎ যখন প্রকৃতিবিদ খুঁজতে যায়, সে তার নিজের পরিচিত জগৎকে পেছনে ফেলে যাবে ; তার নিজের চেনা জগৎ সে দেখে একজন পর্বতারোহীর মত উপর থেকে। যত সে উপরে ওঠে, দৃশ্য জগতের পরিধি বিস্তারিত হয়, আর জীবনের স্পন্দন কমে আসে। আরো উপরে, তুষারসীমার কাছে, জীবনের স্পন্দন নেই, নেই শ্বাসক্রিয়ার সুযোগ। সেই সীমা ছাড়িয়ে উপরে উঠলে সে দেখে দৃশ্য-জগতের বিশালত্ব, তার সবিশেষতা, পূর্ণতা। হয়তো, সেই মুহূর্তে, তার কাছে জীবনের ইঙ্গিত দূরে থাকে না। সেই নির্জীব, নিস্তরঙ্গ প্রকৃতির বিশালত্বের মুকুরে তার ফেলে আসা জীবনের আভাস চোখে পড়বে। এই জড়, চেতনাহীন বিশ্বজগৎ নির্দয়, অনন্ত শক্তির রাজ্য নয়, যেখানে দুঃসাহসী অভিযাত্রীর জন্য থাকে আঘাত, নিষ্ঠুরতা। চেতনার জগৎ

ছেড়ে উপলব্ধির জগতের যাত্রাপথে থাকে ভয়ঙ্কর ভয়াল রূপ—তবু সেই উপলব্ধির জগৎ নিষ্ঠুর নয়। জীবনের আভাসে, ইঙ্গিতে বা কল্পনায়, চেতনার জগতের প্রতীক চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে। যা উপলব্ধি করা যাবে, তাকে পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে চেতনার জগতে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে ; যেটি নিত্য সত্য—সেটি পরীক্ষার রীতিতে বাঁধা, অঙ্কের ভাষায় ব্যক্ত। এই উপলব্ধি আর অঙ্কের নিয়মে লেখা, সেওতো আইনস্টাইনের সৃষ্টি! এখানেই আছে সম্ভাবনাময় অনিশ্চয়তা যার নিগূঢ় নির্দেশে ভেসে উঠবে চেনা-জানা জগতের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপ। না। …তবু আইনস্টাইন অনিশ্চয়তা মানতে পারেন না। নিরবচ্ছিন্নতা বা কার্যকারণ-সম্পর্ক ত্যাগ করা তাঁর পছন্দ নয়, অথচ এই পথের ইঙ্গিত তাঁর গবেষণায়, তাঁর তত্ত্বে। নতুন বিজ্ঞানের জনক তিনি, অথচ এই বিজ্ঞানের পিতৃত্ব গ্রহণের দায়িত্বে তাঁর প্রবল অনিচ্ছা!

১৯২৯ সালের অক্টোবরে বললেন,

"কোন কিছুর জন্য ক্রেডিট নিতে আমি চাইনে। শুরু বা শেষ সব কিছু কোন শক্তির ইঙ্গিতে নির্ধারিত —যে শক্তিকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা আমাদের নেই। নক্ষত্র থেকে অতি তুচ্ছ কীট-পতঙ্গেও এই নির্দেশনা. এই নিয়ন্ত্রণ আছে। প্রাণিজগৎ. বৃক্ষরাজি, মানুষ. ধূলিকণা সব কিছু এক অদৃশ্য, বহু দূরগত বংশী-বাদকের রহস্যময় সুরে নেচে চলেছে।'

এই অদৃশ্য বিপুল সুদূর সুরের উৎসটি জানতে হবে। সে জানায় অনিশ্চয়তা থাকতে পারবে না, সংশয় থাকবে না। জানতে হবে স্থির করে। আপেক্ষিক জগৎ আলোর গতির সাপেক্ষে গড়া—সে জগৎ আলোর গতির জন্য সীমাবদ্ধ। এই সীমায়িত জগৎকে নিঃসংশয়ে জানার পর অজানার পরিধিতে পা দেওয়া যাবে—জানা যাবে তখন অজ্ঞেয়, অচেনার সান্নিধ্যের ইসারা। এই খোঁজা আর জানার জগতে সংশয়-অনিশ্চিতি থাকতে পারে না।

১৯২৯ সালে তিনি তার একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব প্রকাশ করলেন। চেষ্টা করলেন মহাকর্ষ আর বিদ্যুৎ-চুম্বক তত্ত্ব মেলাতে। পাউলি বললেন, 'এই মিল খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। বিধাতা যাদের আলাদা করে রেখেছেন, তাদের এক করা মানুষের সাধ্য নয়।'—এডিংটন মনে করেন, সব গরমিলে আছে মিল,—যেমন প্রাণিজগতের একটি বিশেষ জীবের আচার-ব্যবহার ভিন্ন—নানা প্রজাতি নানা গণ ; তবুও সেখানে আছে মিল ; শক্তির উৎপত্তি ক্ষেত্র ভিন্ন হতে পারে, ক্ষেত্রগুলি থেকে বিভিন্ন শক্তির ফসল পাওয়া যেতে পারে ; তবু সব ক্ষেত্র একই বিশ্বের পরিমণ্ডলে বাঁধা ; সেই পরিমণ্ডলটিকে নিশ্চিত করে জানতে হবে, সেখানে ঠাঁই পায় সব বৈপরীত্য-অসঙ্গতি, অসামঞ্জস্য, সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য। সব মিলিয়ে সেখানে গড়ে ওঠে সুষমা। অন্য দিকে, বিজ্ঞানী আর দার্শনিকরা ভাবেন, সব জানা গেলে, মূল সুরের উৎসটি খুঁজে পেলে এ জগৎ-সংসার একঘেয়ে লাগে। যে সম্রাটের আদেশ চরম বা পরম, যাকে উপেক্ষা করা যায় না, যিনি প্রতিবাদের উর্ধ্বে তার। জীবনের

একঘেয়েমি দেখা দেবে জ্ঞানের জগতে। কিছু অজানা থাকা ভাল ; তাতে খোঁজার আনন্দটুকু থাকে—আর থাকে আরো কিছু পাবার আশা।

তবু ১৯২৯ সালে তাঁর পঞ্চাশ বছরে,নতুন পাওয়া তত্ত্ব সারা পৃথিবীতে আলোড়ন তোলে তাঁর পঞ্চাশ বছরের উপহার অনেক বাগানে ফোটানো নানা ফুলে গাঁথা একটি মালা— একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব। একটি শক্তিক্ষেত্র যেটি স্বয়ম, অনিয়ন্ত্রিত --বিশ্বের যাবতীয় শক্তির ক্ষেত্র সেই উৎস থেকে প্রবাহিত। প্রবহমান শক্তির ক্ষেত্রগুলি স্বরাজ্যে সম্রাট,তারা স্বাধীন, স্বতন্ত্র, স্বপ্রধান। নিজের নিজের ক্ষেত্রে যে নিয়ম প্রতিষ্ঠিত সেই নিয়মে ব্যতিক্রম ঘটে না ; যে দিক নির্দিষ্ট, সেই দিকে ভুলচুক হয় না ; যে গতি নির্দিষ্ট সেখানে অসঙ্গতি থাকে না। তবুও প্রতিটি ক্ষেত্রে আপাতপার্থক্য দেখা যায় ; তারাও শক্তিক্ষেত্রটির বিশিষ্ট ফ্রেমে নির্দেশিত নির্ধারিত। আর সব মিলিয়ে জুলিয়ে আছে মূল ক্ষেত্রটি যেটি সিন্ধু-ব্রহ্মপুত্রের উৎস মানস-সরোবর। একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব আইনস্টাইনের মানস সঞ্জাত, তাঁর প্রত্যয়, তাঁর স্থিরজ্ঞান। বিজ্ঞানের যে অখণ্ডতার ধারণা তাঁর অন্তর্লোকে ধরা দিয়েছিল, সেই অখণ্ড সমগ্রের প্রয়োগ তিনি বহির্জগতে করতে চাইলেন। বহির্জগতে দুটি টান, একটি শান্তিবাদ, অন্যটি জিও-নিজম। একটির ক্ষেত্র লিগ অফ নেশন, অন্যটি প্যালেস্টাইনের সদ্যোজাত ইহুদি রাজ্য। লিগ অফ নেশনের সভ্যপদে তিনি আগে ইস্তফা দিয়েছিলেন। হঠকারী ক্রিয়ার জন্য তাঁর অনুতাপ জাগে, লজ্জা দেখা দেয়। এই সময়ে বন্ধুদের সহায়তায় তাঁর জন্য লিগের দ্বার আবার খোলা হয়। এবারে সরকারীভাবে আইনস্টাইন চিঠিপত্রের মাধ্যমে লিগ অফ নেশন এর বৌদ্ধিক সহযোগিতার কমিশনের সভ্য হন। চেয়ারম্যান বার্গসঁ কিছু বক্রোক্তি করে আইনস্টাইনের অন্তর্ভুক্তি ঘোষণা করেন , আইনস্টাইনের সহযোগিতার পরিমিতি সম্বন্ধে কিছু সংশয় পরোক্ষে জানিয়ে বার্গসঁ বলেন,

"তাঁর নিজস্ব বিরাট চিন্তার সঙ্গে যাঁরা একমত, তাঁদের যদি লিগ অফ নেশন কমিটিতে তাঁর উপস্থিতির সুযোগে লিগের আদর্শের দিকে আকর্ষণ করে আনতে পারেন, তা হলে মানবতার সেবায় তিনি এক নতুন ও মহান কাজ করবেন।"

১৯২৪ সালে আইনস্টাইন আবার লিগের সভ্য। সক্রিয় না হলেও গতানুগতিক কাজ করে যান—তবে ১৯২৪সালে তার সময় বিজ্ঞানের জন্য নির্দিষ্ট।

১৯২৫ সালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে যাবার জন্য বিজ্ঞানী মিলিক্যান তাঁকে আমন্ত্রণ করেন। মিলিক্যান আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতত্ব অপ্রমাণ করতে গিয়ে সপক্ষে বহু প্রমাণ জোগাড় করেছিলেন ; কাজের শেষে বিস্ময়ে দেখেন, তিনি আপেক্ষিকতত্ত্বের সুদৃঢ় পৃষ্টপোষক, আইনস্টাইনের ভক্ত। তাঁর ইচ্ছা, আইনস্টাইন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া টেকনিকাল বা ক্যালটেক ইনস্টিট্যুটে যোগ দিন, মহাকাশ গবেষণা আইনস্টাইনের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় পূর্ণ রূপ পাক। আইনস্টাইন যেতে কিছুটা নিমরাজি হন। আর আগের প্রোগ্রাম মোতাবেক দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনা রাজ্যে গেলেন। সেখানে জার্মান-

কলোনির অধিবাসীদের স্বতঃস্ফূর্ত সমাদরে আইনস্টাইন অভিভূত ; বিদেশে জার্মানরা তাদের মধ্যে আইনস্টাইনকে পেয়ে নিজেদের ধন্য মনে করেন—আইনস্টাইন মানে নতুন জার্মানির সংস্কৃতির দূত, আইনস্টাইন নতুন জার্মানির বিজ্ঞানের যাজ্ঞিক। সামরিক শাসন, কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলাবোধে গড়া যে জার্মান জাতিকে তিনি জন্মাবধি দেখেছিলেন, আর্জেন্টিনার জার্মানরা তাদের থেকে যেন আলাদা, অথচ তারাও জার্মান। চমৎকৃত ও কিছুটা হতভম্ব হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে না গিয়ে বার্লিনে আইনস্টাইন ফিরে এলেন।

জার্মানিতে তিনি জার্মান এবং ইহুদি। এক মানব জাতির কল্পনা নিয়ে আইনস্টাইন ইহুদি তত্ত্ব বুঝতে চান। আরবদের সঙ্গে ইহুদিদের সংঘর্ষে তাঁর আপত্তি। দুটি জাতি, যারা বিশ্বমানব জগতের অংশ, তারা কেন আলাদা থাকতে চাইবে? প্রতিবেশী মানে কি যাকে সহ্য করা যায় না? ইহুদি নেতারা বলেন, সংঘর্ষ এড়ানো যাবে না। আইনস্টাইন বিস্ময়ে বলেন, কেন? কেন যাবে না? ১৯২৪ সালে ওয়াইজমানের সঙ্গে ইংলণ্ডে অর্থ-সংগ্রহের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন—১৯২৪ সাল তাঁর কাছে বিজ্ঞানের জন্য। সে সময়ে অন্য চিন্তা ঠাঁই পায় না। আর্জেন্টিনা ঘুরে এসে ভাবেন, ইহুদি-আরবরা একসঙ্গে মিলে-মিশে সহজে থাকতে পারে, ব্যাপারটা পারস্পরিক বোঝাপড়া সমঝোতার উপর নির্ভর করে। গোলমাল বাধায় দু পক্ষের নেতারা। তাঁর ধারণা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সাধারণ লোকেরা মিলেমিশে থাকার পথ ঠিক করতে পারবে—নেতাদের কোন প্রয়োজন নেই!

নিয়ন্ত্রণ বলতে তিনি বোঝেন সেই নিয়ন্ত্রণ যেখানে চিন্তা-মনের অবাধ গতি ; অথচ বিশৃঙ্খলাহীন, শালীনতাবর্জিত নয়। যেন একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব, যেখানে নিয়ন্ত্রণ নিয়মটিকে প্রতিষ্ঠা করে ; যে নিয়মের প্রয়োগ বিশেষ ক্ষেত্রে, বিশেষ পদ্ধতিতে ; যেখানে সব সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যের গড়ে নিয়মটি পাওয়া যাবে। এই নিয়ন্ত্রণের অন্যরূপ দেখে হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে তাঁর ভিন্ন মত। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'গভর্নর' নির্বাচিত হন ১৯২৫ সালে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান জুডা মেগনাস আমেরিকান ; যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর নানা সম্পর্ক, Contact, যাদের সহায়তায় ও দানে বিশ্ববিদ্যালয়টি চলে। দানটি স্বতঃস্ফূর্ত নয়, মেগনাসের নিরবিচ্ছিন্ন চেষ্টা থাকে। ঊষর প্যালেস্টাইনে বিশ্ববিদ্যালয় চালাতে বাইরের সাহায্য দরকার—জুডা মেগনাস সেই আর্থিক সাহায্যের সংগ্রাহক। বিশ্ববিদ্যালয়ে মেগনাসের নিয়োগ এই কারণে অর্থের আগমনের দিকে দৃষ্টি রেখে হয়, তার শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার অভাবটি বেশী মূল্য পায়নি। আইনস্টাইনের আপত্তি এখানে। মেগনাসের কার্যকলাপ প্রায় ডিক্টেটরের মত, শিক্ষকতার জ্ঞান নেই ; সুতরাং ইউনিভার্সিটির হার্দ্য পরিবেশ গড়ে ওঠে কি করে? ওয়াইজমান ১৯২৬ সালে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে বার্লিনে আসেন। আইনস্টাইন তাঁর মতে স্থির। যদি টাকা না থাকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কি দরকার, ছোটখাট বিদ্যাপীঠ হোক ; মূলে গলদ নিয়ে কোন কিছু সৃষ্টি করা নিরর্থক। মেগনাসের ব্যবহারে বিশ্ববিদ্যালয়ের

ক্ষতির পরিমাণের সরজমিনে তদন্ত তিনি করতে চান না, তাঁর সময় অভাব। তবু যা শোনা গেছে তার ভিত্তিতে তিনি মনে করেন মেগনাসের পরিচালন পদ্ধতি সুখকর নয়। গভর্নর হিসেবে গভর্নিং বডির মিটিং ডেকে আলোচনার সূত্রপাত করতে পারেন আইনস্টাইন ; এখানেও তাঁর সময়-অভাব। ওয়াইজমান তাঁকে প্রোসিডিয়র বোঝান, পদ্ধতি বোঝান, অর্থ সংগ্রহের কষ্টকর প্রচেষ্টার কথা বলেন ; তবু আইনস্টাইন নিজের মতে স্থির থাকেন, তিনি একগুঁয়ে অবুঝ। ১৯২৮ সালের ৮ই জানুয়ারি তারিখে গভর্নরের পদ থেকে ইস্তফা দিতে চান ; ছ'মাস টালবাহানা চলে, অবশেষে ২০শে জুন সত্যি সত্যি ইস্তফা দেন। প্যালেস্টাইনের হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্পর্ক কাটান, তবু মূল ইহুদি-জিওনিজমের ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন নন। ১৯২৯ সালের আগস্ট মাসে জিওনিস্ট কংগ্রেসের ষোড়শ অধিবেশনে যোগ দিতে জুরিখে আসেন। বহুদিন পর মিলেভা আর দুই ছেলের সঙ্গে দেখা হয়। ছোট ছেলে এডুয়ার্ড এলবার্ট ১৯ বৎসরের যুবক, অসুস্থ ; বয়স অনুযায়ী বুদ্ধি পরিপক্ব নয়। মিলেভাও অসুস্থ, ৫৪ বছরের প্রৌঢ়। বার্ধক্যের চিহ্ন তাঁর দেহমনে। আইনস্টাইন এই পরিবারের একজন সম্ভ্রান্ত অতিথি। আতিথ্যের রোদের তাপের আমেজটুকু দু পক্ষই উপভোগ করেন, গভীরে কেউ গেলেন না,—ওপরেও রইল না কোন ঢেউয়ের ছাপ!

এই বছরেই আমেরিকার ওয়াল স্ট্রিট ক্র্যাশ হয়—যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির বনিয়াদে ফাটল দেখা দেয়! ডিভ্যালুয়েশন, সাময়িক মুদ্রাসংকট ইত্যাদির জন্য যুক্তরাষ্ট্র থেকে অর্থসংগ্রহের আশা বিনষ্ট হয়। অন্যদিকে ইউরোপে বাণিজ্য-সংকট, অবমূল্যায়ন অর্থসংকট, ডিপ্রেসন। আরব-ইহুদি জাতি প্যালেস্টাইনের যুদ্ধের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকে ; সংঘর্ষ এড়ানোর চেষ্টা চলে, তবু শান্তির প্রচেষ্টাকে মরীচিকা মনে হয়। এদিকে অর্থাভাবে প্যালেস্টাইনের দৈন্যদশা। ১৯৩০ সালের ২৯শে জানুয়ারী আইনস্টাইন বার্লিন সিনাগগে "জু ওয়েলফেয়ার কমিটির' জন্য অর্থ সংগ্রহের কাজে বেহালা বাজান, মাথায় তাঁর ইহুদির কালো টুপি। ১৯৩০ সালের প্রথম মাসে এলবার্ট আইনস্টাইন সুস্পষ্টভাবে নিজেকে ইহুদি বলে ঘোষণা করলেন!

১৯২৪-২৫ সালে আইনস্টাইন কট্টর শান্তিবাদী, এক ইউরোপের প্রবক্তা। জনসাধারণের মনে এমন একটি সংহতি ভাব জাগিয়ে তোলার চেষ্টার কথা বলছেন যা রাষ্ট্রীয় সীমান্তে এসে নিষ্ক্রিয় হবে না। ১৯২৬ বুদ্ধিজীবীদের সহযোগিতা কমিশনের পক্ষ থেকে এক বিবৃতি দিলেন, তাঁর চিন্তার কথা জানালেন। বললেন,—

> "আমার দুর্ভাগ্য, আমি যে সব দেশের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত সেখানে, স্বীকার করি, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের তুলনায় শিল্পী-সমাজ এবং জ্ঞানী-ব্যক্তিরা বেশী মাত্রার সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের মনোবৃত্তি দিয়ে পরিচালিত।"

আইনস্টাইনের এই বক্তব্য তাঁর নিজস্ব, লিগের নয়। অন্যদিকে, নিজের দেখার দোষে,

শিল্পী-জ্ঞানী-গুণী-সমাজ বিকৃত চেহারা নেয়। লিগ অফ নেশন-এর কর্তা-স্থানীয় গিলবার্ট মুর আইনস্টাইনের হঠাৎ উৎসাহ, হঠাৎ অবসাদ এই মুড নিয়ে চিন্তিত। বিজ্ঞানীরা কি মুডি? মুরের এই চিন্তার অন্য উত্তর মাদাম কুরী, লরেন্স বা বার্গস। এঁরা বুদ্ধিজীবী সহযোগিতার কমিশনের সভ্য; এঁরা চিন্তাভাবনায় স্থির, কাজের রীতিনীতি জানেন, মানেন; এঁরা অব্যবস্থিত চিত্তের নন। ব্যতিক্রম শুধু আইনস্টাইন।

কমিশন থেকে একটি সংকলন প্রকাশ করা হয়—A league of minds—বিশিষ্ট বিদগ্ধ গুণিজনের মতামত, প্রবন্ধ ও চিঠির সংগ্রহ। দ্বিতীয় ভল্যুমের জন্য আইনস্টাইনের সাহায্য চাওয়া হয়। আইনস্টাইন ভাবেন, বিশিষ্ট জনের মতামত নয়; বিভিন্ন রাষ্ট্রের নিজস্ব ইতিহাসের শুদ্ধিকরণ হোক। এরই প্রারম্ভিক রূপে শুরু হোক ফরাসী-জার্মান ইতিহাসের নবরূপায়ণ। নব-ইতিহাসের বিশ্লেষণে ফরাসী লাজেঁভ্যা জার্মান ইতিহাস সম্বন্ধে মতামত জানাবেন আর সিগমুণ্ড ফ্রয়েড জানাবেন ফরাসী ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য। দুই শিবিরের, দুই রাষ্ট্রের দুজন বিজ্ঞানী-দার্শনিকের নিরপেক্ষ দৃষ্টির আয়নায় প্রতিবেশী দেশটির ইতিহাসের আড়ম্বর মুক্ত কলেবর দেখা দেবে। আইনস্টাইনের বন্ধু লাজেঁভ্যাঁ এই কাজে অংশী হতে রাজী হলেন না। আইনস্টাইনের অন্য চিন্তা শুরু হয়। যুদ্ধের বিধ্বংসী শক্তি থেকে মানুষকে মুক্ত করার পথ কি আছে?—এ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে বিভিন্ন মনীষীদের কাছে তাঁদের মতামত জানবেন ঠিক করেন। এই শিরোনামায় চিঠি লেখেন ফ্রয়েডকে। অন্য কাউকে অবশ্য আর চিঠি লেখা হয় না।

আইনস্টাইন লেখেন,—

"একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার সৃষ্টি শাসকদের দোষে ব্যাহত হচ্ছে। তাদের যুদ্ধং দেহী মনোভাবের সঙ্গে মিলেছে প্রচার মাধ্যম আর ধর্মের অনুশাসনের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ। মানুষের নিজেদের মধ্যে হিংসা আছে আর আছে লোভ—এরই জন্যই যুদ্ধের প্রকাশ। হয় তো বা, অনুভূতির অবদমনে মনসমীক্ষকের সহায়তা প্রয়োজন হবে।"

উত্তরে ফ্রয়েড দুঃখ করে লেখেন, সারাজীবন তিনি একটি সত্য জানাতে চেয়েছেন, কেউ শোনেনি। তবু জীবন-সায়াহ্নে শান্তির আহ্বানে সাড়া না দিয়ে তিনি পারেন না। শান্তির জন্য একটি আন্তর্জাতিক সালিশির দরকার এটি ঠিকই—আরো প্রয়োজন এই সালিশির সুষ্ঠ প্রয়োগের জন্য শক্তি সঞ্চয়। ফ্রয়েড বলেন, "যুদ্ধ দুভাবে শেষ করা যাবে—একটি হলো মানুষের সাংস্কৃতিক উন্নতির পথে, আর অপরটি হলো যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবিতার ভয়কে সামনে রেখে।" মানুষের মানসিক আর বৌদ্ধিক উন্নতি শান্তিবাদের সহায় - এটি আইনস্টাইন জানেন। জানেন না ভয়ের সঞ্চারকে। ভয়ের, ধর্মের, নৈতিক অবক্ষয় চোখের সামনে থাকে। ভয় দেখিয়ে শান্তি বজায় রাখা সঠিক পথ নয়। ফ্রয়েডের মতে—"

মানব সমাজে সবচেয়ে দুঃখের নিত্যসত্য হচ্ছে যুদ্ধের অথবা হিংসার নিবৃত্তি নেই। প্রায় অতি মানবিক চিন্তার প্রয়োগে, বিশ্লেষণে, এই ইচ্ছা দূরীভূত হয়, নইলে একে দমিয়ে রাখতে পারে একমাত্র

প্রত্যাঘাতের, প্রতিহিংসার ভয়। আক্রমণকারী যদি জানে, যাকে আক্রমণ করা হচ্ছে সে প্রবল, অরক্ষিত নয়—তবে সে সহসা যুদ্ধোন্তমে নামে না। আরো থাকে আক্রমণকারী দেশটিকে অর্থনৈতিক বয়কটের সংকটে ফেলা। দুঃসাহসীকে নিয়ন্ত্রণ করে ভয়, ভয়ঙ্কর ভয়।'

আইনস্টাইন চান, শিক্ষার প্রসার, মনের উন্নতি, একটি অখণ্ড মানব জাতিত্বে একাত্মবোধ। ভয় নয়, যুক্তির বিচারে যুদ্ধকে অগ্রাহ্য করতে হবে। ফ্রয়েডের যুক্তিতেও অখণ্ড শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্বমানবতাবোধের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হচ্ছে। তবু সময়ের বিচারে, ফ্রয়েড জানেন, সে বোধের সৃষ্টি দূরগত। সে পথের যাত্রাসীমায় পৌঁছনোর কালে পথের বাধা দূর করতে দরকার যুদ্ধের আগ্রাসী হাঁ-মুখকে বারবার ঠেকানো—দরকার ভয়ের সৃষ্টি। মনোবিজ্ঞানী যুদ্ধস্পৃহাকে অবদমন করতে ভয়ের ওষুধের প্রয়োগ করতে বললেন।

ফ্রয়েড-আইনস্টাইনের চিঠির সংকলন প্রকাশ হলো "Warum Krieg" বা why war? অথবা "যুদ্ধ কেন" পুস্তিকায় ১৯৩২ সালে। এই বই জার্মানিতে নিষিদ্ধ হলো।

ইতিমধ্যে অনেক জল রাইন নদী দিয়ে বয়ে গেছে।

মিলিক্যান তাঁর আমন্ত্রণ ১৯২৭ ও ১৯২৯ সালে পুনরায় জানালেন। অবশেষে ১৯৩০ সালের ডিসেম্বর মাসে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে আইনস্টাইন গেলেন। এবারেও বন্দরে রিপোর্টারদের সঙ্গে মোলাকাত—দুটো কথায় আপেক্ষিকতত্ত্ব বোঝানোর জন্য জিজ্ঞাসা। এই বারেই সেই বিখ্যাত গল্পটি চালু হলো। আইনস্টাইন, শোনা যায়, বললেন, আপেক্ষিকতাবাদ কি জানেন? জ্বলন্ত উনোনের উপর এক সেকেণ্ড বসলে মনে হয় অনন্তকাল বসে আছি; আর সুন্দরী চটকদার মেয়ের সঙ্গে এক ঘণ্টা সময় কাটালেও মনে হয় এক মুহূর্ত —দেশ-কাল পাত্রে সময় পালটায়!' রিপোর্টাররা ভারি খুশি। কিছু পরে এক নবাগত শিল্পী আইনস্টাইনের একটি স্কেচ আঁকেন; বেশ গম্ভীর ভারিকি বিজ্ঞানী-বিজ্ঞানী চেহারার কেতাদুরস্ত আইনস্টাইন চেয়ারে বসে আছেন। ছবি দেখে আইনস্টাইন ভারি খুশি—দু লাইন কবিতা লিখে নাম সই করে দেন:

Diesse fette satte schwein.	Soll professor Einstein sein!
মোটাসোটা শুয়োর যেটা চেয়ারেতে কাত,	প্রফেসর আইনস্টাইন সে যে নির্ঘাত!

এই যাত্রায় চার্লি চ্যাপলিনের সঙ্গে আলাপ হয়। দুজনে একসঙ্গে ডিনার খান, ছবি তোলেন। তারপর অভ্যর্থনাকারীদের সঙ্গে দেখতে যান All quiet on the Western Front সিনেমাটি। আইনস্টাইন ছবি দেখে অভিভূত!

দেখা হয় প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ভেবলেন (Veblen) এর সঙ্গে; ইনি কিছুদিন আগে বার্লিনে আইনস্টাইনের কাছে একটি অনুরোধ নিয়ে গিয়েছিলেন। আইনস্টাইনের একটি কথা তাঁরা প্রিন্সটনের নতুন তৈরি করা লাউঞ্জে খোদাই করে রাখতে চান; বাক্যটি আইনস্টাইন প্রিন্সটনেই বলেছিলেন; তার ইংরিজি অর্থ: God is subtle but He is not malicious—বিধাতার বিচার সূক্ষ্ম, তবে তিনি বিদ্বেষপরায়ণ নন। আইনস্টাইন

বলেন, এই বাক্যে তিনি গড বলতে প্রকৃতির কথা বলেছেন ; প্রকৃতি তার রহস্য নানা আড়ম্বরে ঢেকে রেখেছে, তবু এখানে কোন কৌশল-চতুরতা নেই।—আইনস্টাইনের মূল কথাটি লাউঞ্জের ফায়ার প্লেস-এর উপর মার্বেল পাথরে খোদাই করে রাখা হলো।

ক্যালটেক ইনস্টিট্যুটে যান, দেখা হয় হাবেলের সঙ্গে। আলোচনা আর পর্যবেক্ষণের পর তিনি তাঁর মহাজাগতিক ধ্রুবক তত্ত্বটি প্রত্যাহার করেন ; প্রত্যাহার করেন সসীম সম্পূর্ণ গোলাকার বিশ্বলোকের ধারণা। আইনস্টাইন বলেন, বিশ্বলোকের ক্রমবর্ধমানতা তিনি মানছেন ; তবু এই বৃদ্ধিরও একটা শেষ থাকে, তারপর বিশ্বলোক ছোট হতে থাকে—এ বিশ্ব স্পন্দনশীল। তাঁর চিন্তার সমর্থনে কোন তথ্য নেই, তবু আছে অনুমান, ধারণা বা idea।

মিলিক্যানের সঙ্গে দেখা হয়। মিলিক্যান বলেন Caltech (ক্যালটেক)-এ যোগ দিতে। আইনস্টাইন ভেবে দেখেন। এরই মধ্যে শান্তির আলোচনায় অংশী হন। শিকাগোতে Peace Delegation-এর সঙ্গে আলাপ করেন। ওয়াইজমানের অনুরোধে প্যালেস্টাইনের জন্য অর্থসংগ্রহের সভায় ভাষণ দেন। আর ডিসেম্বরের শেষে যে বিতর্কিত ভাষণটি দেন সেটি তাঁর দুই পারসেণ্ট ভাষণ নামে বিখ্যাত। আইনস্টাইন বললেন, প্রতি দেশের সামরিক বাহিনীর অন্তত শতকরা দু'ভাগের উচিত হবে যুদ্ধ করতে অস্বীকার করা। এর ফলে যে বিরাট শান্তি-আগ্রহী সৈন্য পাওয়া যাবে এদের মোকাবিলা করতে গিয়ে যুদ্ধআগ্রহী দেশের যুদ্ধ-কামনা নষ্ট হবে। আরো বললেন, 'শান্তিবাদীদের সামরিক কাজে নিয়োগ না করে তাকে তার দেশের বা দশের উন্নতির জন্য কঠিনতম কাজে নিয়োগ করা দরকার।"

এই ভাষণে আইনস্টাইন ফ্রয়েডের যুদ্ধবিরোধী নীতির একটু পরিবর্তন ঘটালেন—ভয় সৃষ্টি হবে বহির্বিশ্বে নয়, যুদ্ধের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে স্বদেশে সৃষ্টি হবে একটি ভীতি যার মোকাবিলা করতে শাসক শ্রেণী হিমসিম খাবে। অতিমানব মানসিকতার প্রারম্ভে গড়ে উঠবে শাসক শ্রেণীকে আঘাত করে দেশের অভ্যন্তরে ভয়, যা এক শ্রেণীর বিপ্লব !

নিজের শান্তিবাদের কথা বলতে গিয়ে আইনস্টাইন একবার বলেছিলেন,

> "মানুষকে হত্যা করার কথা ভাবাও আমার কাছে অসহনীয়। ঘৃণা আর হিংসার বিতৃষ্ণা থেকে-শান্তিবাদ গড়ে উঠেছে। আমি পরিপূর্ণ (absolute) শান্তিবাদী।"

আইনস্টাইনের দু' পারসেণ্ট ভাষনে শাসকশ্রেণীর ক্ষুণ্ন হবার যথেষ্ট কারণ আছে ; এ ছাড়াও সমালোচনা এল সহযোগী শান্তিবাদীদের কাছ থেকে। পরিপূর্ণ শান্তিবাদীরা যুদ্ধে আগ্রহী শাসকশ্রেণীর সঙ্গে কোনরকম সহযোগিতা করবেন না। তাদের অধীনে কোন কাজ করবেন না। অথচ আইনস্টাইনের কল্পনায় বিবেকবান যুদ্ধবিরোধীদের শাসকশ্রেণী অন্য কোন অসামরিক কাজে লাগাতে পারেন; শান্তিবাদীরা মনে করেন, যুদ্ধের সময়ে যে কোন সরকারী কাজ যুদ্ধোদ্যমে সাহায্য করে ; সরকারের সহায়তা মানে সরকারের যুদ্ধোদ্যমে সহায়তা করা।

১৪ই ডিসেম্বর ১৯৩০ সালে ন্যু ইয়র্কের রিৎস কার্লটন হোটলে আইনস্টাইন শতকরা

দুইভাগের যে ভাষণ দিলেন তার ঢেউ বহুদূর বয়ে'গেল। রোম্যা রোল্যাঁর মতে, পরিপূর্ণ শান্তিবাদের পথ থেকে আইনস্টাইন সরে এলেন।

এই ১৯৩০ সালে তিনি বুঝলেন তাঁর একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব নির্ভুল নয়! বিজ্ঞানে তাঁর প্রচেষ্টাতেও গলদ দেখা গেল!

১৯৩০ সালে ষষ্ঠ সলভে কনফারেন্স। এখানেও এক অস্বস্তি। যে যা' দেখতে চায় বা জানতে চায়, সে তাই দেখে; দেখার মধ্য দিয়ে বোঝা যাবে গতিকে অথবা অবস্থানকে। দর্শক, দৃশ্য আর দর্শনের যান্ত্রিক সীমাবদ্ধতা যে কোন একটিকে নিশ্চিত করতে পারছে—অন্যটি সেখানে অনিশ্চিত। এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতির হাঁফ-ধরা আবহাওয়া আইনস্টাইন সহ্য করতে পারছেন না। সমকালীন বিজ্ঞানীদের কাছে গণিতের এই রূপায়ণ গ্রহণীয়, বন্ধু এরনফেস্টও অন্য শিবিরে; তিনি একা।

তবু এরনফেস্ট-এর বন্ধুত্ব তাঁর কাছে বড় সান্ত্বনার, বড় আনন্দের। এরনফেস্টকে লেখা একটি চিঠিতে লিখলেন, "দুজনকে দুজনের জন্য সৃষ্টি করেছে প্রকৃতি। তোমার কাছে আমি যতটা, তার চেয়েও বেশী প্রয়োজন আমার কাছে তোমার বন্ধুত্বের, তোমার সান্নিধ্যের।" বার্লিন থেকে বহুবার তিনি লেইডন-এ গেছেন, গেছেন লেইডনের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কাজে, কখনো বা সুইজারল্যাণ্ড থেকে ফেরত আসার পথে বন্ধুর দরজায়। সুইজারল্যাণ্ডের আহ্বান তিনি কোনদিন ফেরাতে পারেন নি; নিজের দেশ বলতে ভাবেন সুইজারল্যাণ্ডকে। ১৯২৮ সালে ডাভোস শহরে অসুস্থ লোকেদের কাছে বিজ্ঞানের কথা সহজভাবে বলতে তাঁকে অনুরোধ করা হলো। আইনস্টাইন অমনি রাজি। ডাভোসে বক্তৃতা দিলেন আর সেখান থেকে রওনা দিলেন জুয়োৎস-এ (zuoz)। জুয়োৎস ঘুরে লাইপজিগে সিমেন্স আর AEG কোম্পানির বিবাদে সালিশির সাক্ষ্য দিতে যান; লাইপ-জিগ থেকে আবার ফিরে আসেন জুয়োৎস-এ। নিজের মোট চিরকাল নিজে বয়ে নিয়ে এসেছেন; হঠাৎ এইবার মোট বইবার কালে অসুস্থতা বোধ করেন, বুকে একটা ব্যথা দেখা দেয়। অসুস্থতা নিয়ে বার্লিনে ফিরে আসেন। ডাক্তার প্লেশ (Plesch) পরীক্ষা করে হৃৎপিণ্ডের পাশে ধমনী দেয়ালে স্ফিতি দেখেন। তাঁর হৃদপিণ্ড দুর্বল। নুন ছাড়া খাবার আর পরিপূর্ণ বিশ্রাম এই হলো ডাক্তারের উপদেশ। বিশ্রাম নিতে হামবুর্গ শহরের এক বাড়িতে সপরিবারে যান। এখানেই ঠিক হয় নিজের কাজের জন্য একজন সেক্রেটারি রাখার প্রয়োজনীতা। ১৯২৮ সালের ১৩ই এপ্রিল ফ্রাউ হেলেন ডুকাসকে (Helen Dukas) সেক্রেটারি নিয়োগ করেন। এই মহিলাটি সম্পর্কে ওপেনহাইমার সশ্রদ্ধ উক্তি করে গেছেন,

> "তাঁর সচিবের জীবনও ছিল চমৎকার। এক লহমাও তিনি মহৎ ভাবনা বা রসিক বৃত্তি ছাড়া থাকতেন না...তাঁর প্রথম দিকের রচনা খুব সুন্দর হলেও তাতে অনেক ভুলত্রুটি আছে। পরে আর আদৌ এসব থাকত না।'

ওপেনহাইমারের মতে তাঁর রচনার উৎকর্ষের জন্ত তাঁর সহকারী-সচিবের অবদান যথেষ্ট! ১৯২৮ সালে একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বের খসরা প্রস্তুত। সহকারী আর সচিবের সঙ্গে মিলেমিশে কঠিন গণিতভিত্তিক রচনাটির উপর শেষ রূপটান দেওয়া চলেছে। সমস্ত জগৎ আইনস্টাইনের নতুন তত্ত্বের আশায় উন্মুখ। পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হবার আগেই ১৯২৯ সালের জানুয়ারি মাসে তত্ত্বটি প্রকাশ হলো। একজন মানুষ জীবনের অর্ধশত বছর পার করলেন, আর জানালেন সম্পূর্ণ নতুন একটি তত্ত্ব, যার ধারণা বিজ্ঞানে ছিল না। মার্চ মাসে জন্মদিনের লোক সমাগম থেকে দূরে থাকতে চেয়ে চলে গেলেন ডাক্তার প্লেখ-এর মফস্বলের বাড়িতে। জন্মমাসে শুনলেন, প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে অনারারি ডক্টরেট দিল, জার্মানির চেন্সলার তাঁকে জার্মানির মহান সেবক বলে জানালেন, ইহুদিরা প্যালেস্টাইনে তৈরি করল আইনস্টাইন উপবন। উপহার, কবিতা, পুষ্পস্তবক, টেলিগ্রাম ইত্যাদির ভিড়ে একটি উপহার বিশেষত্ব নিয়ে অনন্য হয়ে দাঁড়াল। জার্মান-শ্রমিকরা এক আউন্স তামাক পাঠান, সঙ্গে কার্ডে লেখা, "আপেক্ষিকভাবে কম হলেও ভাল ক্ষেত্রে সংগৃহীত (Relatively small but gathered in good field)।"একীভূত ক্ষেতত্ত্ব প্রতিষ্ঠাতাকে পাঠানো একটি প্রতীক উপহার।

বার্লিন কাউন্সিলের আইনস্টাইনকে একটি বাড়ি উপহার দিবার ইচ্ছা। একটি বাড়ি ঠিক করে কাগজে তার ছবি ছাপিয়ে এই উপহারের কথা ঘোষণা করা হলো। পরে জানা গেল, বাড়িটি নগর কর্তৃপক্ষ দীর্ঘ মেয়াদী লিজে অন্যদের ভাড়া দিয়েছেন আর ভাড়াটেদের বাড়ি ছাড়ার মোটেই ইচ্ছে নেই। তড়িঘড়ি কাউন্সিল আরেকটি জমি আইনস্টাইনকে দেবার কথা জানান। কিছুদিন পরে জানা গেল, ঐ জমিতে বাড়ি তৈরির অনুমতি পাওয়া যাবে না নৈসর্গিক দৃশ্য নষ্ট হবে। অর্থাৎ আইনস্টাইন জমিটি পাবেন, সেখানে কোন বাড়ি করতে পারবেন না, ফাঁকা জমি নিয়ে তাঁকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। আবার সভা হয়, ম্যাপ-নকশা দেখে আরেকটি জমি ঠিক করা হয়; ঘোষণা করাও হলো। এবারের জমিতে কোন বাধ্য-বাধকতা নেই, জমির উপরে বাড়ি করা যাবে! সবাই যখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে চলেছেন, তখন জানা গেল ঐ জমিটির কোন শারীরিক উপস্থিতি নেই। বার্লিনের কাউন্সিল ক্রমশ যেন বিদূষক-ভাঁড়ের চেহারা পাচ্ছেন! অবশেষে ঠিক হলো, আইনস্টাইন বাড়ি দেখবেন, কাউন্সিল টাকা দেবে। এলসা স্বামীকে নিয়ে বাড়ি বা জায়গা খুঁজতে থাকেন। অবশেষে কাপুথ গ্রামে একটা জমি পছন্দ হয়। কাউন্সিল হাঁফ ছাড়েন, দানপত্র তৈরী হতে থাকে; এমন সময় কাউন্সিলের জনৈক ন্যাশনালিস্ট পার্টির সদস্য আইনস্টাইনের দান গ্রহণের যোগ্যতার প্রশ্নের ফ্যাঁকড়া তোলেন। আলোচনা হয়, সময় যায়, টাকা আসে না। বীতশ্রদ্ধ আইনস্টাইন কাউন্সিলের দান নিতে অস্বীকার করেন। যথাসম্ভব নিজের জমানো টাকা দিয়ে জমি কেনেন, ছোট একটি বাড়ি করেন; নদীর ধারে কাপুথ গ্রাম, সেখানে তাঁর গ্রীষ্মাবাস, তাঁর নিজের বাড়ি। বাড়ি থেকে কিছু

দূরে, নদীর ঘাটে, জন্মদিনে পাওয়া তাঁর নৌকোটি বাঁধা। ১৯৩০ সালে বাড়িতে গৃহ-প্রবেশ হলো। এখানে এলেন বহু জ্ঞানী-গুণী-বিদগ্ধ জনেরা আর ১৯৩০ সালে এলেন রবীন্দ্রনাথ।

সত্য আর সুন্দর নিয়ে আলোচনা হলো ; আর আলোচনা হলো অনিশ্চয়তা-আকস্মিকতার জগতের দ্বৈত অস্তিত্বের রূপ ও বিরোধ নিয়ে। রবীন্দ্রনাথ বললেন,

"শুনেছি পরমাণু জগতে আকস্মিকতার স্থান আছে, সেখানে জীবননাট্যের সব কিছু একেবারে পূর্ব নির্ধারিত নয়। সৃষ্টির মূলে যে উপাদানগুলি সেখানে নেই কার্যকারণতত্ত্ব। অন্য কোন শক্তি তাদের নিয়ে একটা সুশৃঙ্খল বিশ্ব গড়ে তোলে।" আইনস্টাইন বললেন, "উঁচু স্তর থেকে এই শৃঙ্খলার স্বরূপ আমরা বোঝার চেষ্টা করি। বড় বড় উপাদানগুলি পরস্পরের সঙ্গে একত্রিত হয়ে যখন জীবন বা অস্তিত্বকে নিয়ন্ত্রণ করে, তখন শৃঙ্খলা দেখা দেয়। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র উপাদানগুলিতে এই শৃঙ্খলা আর অনুভব করা যায় না।" রবীন্দ্রনাথ বললেন, "তা হলে অস্তিত্বের গভীরতম এলাকায় এই দ্বৈত বোধ থাকে। একদিকে অসংযত আবেগ, আরেকদিকে সেই আবেগকে পরিচালনা করে সব বস্তুর মধ্যে একটা বিধিবদ্ধ নিয়ম বা ব্যবস্থা সৃষ্টি করে যে ইচ্ছাশক্তি—এ দুয়ের মধ্যে বিরোধ চলেছে।" আইনস্টাইন জানান, "আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান এই পরস্পরবিরোধিতার কথা স্বীকার করে না। দূর থেকে যাকে মনে হয় মেঘ, কাছে গেলে জানা যায় সেগুলি ইতস্তত ছড়ানো বারি বিন্দু।" রবীন্দ্রনাথ এর তুলনা পান মানুষের মনোরাজ্যে। "বাসনা কামনা অসংযত ; আমাদের চরিত্র সেগুলিকে সংযত করে একটা সুসঙ্গত সমগ্রতা এনে দেয়।...তবু প্রশ্ন থাকে, জড় জগতে এমন কি কিছু ঘটে! উপাদানগুলি কি স্বৈরাচারী ? তারা কি আপন আবেগে চঞ্চল ? সেগুলিকে শাসন করে ? সুনিয়ন্ত্রিত বিধির মধ্যে বেঁধে রাখার কোন শক্তি, বস্তু জগতে কি আছে ?" আইনস্টাইন বলেন, "উপাদানগুলির মধ্যেও আছে গোষ্ঠীগত শৃঙ্খলা (Statistical order)।" রবীন্দ্রনাথের ধারণা, আকস্মিকতা আর পূর্ববিধান এই দুই এর চিরন্তন সঙ্গতির মধ্য দিয়ে আমাদের জীবনলীলা চিরনবীন ও প্রাণবন্ত ! আইনস্টাইনের বিশ্বাস, "আমরা যা কিছু করি, বা যা কিছুর জন্য বেঁচে থাকি সবই কার্য-কারণত্বের অধীন। তবে সব সময়ে সেটা যে দেখা যায় না, তা ভালই।"

উপনিষদের নব্য-ব্যাখ্যাতার কাছে দ্বৈত অস্তিত্ব আর আকস্মিকতা পূর্ব বিধান, অপরিচিত নয়। তাঁর কবি মনের কাছে, মাঝে মাঝে নিয়মের ব্যতিক্রম জীবন ও প্রকৃতিতে দেখা যায় বলেই জীবন এত সুন্দর, সুখের ও আনন্দের। তবু সেই বেনিয়ম বিরাট বিশ্বের শৃঙ্খলার সমুদ্রে একটি ছোট তরঙ্গ মাত্র। তার অস্তিত্ব, ব্যপ্তি সব কিছুই শৃঙ্খলার সাম্রাজ্যে নিহিত। জড়বাদী বিজ্ঞানী জানেন, চেনা জানা নিয়মের বাইরেও থাকে অন্য কাজের ধারা ; তাদের কারণ জানাই বিজ্ঞানের, বিজ্ঞানীর কাজ। সৃষ্টি রাজ্যে প্রতিটি কার্যের কারণ আছে। সে কারণগুলি বিধিবদ্ধ করতে পারলে পাওয়া যাবে একটি সুমহান শৃঙ্খলা। যাকে বিশৃঙ্খলা মনে হয়, অনিশ্চিত বা আকস্মিক মনে হয়, সে অজানা বলেই অজ্ঞেয়। তার কাজের নিয়মটি জানলে, সে আর না-বোঝা থাকে না ; সৃষ্টির রহস্য খোঁজার জগতে অনিশ্চয়তা থাকতে পারে না, আকস্মিকতা নেই।

উপনিষদের ঋষি-কবি রবীন্দ্রনাথ ফরাসী দার্শনিকের সত্যম শিবম সুন্দরমের কথা বললেন আর ইউরোপীয় জড়বাদী বিজ্ঞানী ঘোষণা করলেন, সত্যম শিবম অদ্বৈতম !

১৯৩০ সালে তার একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বে ভুল পেলেন। এক বছরের মধ্যেই জানা গেল, বিচিত্রগামী সর্বত্রগামী শক্তি আর তার ক্ষেত্রকে একটিমাত্র বিধিবদ্ধ নিয়মে বাঁধা গেল না। লেইডনে এরনফেস্ট-এর সঙ্গে আলোচনা করেন, বার্লিনে ফন লাউএ'র সঙ্গে। তবে, একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব গবেষণায় তিনি একা।

লেইডনে এলে এরনফেস্টের বাড়ীতে থাকেন। তার ছেলেদের সাহচর্য ভাল লাগে, আর সবচেয়ে ভাল লাগে অগোছাল হয়ে আরামে থাকতে। এদের কড়াকড়ি নেই, অতিথি অভ্যাগতের সঙ্গে আলাপের বাধ্যবাধকতা নেই। ফ্রাউ এরনফেস্ট নেহাতই অপারগ হয়ে আইনস্টাইনের সাজ পোশাকের ইনফর্মাল রূপ মেনে নিয়েছেন, শুধু আতঙ্কিত হয়ে দেখেন আইনস্টাইন এলে এরনফেস্টও বেশ গা ছেড়ে আলগা হয়ে যান। আইনস্টাইন সংশোধনের বাইরে, ফ্রাউ চান এরনফেস্টকে সামলে রাখতে ; তবে বেশির ভাগ সময় সামলাতে গিয়ে তিনি বেসামাল হয়ে যান, আর দুই বন্ধু অট্টহাস্যে ফেটে পড়েন। এই সামাল দেবার একটা ঘটনা ফ্রাউ তার স্মৃতিতে লিখেছেন। সেদিন ১৯২৯ সালের ২৩শে মে, দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়ার পর দুইবন্ধু পরমানন্দে দিবা-নিদ্রা দিচ্ছেন। এমন সময়ে এক রাজদূত এসে দুই বিজ্ঞানীকে লেইকনে যেতে নিমন্ত্রণ করেন, সেখানে এসেছেন হল্যাণ্ডের রানী, রাজপুত্র আর রাজমাতা, তাঁরা দুজনের সাক্ষাৎ পেলে খুশি হবেন। রাজবাড়ীর নিমন্ত্রণ ; সাজসাজ রব পড়ে। ফ্রাউ এরনফেস্ট দেখেন, আইনস্টাইনের কোন ভাল স্যুট নেই, ইভনিং ড্রেস তো দূরের কথা। আর এরনফেস্ট-এর অবশ্য একটা আছে, তবে সেটা আছে তোরঙ্গেতে মথবলে ঢাকা। কাছাকাছি জানাশোনা বাড়ী থেকে আইনস্টাইনের জন্য ধার করে একটা স্যুট আনা হলো—সেটি আইনস্টাইনের পক্ষে একটু বড় ; অন্যদিকে এরনফেস্ট-এর নিজের স্যুটটি তার বর্তমান চেহারার, আকারের পক্ষে একটু ছোট। তা হোক, সভ্যভব্য পোশাক পরে দুই বন্ধু রাজ-পরিবার দর্শনে গেলেন,নেপথালিনের গন্ধভরপুর দুটি কর্পূরদাস !

তাঁদের দেখে রানী আর রাজমাতা ভারি খুশি। রানী পিয়ানো বেহালা বাজান, আর আইনস্টাইনের আছে বেহালায় দক্ষতা। যাকে তাকে সঙ্গী করে রানী বেহালা-পিয়ানোর বৃন্দবাদ্য বাজাতে পারেন না ; মর্যদায়, বনেদিয়ানায় বাধে। আইনস্টাইন অবশ্য বিজ্ঞান-জগতের একজন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ; বাজনায় তিনি সাথী হতে,পারেন এখানে অমর্যাদা নেই। রাজবাড়ীতে আইনস্টাইনের ঢালাও নিমন্ত্রণ রইল, সেখানে এলে তিনি রাজ-পরিবারের বেহালা বাজানোর সঙ্গী হবেন।

হল্যাণ্ডের রাজ পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কের এই শুরু। ১৯২৯ থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত এই সময়ে বহুবার রাজবাড়ীতে এসেছেন আইনস্টাইন ; রাজা আলবার্ট, রানী এলিজাবেথ, রাজকুমার লিওপোল্ড এবং সবার উপর রাজমাতার সান্নিধ্যে দিন কাটিয়েছেন। যন্ত্রসঙ্গীতে

রানী পিয়ানো বাজান, বেহালায় তার সঙ্গী আইনস্টাইন, আবার কখনো কখনো বাজনায় আইনস্টাইন বেহালার মূল বাজিয়ে, রানী তার দোহারকী, যাকে বলে Second fiddle, রানীর সেই ভূমিকা। বনেদিয়ানা, প্রটোকল, সব কিছু ভেঙে দিয়ে এই রাজ পরিবারটি আইনস্টাইনকে আপন করে নেন—রাজবাড়ী নয়, যেন গ্রামের একটি উচ্চবিত্ত জোতদারের বাড়ীতে এসেছেন আইনস্টাইন—তেমনি সাধারণ, অনাড়ম্বর আন্তরিক ঢিলে-ঢালা ব্যবহার। রাজপরিবারে থাকাকালীন খুঁটিনাটি জানিয়ে এলসাকে চিঠি দেন আর নিজে কতগুলো গল্পের নায়ক হয়ে পড়েন।

স্টেশনে এসে হনহন করে কোনদিকে না তাকিয়ে আইনস্টাইন চলে যান, ক্রিজ হীন, ঢিলে পোষাক, মাথায় খড়ের টুপি, আর হাতে সাকুল্যে একটি বেহালার বাক্স, বড়সড় গোঁফআলা ভবঘুরে চার্লি চ্যাপলিন যেন। রাজবাড়ী থেকে যাঁরা তাঁকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে যেতে আসেন, তাঁরা খোঁজ না পেয়ে, চিনতে না পেরে, ফিরে যান! অন্যদিকে কাছাকাছি সরাইখানা থেকে রাজবাড়ীতে রানীকে ফোন করে আইনস্টাইন বলেন, "আমি এসে গেছি, কি করে যাব? অনেক কষ্টে ফোন করতে পারলাম।" আরেকবার আইনস্টাইনের শরীর খারাপ, ডাক্তার মিষ্টি খেতে বারণ করেছেন; হল্যাণ্ডে যাবার আগে এলসা পই পই করে মাথার দিব্বি দিয়ে খাবার সময় মিষ্টিটা বাদ দিতে বললেন। রাজবাড়ীতে ডিনার, নেহাতই সাধারণ খাবার। মিষ্টি যখন এল, আইনস্টাইন শুঁকে ফেরত দিলেন। রানী বলেন, 'কি হলো? খাবেন না?' আইনস্টাইন বলেন, 'ডাক্তররা আর এলসা বলেছে মিষ্টি না খেতে, কি করে খাই? দেখা আর শোঁকা এইটুকু শুধু করতে পারি।' সবাই সহানুভূতিতে চুকচুক করে ওঠেন। একজন বলেন, 'মিষ্টিটা ভাল হয়েছিল।' আইনস্টাইন তখন বলেন, 'তবে না হয় আমার আরোগ্যের জন্য সবাই একটু প্রার্থনা করুন।—যাতে মিষ্টি আবার খেতে পারি।' সকলে চোখ বন্ধ করে প্রার্থনা করেন; চোখ খুলে দেখেন, আইস্টাইনের প্লেটে মিষ্টি নেই। আইনস্টাইন বলেন, 'আমিও চোখ বন্ধ করে-ছিলুম। গড এসে আমাকে মিষ্টি খাইয়ে দিলেন—সম্মিলিত প্রার্থনার কি শক্তি দেখেছেন?' আরেকবার, আইনস্টাইনের কেন জানি কাগজের দরকার। কোটপ্যান্টের সব পকেট হাঁটকে কাগজ খোঁজেন, পকেটের সব হাবিজাবি জিনিস বাইরে সবার সামনে বের করে আনেন। অবশেষে কাগজ পাওয়া গেল, রানীর মনোগ্রাম করা কাগজে তাঁকে লেখা একটি চিঠির নীচে বেশ খানিকটা সাদা অংশ। প্রয়োজনীয় কাজটুকু ঐ কাগজেই সারেন আইনস্টাইন। একজন অতিথি তাকিয়ে দেখেন, চিঠির একপাশে তাঁর দৈনিক খরচের হিসেব লেখা—এলসা বলেছেন খরচের হিসেব রাখতে, তাই চিঠির একপাশে সেটা লেখা। বেশী কাগজে কি হবে?

অন্য একবার এলসা বলেন, 'হল্যাণ্ডের বনেদি সমাজে মেয়েদের পোশাকের কি ফ্যাসান ভাল করে দেখে এস তো; এবার তো সরকারী ডিনারে যাবে।' আইনস্টাইন এক-

কথায় রাজি। ফিরে আসার পর একথা সেকথা হচ্ছে; এলসা বলেন, 'কই মেয়েদের ফ্যাসানের কথা বললে না?' এলবার্ট বলেন, 'আরে, 'ডিনার টেবিলে বসে শুনলাম, মেয়েরা সব ইভনিং গাউন পরেছেন। তোমাকে সত্যি বলছি, টেবিলের উপরে কারো অঙ্গে কিচ্ছুটি দেখিনি, আর টেবিলের নীচে লজ্জায় তাকায় নি। পোষাকের কথা কি বলব!'

১৯৩৪ সালে পাহাড়ে চড়তে গিয়ে রাজা আলবার্ট মারা যান। হল্যাণ্ডের রাজবাড়ীতে সেই বছরেই যাওয়া শেষ হয়—আইনস্টাইন ইউরোপ ছাড়েন।

১৯৩০ সালে ইংলণ্ডে বক্তৃতা দিতে আসেন আইনস্টাইন—বিখ্যাত রোডস বক্তৃতা। প্রফেসর লিণ্ডামান তার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃষ্টি দেন। তাঁর হোস্ট হন বিখ্যাত বায়োলজিস্ট J. B. S. হালডেনের বাবা ফিজিওলজিস্ট জন স্কট হালডেন। জুনিয়ার হালডেন আইনস্টাইনের আচার-ব্যবহার দেখে ভারি খুশি; বিশেষত তার মোজা পরার অনিচ্ছাটা তাঁর কাছে ভারি আমোদের ঠেকে! অনেক বছর পর, J. B. S. যখন ভারতবর্ষে বসবাস করতে চলে আসছেন, অনেকে জিজ্ঞেস করেন, ভারতবর্ষে কেন যাচ্ছেন? J. B. S. বলেন, "ভারতবর্ষে আরাম কত, শুধু মোজা নয়, জুতোটাও ছাড়তে পারব—কত হাল্কা হবে পাটা বল দেখি।"

অক্সফোডে আইনস্টাইন তিনটি বক্তৃতা দিলেন,—রিলেটিভিটি, মহাবিশ্ব আর একীভূতক্ষেত্র সম্পর্কে; তিনটিই জার্মান ভাষায়; তাঁর বক্তৃতা বিশেষ কেউ বুঝলো বলে মনে হলো না। একে ভাষার বেড়া, তারপর বিষয় নতুন আর কঠিন, আর সবার উপর বক্তৃতায় বিজ্ঞানের গণিতের দিকটার উপর বেশী জোর দিলেন আইনস্টাইন। শ্রোতারা বক্তৃতার মধ্যেই কেটে পড়তে থাকেন। আইনস্টাইন বক্তৃতার পর বললেন, এরপর অক্সফোর্ডে তিনি ইংরিজিতে বক্তৃতা দিবেন! শুনে J. B. S.-এর বাবা জন স্কট হালডেন সচমকে বলেন, "কি সব্বোনাশ!"

পরের বার বক্তৃতা দেবেন কথাটা আইনস্টাইন বললেন, কারণ লিণ্ডামানের ইচ্ছা অক্সফোর্ডে আইনস্টাইনকে কাজ দিয়ে নিয়ে আসা। আইনস্টাইন কাইজার ভিলহেলম ইনষ্টিট্যুতে ইতিমধ্যে পদার্থবিদ্যার প্রধান হয়েছেন, তিনি ডিরেক্টর, অথচ তাঁর দৈনন্দিন কাজের চাপ কম। অক্সফোর্ডে আইনস্টাইন পাকাপাকি ভাবে আসতে চান না। লিণ্ডামান বললেন, তিনি আসবেন অক্সফোর্ডের রিসার্চ স্টুডেন্ট হয়ে, আইনস্টাইন অক্সফোর্ডের গবেষক ছাত্র হবেন; তাঁর কাজ, যাঁরা অক্সফোর্ডে রিসার্চের কাজ করছেন তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করা, নিজের গবেষণার কাজে অন্যের সঙ্গে মতামতের আদান প্রদান করা এবং মাঝে মাঝে এক আধটা সেমিনারে বক্তৃতা দেওয়া। বছরে চার থেকে ছয় সপ্তাহ থাকতে হবে, স্টাইপেণ্ড পাবেন বছরে ৪০০ পাউণ্ড! পাঁচ বছরের কনট্রাক্ট বা চুক্তি, তা ছাড়া অক্সফোর্ডে থাকাকালীন পাবেন ডাইনিং এলাউন্স, অক্সফোর্ডের ইউনিভার্সিটি ডাইনিং হলে

থাকার সুযোগ এবং বাসস্থান। আইনস্টাইন রাজি। লিণ্ডামানের কাজ হলো, এই বন্দোবস্তটি পাকা করা।

বাধা তেমন কিছু হলো না; অন্যদিকে ক্রাইস্টার্চ কলেজের R. U. Dundas আইন-স্টাইনের নিয়োগের জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। মজা এই যে, আইনস্টাইনের অক্সফোর্ডে থাকার সময় ডাণ্ডাস ছুটিতে বিদেশে ছিলেন, দুজনের মোলাকাত হয়নি; আইনস্টাইন ছিলেন ডাণ্ডাসের ঘরে। অক্সফোর্ড ছেড়ে চলে যাবার সময় ডাণ্ডাসের ভিসিটার্স বুকে একটা ছড়া লেখেন আইনস্টাইন। মজার ছড়া, ছড়া পড়ে ডানডাস মুগ্ধ!

Dundas weilt im heil' gen ()sten
Seinc Bude konnt' Verrosten
Wahrend er nach Hohem strebt
Und in Weiter Fernc lebt.

Dass die Mauern nicht erkalten
Nimmt er hier herein den Alten
Der da predigt unentwegt—
Und die ..echenkunste pflegt.

Der Folianten ernste Reih
Denket sich gar mancherlci
Wundern sich dass so ein Mann
Ohne sie hier hausen kann.

Grollen : Was Will dieser hier ?
Raucht Tabak und spielt klavier
Der Barbar geht ein und aus
Weshalb blich er nicht zuhaus ?

Dieser aber oft and gerne
Denkt des Hausherrn in der Ferne
Freut sich biser diesen Mann
In der Nahe schen kann.

Mit herzlichem Dank und Gruss
Albert Einstein
May, 1931.

যে উৎস পথে সূর্য ভ্রমণ শুরু সারা
সেথান থেকে আনেন যিনি জ্ঞানের বারি—
সেই ডাণ্ডাস দূর প্রবাসে দিলে পাড়ি—
ঘরটা তাহার বনলো তখন ছন্নছাড়া,
ঘরের দেয়াল থাকবে গরম ভেবে তিনি
বুড়োটাকে দিলেন হতে কক্ষবাসী :—
সেই যে বুড়ো কীযে শেখায় সংখ্যা-রাশি—
অকুতোভয়ে শোনায় তারি বকবকানি!
পুঁথির বোঝা সারি সারি, থাকের থাক—
সাজিয়ে আছে চিন্তা গুলো নিয়ে বুকে;

ওদের কোন সাহায্য নেই ; তবুও সুখে—
থাকছে বুড়ো ; দেখে ওরা ভীষণ অবাক !

অসন্তোষে বিড়বিড়িয়ে বকছে তারা—
লোকটা কেন থাকছে নিয়ে পান তামাক ?
ঘরের মাঝে ঘুরছে ফিরছে -কী হালাক !
অসভ্যটার বাড়ী ফেরার নেই তাড়া ?

বুড়োর মনে কথনো দেয় চিন্তা উঁকি—
দূর প্রবাসী ঘরের মালিক কেমন আছে ;
হয়তো কথন পাবেন তাকে নিজের কাছে—
তারই ঘরে হয়তো হবে মুখোমুখি।

আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা সহ
এলবার্ট আইনস্টাইন।
মে ১৯৩১।

১৭ই মে ১৯৫৫ সাল মঙ্গলবারের The Times পত্রিকায় আইনস্টাইনের কবিতা ও সেণ্ট জন কলেজের জে. বি. লিসমানের একটি স্বচ্ছন্দ মিলান্ত অনুবাদ প্রকাশ হলো—পত্রিকার শিরোনামে লেখা Einstein By Numbers। দি টাইমস সেদিন কিছু ভুল লিখেছিল। ১৯৩১ সালে আইনস্টাইন অক্সফোর্ডের রিসার্চ স্টুডেণ্ট তখনো হননি ; দি টাইমস সংবাদটিতে তাঁকে রিচার্চ স্টুডেণ্ট জানিয়েছিল। রিচার্চ স্টুডেণ্ট হিসেবে অক্সফোর্ডে যোগ দেন ১৯৩২ সালে।

অক্সফোর্ড থেকে বার্লিনে ফিরে এলেন, নতুন কাজের সম্ভাবনা জেনে আর অক্সফোর্ডের অনারারি ডক্টরেট ডিগ্রিটি পকেটে নিয়ে। ১৯৩৩ সালে বার্লিনে ফিরে এলেন আইন-স্টাইন। কাপুথে আছে গ্রীষ্মাবাস, বই এবং অন্যান্য দিক থেকে অর্থোপার্জন, আছে অধ্যাপনার একটি রুটিন বিহিন চাকরি। মার্সেডিজ গাড়িতে প্রফেসর আইনস্টাইন ঘুরে বেড়ান, গাড়ী চালায় শোফার। আইনস্টাইন গাড়ী চালাতে জানেন না, শিখতেও চান না। তাঁর কাছে যন্ত্রটন্ত্র এক ভয়ানক যন্ত্রণা। সম্মান প্রতিপত্তি সব নিয়ে ভালই আছেন আইনস্টাইন। এই সময়ে ইনস্টিট্যুট অফ ফিজিক্স থেকে মাক্সপ্লাঙ্কের নামে একটি মেডেল তাঁকে দেবার কথা। সেদিন দুপুর বেলা ডাক্তার প্লেখের বাড়ীতে আইনস্টাইন লাঞ্চ খেয়ে সামান্য বিশ্রাম করে দিবানিদ্রা সেরে উঠে খেয়াল করেন, মেডেল দেবার অনুষ্ঠানে তাঁকে একটা ভাষণ দিতে হবে। হাতের কাছে কাগজ না পেয়ে, ডাক্তারের টেবিলে একটি বিল পেয়ে তার পেছনে তিনি একটি ছোট ভাষণ লেখেন ; অনুষ্ঠানে স্বয়ং বাহাত্তর বছরের বৃদ্ধ প্লাঙ্ক আইনস্টাইনকে মেডেলটি দেন, আর পকেট থেকে চোতা-কাগজে লেখা ভাষণটি পড়েন আইনস্টাইন। অনুষ্ঠানের শেষে ডাক্তার প্লেখ তাঁর কাগজটি চান ; আইনস্টাইন কাগজ আর মেডেল দুটিই প্লেখের হাতে দিয়ে দেন—যেন ঝাড়া হাত পা হয়ে নিশ্চিন্ত হতে চান, এমনি ভাব।

১৯৩০ সালে জার্মানির বিদগ্ধ সমাজ তাঁকে সম্মান দিয়ে নিজেরা সম্মানিত হচ্ছেন, অন্য দিকে এই বছরের প্রথম দিকে আইনস্টাইন বার্লিন সিনাগগে মাথায় ইহুদি টুপি পরে বেহালা বাজান। আগের বছর জার্মানিতে এন্টি-সেমেটিক রায়ট হয়ে গেছে, ইহুদিদের সম্পত্তির ক্ষতি হয়েছে। রায়ট থেমে গেছে, তবু জার্মানির বিপর্যস্ত আর্থনীতিক অবস্থায়, অসহায় মানুষের ক্রোধ, আর্থিক দিক দিয়ে কিছুটা সচ্ছল ইহুদিদের বিরুদ্ধে ফেটে বেরোয়। অন্য দিকে জার্মান শাসকদের রাগ কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে। নিজেকে আইনস্টাইন ইহুদি বলে জানিয়েছেন, আবার শান্তির প্রচারে দলমতের বাছবিচার করেন নি। আমস্টার্ডামের পীস কংগ্রেসের তিনি পৃষ্ঠপোষক; বন্ধুরা বলেন, এই কংগ্রেস কম্যুনিস্টদের ব্যবস্থাপনায় হচ্ছে। আইনস্টাইনের উত্তর, 'তাতে কি? আমি তো দেখছি এটা শান্তি সম্মেলন। কারা করছে জানার দরকার কি?" ১৯৩০ সালে শতকরা দুই ভাগের ভাষণ আর শান্তি কংগ্রেসের ঘটনা সব মিলিয়ে জার্মানি, ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্রের শাসকশ্রেণীর একদল তাঁকে কম্যুনিস্ট ভাবতে থাকেন।

ওদিকে, আইনস্টাইনের সাফল্যে, স্বীকৃতিতে, স্বদেশবাসী সহকর্মীদের একাংশ তাঁকে ঈর্ষার দৃষ্টি নিয়ে দেখেন। আইনস্টাইনের নিজের আচরণ এই ধোঁয়াতে ধুনো ছিটোয়। বিদেশী বা ইহুদি ছাত্রদের প্রতি তাঁর আচরণ জার্মান ছাত্রদের চেয়ে বেশী সদয়। তাঁর এই মিশ্র ব্যবহার বন্ধুদের কাছে কটু ঠেকে। বিদেশীদের কাছে তিনি স্বীকৃতি-সম্মান পাচ্ছেন, অর্থোপার্জনের সহজধারা বিদেশীদের সহায়তায় বইছে। বিদেশী-ছাত্ররা স্বাভাবিক-ভাবেই তাঁর প্রিয়। আর ইহুদি ছাত্র মানে নিপীড়িত মানব সমাজের অংশ তারা—তাঁর সহানুভূতি, অতএব, সেদিকে। এই দু'দলের মাঝখানে পড়ে হতভাগা জার্মান ছাত্রদলের দাম তাঁর কাছে কমে গেছে। ব্যবহারের বৈষম্যের খেসারত দিতে হয়;—বিরুদ্ধ পক্ষ একটি বই প্রকাশ করেন, Hundred Authoren gegen Einstein, আইনস্টাইনের বিপক্ষে একশত লেখক। একশটি লেখায় নতুন কিছু নেই, সেই রিলেটিভিটি তত্ত্ব ভুল প্রমাণের কচকচানি, ব্যক্তিগত আক্রোশে গায়ের ঝাল মেটানোর চেষ্টা।

১৯৩৩ সালে একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব নিয়ে সংশয় দেখা দেয়। সহকারী মায়ের (Mayer)-কে বলেন, "গণিতের সমাধানের প্রচণ্ড কষ্টের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি—বেরিয়ে আসতে পারছিনে।" সাফল্য আর অসাফল্য এই দুটি ধারার মধ্যে তাঁর বিরুদ্ধ-বাদীরা ঘূর্ণি তোলেন। বিরুদ্ধ আন্দোলন আরো জোরদার হয়; এদিকে জার্মানির অর্থনীতির বনেদে কোন উন্নতি দেখা দেয় না। শাসক সম্প্রদায়ের শাসনের লাগাম সংকটটিকে টেনে আয়ত্তে রাখতে পারে না। বিক্ষিপ্ত জনসাধারণের মধ্যে মাস্তানদের প্রাদুর্ভাব ঘটে, পেশীর বহিঃপ্রকাশ হতে থাকে। জার্মান ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টরা জাতীয়তাবাদের ধোঁয়া দিয়ে মাস্তানদের আরো উত্তেজিত করে তোলেন। ইতিমধ্যে হিটলারের আবির্ভাব হয়। জাতীয়তাবাদের নেশায় মত্ত হয়ে জার্মানির শুদ্ধিকরণে একদল বদ্ধপরিকর হয়ে এগিয়ে আসেন।

হিটলারের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে জার্মানির পটভূমিকায় পরিবর্তন ঘটতে থাকে। আইন-স্টাইনের জার্মানিতে থাকার সম্ভাবনা কমে আসে, নিরাপত্তাবোধ নষ্ট হতে থাকে। অন্যত্র কাজ পাওয়া যায়—কিন্তু তাঁর নিজের কাজের জন্য প্রয়োজন নিরুপদ্রব অবসর; সাধারণ অধ্যাপনায় সেই অবসর নেই। জার্মানিতে থাকতে চান, অথচ থাকা বোধ হয় যায় না, যাবে না, মনের এই দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় শোনা যায়, ১৯৩১ সালের ১৭ই জুলাই তারিখে প্লাঙ্ককে লেখা একটি চিঠিতে জার্মান নাগরিকত্ব ছাড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন—এই চিঠি পোস্ট হয়নি। পরবর্তীকালে জার্মানিতে তাঁর ফেলে আসা কাগজ-পত্রের মধ্যে এই চিঠিটি পাওয়া যায়। তবু, ১৯৩১ সালে আইনস্টাইন জার্মানিতে থাকতে চান। যুক্তরাষ্ট্র থেকে মিলিকান তাঁকে ক্যালটেকে আনতে চান; আরেকজনও তাঁকে যুক্তরাষ্ট্রে আনতে চেষ্টা করেন, তবে ক্যালটেকে নয়, প্রিন্সটনের থিয়োরেটিকাল রিসার্চ ইনষ্টিট্যুটে আইনস্টাইনকে গবেষক হিসেবে ফ্লেক্সনার চান। ক্যালটেকে আইনস্টাইনের পদ হবে এস্ট্রো-ফিজিক্স বিভাগে; আর ফ্লেক্সনার জানান, প্রিন্সটনে তাঁর পদ তাত্ত্বিক গবেষকের—গবেষণার বিষয় তিনি স্থির করবেন। এদিকে ওয়াইজমান চান হিব্রু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গভর্নরের পদে আইনস্টাইনের সক্রিয় নিয়োগ। লিণ্ডামানও পিছিয়ে থাকেন না। অক্সফোর্ডের রিসার্চ স্টুডেন্ট আইনস্টাইনকে পুরোপুরি বিশ্ববিদ্যালয়ে পেতে চান লিণ্ডামান ও তাঁর অনুগামীরা। তবু, ১৯৩১ সালে আইনস্টাইন জার্মানি ছাড়তে চান না।

মিলিক্যানের সঙ্গে চিঠি-চাপাটি চলেছে। অদম্য ফ্লেক্সনার প্রিন্সটনের জন্য আইনস্টাইনকে পেতে চান, পাসাডোনার শিক্ষাবিদ ফ্লেমিং, তিনিও চান প্রিন্সটনে পার্মানেন্ট পদে আইনস্টাইনের নিয়োগ। আমেরিকানরা তিনমুখী আক্রমণ শুরু করলেন।

১৯৩২ সালে আবার আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এলেন, দেখা হয় পাসাডোনাতে ফেমিং-এর সঙ্গে আর বিশ্বজগৎ নিয়ে ডি সিটারের সঙ্গে আলোচনা করেন। প্রিন্সটন আর ক্যালটেকের আকর্ষণ নিয়ে দ্বিধা দেখা দেয়। এই দ্বিধা-সংশয় নিয়ে বসন্তের প্রথমে ফিরে আসেন বার্লিনে—আর মে মাসে অক্সফোর্ডের প্রথম রিসার্চ স্টুডেন্ট হিসাবে ইংলণ্ডে যান। অক্স-ফোর্ডে যাবার আগে কেমব্রিজে প্রথম রুজবল লেকচার দেন—বিষয় গণিত। অক্সফোর্ডে তিনি রিসার্চ স্টুডেন্ট হিসেবে সেমিনারে যোগ দেন, গবেষকদের সঙ্গে আলোচনা করেন আর কথা বলেন লিণ্ডামানের সঙ্গে। ইংলণ্ডে ফ্লেক্সনার-এর সঙ্গে আবার দেখা হয়।

আপাতস্থির আবহাওয়া; তবু মনে হয় দূরে বুঝি ঝড়ের চিহ্ন! ১৯৩২ সালে হিটলারের নাজি পার্টি দুর্বার হয়ে দাঁড়ায়; নাজি পার্টির ক্ষমতাদখলের সূত্রপাত যখন, সেই ১৯৩২ সালে, অক্সফোর্ড থেকে বার্লিনে ফিরে এলেন মে মাসে, কালবৈশাখী ঝড়ের ঠিক আগে।

ফ্লেক্সনারও আসেন বার্লিনে। প্রিন্সটনে তাঁর কত বৃত্তি হবে সে নিয়ে আলোচনা চলে। আইনস্টাইন বলেন, বার্ষিক ৩০০০ ডলার যথেষ্ট; মনে হয় ওর চেয়ে কমেও চলে

যেতে পারে। ফ্লেক্সনার বলেন, 'প্রোফেসর, টাকা পয়সার ব্যাপারটা মিসেস আর আমার উপর ছেড়ে দিন।' দুজনে আলোচনা করে ঠিক করেন, আইনস্টাইনের বৃত্তি হওয়া উচিত বার্ষিক ১৬০০০ ডলার!

ফ্লেক্সনার কাপুথের বাড়ীতে দেখেন, ঠাণ্ডায় পাতলা জামা গায়ে দিয়ে আইনস্টাইন ঘুরছেন, ফিরছেন। ফাঁকা জমির উপর দিয়ে নদীর ঠাণ্ডা হাওয়ায় শীতল সিরসিরানি বয়ে যায়। ফ্লেক্সনার বলেন, 'ঠাণ্ডা লাগে না?' আইনস্টাইন বলেন, "না, এখন তো গ্রীষ্মকাল, আমার পোশাক ঋতু মেনে চলে; এখন গ্রীষ্মের পোশাক—গ্রীষ্মে ঠাণ্ডা কোথায়?"

সমস্ত জার্মানি হিটলারের ক্ষমতা দখলের অভিযানে সেদিন উত্তপ্ত; গ্রীষ্মের দাবদাহে ঠাণ্ডা হাওয়ার শীতের ছোঁয়া বোঝা যায় না!

১৯৩৩ সালে প্রিন্সটনের রিসার্চ ইনস্টিট্যুটে যাবেন প্রায় ঠিক করে ফেললেন। মিলিক্যানের আমন্ত্রণ, ক্যালটেকের এস্ট্রো-ফিজিক্সের গবেষণার চেয়েও বড় টান একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব গঠনে। প্রিন্সটনে নির্জনে নিরালায় চিন্তার অবসর পাওয়া যাবে। যৌবনে ভেবেছিলেন, লাইট হাউসের নির্জনতা কখনো কখনো চিন্তাবিদদের প্রয়োজন হতে পারে; প্রয়োজন হয় নৈশব্দ্যের মধ্যে নিজের চিন্তার মুখর পাদচারণ শোনা। ক্যালটেক নয়, প্রিন্সটনে লাইট হাউসের নৈঃশব্দ্য নির্জনতা পাওয়া যাবে।

১৯৩১, ৩২, ও' ৩৩,; পরপর তিনবার মিলিক্যানের আমন্ত্রণে আমেরিকা গেলেন। আমেরিকা যাবার আকর্ষণে আরো একটি টান—সমুদ্রযাত্রা ভাল লাগে, ভালবাসেন। আমেরিকা যাওয়া মানে আটলান্টিক মহাসাগরের বুকের উপরে দীর্ঘকাল ভেসে যাওয়া। মিলিক্যানের আমন্ত্রণ এই আনন্দ-সুখ তাঁকে জুগিয়ে দেয় বলে তিনি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। এই ১৯৩৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী প্রশাসন তাঁকে ভিসা দিতে আপত্তি করেন। দুই পারসেণ্ট ভাষণের বক্তা কম্যুনিস্ট মহলে আনাগোনা করেন, কম্যুনিস্টরা তাঁকে পাবলিসিটিও প্রচুর দেয়; আইনস্টাইন সম্ভবত প্রচ্ছন্ন কম্যুনিস্ট, তিনি বর্তমানে War Resistors International এর সভ্য, যেটি কম্যুনিস্ট ঘেঁষা! যা-হোক, মিলিক্যানের চেষ্টায় ভিসা মেলে। আইনস্টাইন আর এলসা ১৯৩৩ সালের জানুয়ারী মাসে যুক্তরাষ্ট্রে রওনা দিলেন।' যাবার আগে এলসাকে বললেন, 'কাপুথের বাড়ীটা ভাল করে দেখে নাও, আর হয়তো দেখতে পারবে না।, ফিলিপ ফ্রাঙ্ককে এলসা বলেন, 'দেখেছেন। ছেলে মানুষের মত কি যা' তা' বকে!'

কাপুথের বাড়ী সত্যি তাঁরা আর দেখেন নি।

যুক্তরাষ্ট্রে মিলিক্যানের সঙ্গে তাঁর একটা অলিখিত চুক্তি হয়—মিলিক্যান যেসব সাধারণ মিটিং আয়োজন করবেন, বা যেখানে যেতে তাঁর অনুমোদন থাকবে, সেগুলি ছাড়া আইনস্টাইন অন্য সব মিটিং-সভা-সম্মেলন বর্জন করবেন। দুই পারসেণ্ট বক্তৃতা ও নানা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে স্টেট ডিপার্টমেণ্ট তাঁকে নিয়ে সন্দেহের দোলায় দুলছেন, আর

বাড়তি কোন উটকো ঝামেলা জুটে যাক, মিলিক্যান তা চান না। আইনস্টাইন ডাক্তার ছেলের মত নিজেকে মিলিক্যানের হাতে সঁপে দিলেন। মিলিক্যানের সাহায্যে রিপোর্টারদের হাঙ্গামা এড়ানো যায়। রেডিওতে পয়সার বিনিময়ে আইনস্টাইন ভাষণ দেন—টাকা যায় দুঃস্থ যুদ্ধ-সৈনিকদের সাহায্যে, ইহুদিদের জন্য শান্তির প্রচারে। পাঁচ ডলারের বিনিময়ে এলসা প্রফেসরের দস্তখত বিক্রি করেন, এই টাকাও যায় ইহুদিদের পুনর্বাসনের জন্য প্যালেস্টাইন রাষ্ট্রের হাতে। আর আইনস্টাইন পাসাডোনার সিভিল অডিটোরিয়ামে ভাষণ দেন।

অন্যদিকে জাতীয়তাবাদের বহ্নিশিখায় হিটলারের জার্মানি জ্বলছে—পত্র-পত্রিকাগুলি কয়েকজন ব্যক্তিবিশেষের প্রতি বিষোদ্গার করে চলেছে, এঁরা আন্তর্জাতিক জগতে স্বীকৃত; এঁরা শান্তিবাদী, যুক্তিবাদী, হয়তো বা সমাজতন্ত্রের ভক্ত। সবার উপরে এঁরা ইহুদি। পত্র-পত্রিকার মতে এঁরা এলবার্ট আইনস্টাইন, টমাসমান, হাইনরিখ, আরনল্ডৎস্বইগ, জার্মান সংস্কৃতিকে বিকৃত করে চলেছেন; শান্তিবাদ আর আন্তর্জাতিকতার ভণ্ডামির মুখোস পরে জার্মানির বিরুদ্ধে এক আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র করে চলেছেন। সমালোচনা বিদ্বেষ, নিন্দামুখরতার ঢেউ আটলান্টিক পার হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আছড়ে আছড়ে পড়ে। ১০ই মার্চ ১৯৩৩ সালে পাসাডোনায় নিউইয়র্ক ওয়ার্লড টাইমসে আইনস্টাইন ইন্টারভিউ দেন—

যতদিন পর্যন্ত নিজের রুচি অনুযায়ী চলতে পারব, ততদিন আমি এমন এক দেশে বাস করব, যেখানে রাজনৈতিক স্বাধীনতা, সহনশীলতা, ও আইনের চোখে সকল নাগরিকের সমান মর্যাদা স্বাভাবিকতাবেই থাকে। রাজনৈতিক স্বাধীনতায় একজনের নিজস্ব অভিমত মৌখিক বা লিখিতভাবে ব্যক্ত করার অধিকার থাকে আর সহনশীলতা বলতে যাবতীয় ব্যক্তিগত মতের প্রতি শ্রদ্ধা বোঝায়। আজকের জার্মানিতে এ অবস্থা নেই। আন্তর্জাতিক সদ্ভাব স্থাপনে যাঁরা চেষ্টা করছেন, যাঁদের মধ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট শিল্পীও আছেন, আজ জার্মানিতে তাঁরা অযথা উৎপীড়িত হচ্ছেন। দুঃখকষ্টের পেষণে ব্যক্তিবিশেষের মতো সামাজিক গোষ্ঠী-জীবনও ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। সমস্ত জাতির পক্ষে এই বিপর্যয় সামলে নেওয়া হয়তো বা সম্ভব। আমি আশা করি, জার্মানিতে আবার সুস্থ অবস্থা ফিরে আসবে, ভবিষ্যতে কান্ট ও গোটের মত জার্মানির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের বিশেষ উপলক্ষ্যে শুধু পুজো হবে না, তাঁরা যে আদর্শ প্রচার করে গিয়েছিলেন, জনজীবনে, সর্বসাধারণের চেতনায় তার প্রভাবের প্রত্যক্ষ প্রমাণ আবার পাওয়া যাবে।"

বর্তমান অবস্থায় জার্মানিতে থাকতে তিনি পারেন না। কোথায় থাকবেন তিনি জানা নেই, এখনো জানেন না। হয়তো বা সুইজারল্যাণ্ডে। বলেন, "আন্তর্জাতিকমনা একজন মানুষের কাছে কোন একটি বিশেষ দেশের নাগরিকত্ব ইমপর্টেন্ট নয়। কোন দেশের নাগরিকত্বের চেয়েও মানবতা অনেক প্রয়োজনীয়, জরুরী।" ইন্টারভিউ দেবার পর শান্তভাবে ধীর পায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিনারে যোগ দিতে চলে যান। তবু রিপোর্টার লিখলেন, 'সেমিনারে যোগ দিতে ডঃ আইনস্টাইন যখন কেম্পাসের মধ্য দিয়ে হেঁটে যান তখন তাঁর পায়ের তলায় মাটি কেঁপে ওঠে।'—মাটি সত্যিই সেদিন কেঁপে ওঠে; লস এঞ্জেলসে ভূমিকম্প হয় সেদিন।

যুক্তরাষ্ট্র ছাড়ার দিন এগিয়ে আসে। নিউইয়র্ক শহরের জার্মান দূতাবাসের কন্সাল পল শোয়াৎস (Schwarz) তাঁকে জার্মানি ফিরে যেতে নিষেধ করেন। সেখানকার পরিস্থিতি সুবিধের নয়। সবদিকে ভেবে ঠিক করেন বেলজিয়ামে থেকে যাবেন। এপ্রিলে সপরিবারে ফিরে এলেন বেলজিয়ামে, হেল (Hale) শহরে একটা সাময়িক ডেরা বাঁধা হলো। অনিশ্চিত জগতের মধ্যে একটি শুধু ভুলে থাকার বিষয়, সেটি বিজ্ঞান। মনোমত বিজ্ঞানের আলোচনার সুযোগ পেলে, নাওয়া-খাওয়া, জার্মানি-হিটলার, শান্তিবাদ ইহুদিয়ানা—সব কিছু ভুলে যেতে পারেন। এলসা সেই সুযোগ তৈরি করেন, আবার দরকার মত রাশ টানেন। এই সময়ে তিনি তাঁর "যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম (Fight against war)" পুস্তিকাটি প্রকাশ করেন। এখানে তিনি জার্মান বুদ্ধিজীবীদের আক্রমণ করেন। বলেন, জার্মানিতে শান্তিবাদীরা দেশের শত্রু। বেলজিয়ামে ঘোষণা করেন, "ইউরোপীয় সভ্যতা রক্ষার জন্য আমি যদি বেলজিয়াম হতুম, সামরিক কাজে সানন্দে যোগ দিতুম।"

আমেরিকা থেকে ফিরে আসার পথে জাহাজে খবর পান তাঁর কাপুথের বাড়ী সার্চ করা হয়েছে! জেনেছেন, ক্ষমতা অধিকারের সময় পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করে মাস্তানদের আস্ফালন এনেছেন হিটলার।

শান্তিবাদ সম্পর্কে নতুন ধারণার উদয় হয়। ষোল আনা শান্তিবাদ কি? তাঁর মতে,

> "সজ্ঞানে যুদ্ধোদ্যমের সহযোগিতা করতে অস্বীকার করা হচ্ছে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী আয়ুধ। এই জাতীয় বীর অসহযোগীদের নৈতিক ও জাগতিক সাহায্য করার জন্য প্রত্যেক দেশে সংগঠন থাকা দরকার......এই সংগ্রাম নিশ্চয় বে-আইনী, তবু এ হবে শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে যথার্থ গণ-অধিকার রক্ষার সংগ্রাম।"

দেশপ্রেম শান্তিবাদের পরিপূরক নয়, দেশপ্রেমের ঊর্ধ্বে থাকে শান্তির জন্য সংগ্রাম। হিটলারি-জার্মানির যুদ্ধোদ্যমের চেষ্টাকে সংযত করা হচ্ছে না, জার্মানির অভ্যন্তরে যাঁরা হিটলারের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন, কথা বলতে পারেন, তাঁদের উপর নির্বিশেষে অত্যাচার হচ্ছে, বাইরের জগতে কোন আলোড়ন আন্দোলন নেই। তিনি কি করবেন?

"আপনি কি মনে করেন, আমার কথায় কোন কাজ হবে? এ ভ্রান্ত মায়া। যতক্ষণ আমি তাদের পথের বাধা নই, লোক ততক্ষণই আমাকে মেনে নিতে পারে। আর তাদের মর্জির বিরুদ্ধে কোন কিছুর জন্য চেষ্টা করা মাত্র তারা নিজেদের স্বার্থে পঞ্চমুখে আমার নিন্দেমন্দ করবেন, কুৎসা রটাবার স্রোত বইয়ে দেবেন। আশে পাশে যারা আছে, তারা ভীরুর দল চটপট গা ঢাকা দিতে ওস্তাদ। নিজের দেশবাসীর সৎসাহসের পরীক্ষা কোন দিন কি নিয়েছেন? সুবোধ বালকের রীতি হলো চোখ বন্ধ করে থাকা, 'যেতে দিন, এসব নিয়ে ঝামেলা করবেন না' বলা।'..."শান্তিবাদীর কাজ তবে কি'—"মানব সমাজের সামনে অন্ততম বিপদের কারণ হলো মারণাস্ত্র উৎপাদনের ব্যবসায়। সর্বত্র যে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ দেখা যায়, তার পেছনে কাজ করে এই কর্মঠ অপদেবতা।'..."আমাদের পথ বেছে নেবার সময় এসে গেছে। আমরা শান্তির পথ খুঁজে নেব, না, আমাদের সভ্যতার যা কলঙ্ক সেই পশুশক্তির পুরনো পথ ধরে চলব—এইপথ বাছা নির্ভর করছে আমাদের উপর। এক দিকে ব্যষ্টির নিরাপত্তা আমাদের হাতছানি দিচ্ছে, অন্য দিকে মানুষের দাসত্ব আর সভ্যতার অবলুপ্তি আমাদের রক্ত চোখ দেখায়। নিজেদের যোগ্যতার উপর নির্ভর করে আমাদের ভবিষ্যৎ, আমাদের ভাগ্য।'..."যতদিন সৈন্যবাহিনীর অস্তিত্ব থাকবে ততদিন যে কোন

গুরুতর বিপদের পরিণাম হলো যুদ্ধ। যে শান্তিবাদ বিভিন্ন জাতিকে প্রত্যক্ষ অস্ত্রসজ্জা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা না করে, তার কপালে 'নপুংসকত্বের ছাপ ছাড়া আর কিছু আঁকা নেই। জনসাধারণের বিবেক কাণ্ডজ্ঞান জেগে উঠুক। তারা জাতীয় জীবনের এমন এক নতুন অধ্যায়ে হাজির হন, যেখানে মানুষ অতীতের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে যুদ্ধ বিগ্রহকে তাদের পূর্বপুরুষের মূঢ়তার নিদর্শন মনে করবে।'

শান্তিবাদের প্রচারে বারবার ছুটি মতের কথা বলছেন আইনস্টাইন, নিরস্ত্রীকরণ এবং দেশের অভ্যন্তরে প্রতিবাদ-অসহযোগিতার সৃষ্টি। জার্মানির ভিতরে কি ঘটছে সেটি তিনি পরোক্ষে জানতে পারছেন ; বুঝতে পারছেন না, জার্মান বুদ্ধিজীবীরা হিটলারের পেশীর শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে কেন সোচ্চার হয়ে উঠছেন না—এই তাঁর কাছে বিস্ময়ের। অন্য দিকে তাঁর প্রতিবাদ জার্মানির বাইরে দাঁড়িয়ে। জার্মানির নিপীড়িত জনগণের সঙ্গে এক প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে নয়। কিছু জার্মান বুদ্ধিজীবীদের কাছে এও এক বিস্ময়ের। আইনস্টাইন জার্মানিতে ফিরছেন না এ খবরে তাঁর প্রতিপক্ষ দল খুশি আর তাঁর মতাবলম্বীদের কাছে এটি হতাশার।

এরই মাঝে ব্রাসেলসে জার্মান দূতাবাসে তাঁর জার্মান পাসপোর্ট ফেরত দেন। আইনস্টাইন জার্মান নাগরিকত্ব ছাড়ছেন, তবু কমলি সহজে ছাড়তে চায় না। জার্মান সরকারের মতে আইনস্টাইনকে নিজে থেকে নাগরিকত্ব ছাড়ার সম্মানটুকু দেওয়া হবে না, তাঁকে জার্মানি থেকে বিতাড়ন করা হবে। ছাড়বার সম্মানের বদলে তাঁকে দেওয়া হবে বিতাড়নের অপমান। বিতাড়নের প্রথম লিস্টে আইনস্টাইনের নাম।—কি ঘটে বা না-ঘটে এ নিয়ে আইনস্টাইনের উত্তেজনা নেই! ঘটনার অবশ্যম্ভাব্য পরিস্থিতি জানাচ্ছে তিনি জার্মানিতে থাকছেন না, থাকবেন না—তাঁকে নিয়ে জার্মানিতে কি হচ্ছে, তা নিয়ে তাঁর কোন মাথাব্যথা নেই। হেলে ছেড়ে বেলজিয়াম শহরের লেকক (Lecoq) গ্রামে বাস করতে এলেন। এখানেই প্রাশিয়ান বিজ্ঞান একাদমি থেকে পদত্যাগ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। নার্নস্ট চান না তিনি পদত্যাগ করুন, অজার্মান বুদ্ধিজীবীরা,—ভলতেয়ার, দ্য'লেমবার্ট প্রমুখ, প্রাশিয়ান একাদমির সেবা করেছেন, আইনস্টাইন কেন পদত্যাগ করবেন? অন্য দিকে প্লাঙ্ক মনে করেন এটিই সম্মানজনক পন্থা!

বিজ্ঞান একাদমির স্থায়ী-সম্পাদক ডঃ আর্নেস্ট হেন্মান ১৯৩৩ সালের ১লা এপ্রিলে একটি ঘোষণা করেন :

ফ্রান্স এবং আমেরিকায় এলবার্ট আইনস্টাইন যে কুৎসা ছড়িয়ে বেড়িয়েছেন সংবাদপত্র মারফত তার কথা প্রাশিয়ান বিজ্ঞান একাদমি জেনেছে। এরজন্য তার কৈফিয়ত তলব করা হয়। ইতিমধ্যে আইনস্টাইন একাদমি থেকে পদত্যাগ করেছেন এবং পদত্যাগের কারণ স্বরূপ ঘোষণা করেছেন যে, বর্তমান শাসকবৃন্দের পরিচালনাধীন প্রাশিয়ান রাষ্ট্রের সেবা করতে তিনি অক্ষম। তিনি সুইজারল্যাণ্ডের নাগরিক বলে সম্ভবত প্রাশিয়ার নাগরিকত্ব বর্জন করছেন। ১৯১৩ সালে একাদমির পূর্ণ মর্যাদাবিশিষ্ট সদস্য হবার ফলে তিনি স্বাভাবিকভাবে প্রাশিয়ার নাগরিকত্বে অধিকার পেয়েছিলেন। আইনস্টাইন বিদেশে গিয়ে আন্দোলনকারীর ভূমিকা গ্রহণ করায় প্রাশিয়ান বিজ্ঞান একাদমি সবিশেষ দুঃখিত। কারন একাদমি ও তার সদস্যদল বরাবরই প্রাশিয়ান রাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ এবং কোনরকম দলগত রাজনৈতিক মতবাদের সঙ্গে জড়িত না থেকেও তারা জাতীয়তাবাদী ভাবধারার উপর জোর দিয়ে এসেছেন, তার অনুগত থেকেছেন। সুতরাং আইনস্টাইনের পদত্যাগ তাদের পক্ষে অনুতাপের কারণ হয়নি।'

একাদমির সরকারী ঘোষণার জবাবে আইনস্টাইন একাদমিকে একটি চিঠি পাঠান। প্রথমেই তিনি ঘোষণা করেন কোন কুৎসা রটনায় বিন্দুমাত্র ভাগ তিনি নেননি।

"সংবাদ পত্রে একাদমির সদস্য-পদ থেকে ইস্তফা দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করে আর প্রাশিয়ার নাগরিকত্ব অধিকার বর্জন করার অভিলাষ ব্যক্ত করে একটি বিবৃতি দিয়েছিলাম। এর কারণ হিসেবে বলেছিলাম, যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি আইনের চোখে সমান নয়, স্বাধীনভাবে নিজের মতামত ব্যক্ত করা ও নিজের অভি রুচি অনুযায়ী শিক্ষা-দেবার স্বাতন্ত্র্য যেখানে নেই' সেদেশে আমি থাকতে চাইনে। এছাড়া জার্মানিতে অনুষ্ঠিত বর্তমান ঘটনা সম্বন্ধে আমি মন্তব্য করি যে,এটি জনসাধারণের মানসিক ব্যাধির পরিচয় জানাচ্ছে। সেমিটিকবিরোধী আন্দোলনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য যে আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাদের অ দর্শের প্রতি সহ মুভূতি অ কর্ধতের সহায়ক হবে বলে তাদের হাতে একটি লিখিত রচনা দিই। সেটি অবশ্যই সংবাদপত্রে প্রচারের জন্য প্রকাশ হয়নি। ·· ··জার্মান সংবাদপত্র সজ্ঞানে আমার বক্তব্যের বিকৃত বিবরণ প্রকাশ করে চলেছে; অবশ্য আজকালকার সংবাদপত্র সমূহের মুখে কাপড় গোঁজা বলে এর বেশী সত্যভাষণ তাদের কাছে আশা করা যায় না।"

একাদমির বিবৃতিটি প্রকাশ হয় ১লা এপ্রিল। এর দুই দিন আগে ৩০শে মার্চ তারিখে সেক্রেটারি ফন ফিকরের পদত্যাগপত্রের উত্তর দেন।

আমাদের সঙ্গে একাদমিতে এতদিন ধরে যিনি আছেন, তাঁর রাজনীতির ঝোঁক যেদিকেই থাক, আমাদের স্থির প্রত্যয় ছিল, আমাদের দেশ ও জাতির প্রতি যে বিষোদগার হচ্ছে তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য যাঁরা দাঁড়িয়েছেন, তাঁর পাশে তিনিও এসে দাঁড়াবেন। এই ঘৃণ্য জঘন্য কাদা ছোঁড়াছুড়ির সময় জার্মান জাতির উদ্দেশ্যে আপনার উচ্চারিত একটি সমবেদনার শব্দের ফল সুদূর প্রসারী হতে পারতো। এ বড় দুর্ভাগ্য, তা না হয়ে আপনার সাক্ষ্য বর্তমান সরকার ও জার্মান জাতির বিরুদ্ধে শত্রুরা হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। সমস্ত ঘটনা আমাদের কাছে তিক্তবিস্বাদ ও ক্ষোভের—যার একমাত্র ফলশ্রুতি সম্পর্কচ্ছেদ। আপনার পদত্যাগ পত্র না পেলেও এটি একমাত্র পন্থা ছিল।'

একাদমির চিঠি বুদ্ধিজীবীদের দুটি চিন্তা প্রকাশ করছে,—একটি তাঁদের ক্ষোভ; আইনস্টাইন জার্মান জাতিকে সহানুভূতি নিয়ে দেখতে পারেননি—জার্মানির অপমান অবহেলার সামিল তিনি হতে পারেননি পারেননি দুঃখের দিনে পাশে দাঁড়াতে। অন্যটি তাঁদের আক্রোশ; তাঁর স্পষ্ট ভাষণ, প্রতিভা, ইহুদি জাতিত্ব অনেকের কাছে সহনীয় নয়, আইনস্টাইনের প্রতিষ্ঠা বহুজনের কাছে মাৎসর্যের কারণ। আর জার্মানির বুদ্ধিজীবীদের কাছে এটিই সবচেয়ে দুঃখের যে, ব্যক্তি-স্বাধীনতার অবদমনের কথা জার্মানি প্রসঙ্গে তিনি যত বলেছেন, তার ক্ষুদ্রতম অংশের ভাগ জোটেনি মুসলিনির ইটালি সম্পর্কে। ১৯৩৪ সালে একটিমাত্র চিঠি তিনি লিখেছেন ইটালির মন্ত্রী সিনর রোকোকে –ইটালির জ্ঞানীগুনীদের উপর যে নিষ্ঠুর নির্যাতন চলেছে তার প্রতিবাদ করে, বন্ধ করার অনুরোধ জানিয়ে। এই প্রতিবাদ ইটালির সর্বসাধারণের জন্য প্রয়োগ হয়নি, শুধু 'সত্যের খাঁটি সেবকদের শান্তিতে থাকতে দেবার' অনুরোধটুকু জানানো হয়েছিল। আর স্টালিনের রাশিয়া সম্পর্কে এ যুগে তাঁর বিস্ময়কর নীরবতা জার্মান জাতি সম্পর্কে তাঁর এলার্জিটুকু নগ্ন করে প্রকাশ করছে!

লিগ অফ নেশনের বুদ্ধিজীবীদের কমিটির সভ্যপদের কাল শেষ হয়ে আসে। পুন-

নির্বাচন তিনি চান না; তাঁর ইচ্ছে, কমিটির সভ্যপদ থেকে অব্যাহতি পাওয়া। লিগের অনুরোধ, চলতি সেসনটুকু কাটিয়ে যান। তারপর যদি তিনি সভ্যপদ খারিজ করতে চান, মেনে নেওয়া হবে।

ইতিমধ্যে নিঃশস্ত্রীকরণ সম্মেলন শুরু হয়েছে। হোমরাচোমরা, নানা দেশের সরকারী পদস্থ অফিসাররা কে কত অস্ত্র রাখতে পারেন সে নিয়ে, তার সংখ্যা নিয়ে বৈঠক চালাচ্ছেন। কাজের কাজ কিছু হচ্ছে কি ?—আইনস্টাইনের এটাই প্রশ্ন।

"নিঃশস্ত্রী সম্মেলন প্রসঙ্গে আসা যাক। এর কথা ভেবে লোকে হাসবে না কাঁদবে? এর কাছে আশা করার কিছু আছে কি? ধরুন একটা শহরের অধিবাসীরা সকলেই কোপন স্বভাব, অসৎ ও ঝগ-ড়াটে। বেঁচে থাকাটাই সেখানে এক নিরন্তর বিপদের বিষয়। আর এই গুরুতর বাধার জন্য যাবতীয় সুসংগত বিকাশের পথ সেখানে রুদ্ধ। নগর-প্রধানের ইচ্ছা এই শোচনীয় অবস্থার অবসান হোক। তার উপদেষ্টা আর সেখানকার নাগরিকরা কিন্তু তাদের কোমরে একটা করে ছোরা রাখার রীতিটা বজায় রাখতে চান।·····অবশেষে আপোস নিষ্পত্তি হয়·····প্রত্যেকে নিজের কোমরে যে ছোরা ঝুলিয়ে রাখবে তার দৈর্ঘ্য, তীক্ষ্ণতার মান ইত্যাদি সম্পর্কে একটি ফতোয়া জারি করা হলো। ·····ছুরির দৈর্ঘ্য আর তীক্ষ্ণতায় ভাগ্য শুধু সবল আর মস্তানদের সাহায্য করবে—বাকি সবাইকে তাদের দয়ার উপর নর্ভর করতে হবে।······আমাদের লিগ অফ নেশন আর তার সালিসী আদালত আছে। কিন্তু লিগের ক্ষমতা একটা সভাগৃহের চেয়ে বেশী নয়। ওদিকে, সালিসী আদালত তার নির্দেশ পালন করাতে অক্ষম। কোন দেশ আক্রান্ত হলে, এইসব প্রতিষ্ঠান তার নিরপত্তা ব্যবস্থা করতে অপারগ।

অর্থহীন লিগের কমিটির বৈঠকে দীর্ঘ বাক্‌বিতণ্ডা—কারণ লিগের হাত ঠুঁটো। শুধু কথায় চিঁড়ে ভেজে না,—নানা বৈঠকের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা-লোলুপ দেশটিকে সায়েস্তা করা যায় না। সেই দেশটিকে রোখা যায় প্রতি-আক্রমণের ভয় দেখিয়ে অথবা সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের মধ্য দিয়ে। নিরস্ত্রীকরণ মানে অস্ত্রের মান বা সংখ্যা নির্ণয় নয়।

নিঃশস্ত্রীকরণ সম্মেলনের সময় জেনেভাতে একটি প্রেস-কনফারেন্স ডেকে তাঁর নিজের মতবাদ ব্যক্ত করলেন আইনস্টাইন। নিঃশস্ত্রীকরণের ব্যঙ্গের দিকটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। লিগের সভ্য হয়েও সেদিন লিগের বাইরে দাঁড়িয়ে তথাকথিত নিঃশস্ত্রী সম্মেলনটির সঙ্কীর্ণতার দিকে তর্জনী নিক্ষেপ করলেন।

লিগের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল।

জার্মানিতে, ওদিকে, হিটলারের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে, আইনস্টাইনের প্রতি জার্মান জাতির অভিমান ধীরে ধীরে ক্রোধে আক্রোশে রূপান্তরিত হলো। জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকে ইহুদি ও অজার্মানদের হিটলার বিতাড়িত করেছেন; মান, ৎসুইগ, আইনস্টাইন ইত্যাদির বই পোড়ানো হলো. আর কাইজার ভিলহেলম ইনস্টিট্যুটের কাছ থেকে হিটলারের প্রতি আনুগত্য আদায় করা হলো। যাঁরা প্রতিবাদ করলেন, তাঁদের কাছে একটিমাত্র সম্মানের পথ খোলা থাকে—জার্মানি ছেড়ে চলে যাওয়া। অজার্মান ইহুদি বা প্রতিবাদীদের স্থান হিটলারের জার্মানিতে নেই। আইনস্টাইনেরও নেই। প্রতিবাদীর ছবির এলবামে তাঁর ছবির পাশে জার্মানিতে লেখা হলো, "Noch Unge

hangt"-- এখনো ফাঁসিতে ঝোলানো হয়নি।" ১৯৩৩-৩৪ সালে জার্মান জাতি বিপর্যস্ত, অসুস্থ মানসিকতার শিকার। বাঁধভাঙ্গা বেনোজলের ঘূর্ণিতে শালীন চিন্তা ও অশালীন-মাস্তানত্ব একাকার হয়ে যায়; বরং মাস্তানির ঘোলাজলে সবকিছু বিবর্ণ হয়ে ওঠে। কাপুথের বাড়ীতে ফিরে যাওয়া স্বপ্ন হয়ে দাঁড়ায়—তাঁর সব কিছু সঞ্চয় জার্মানিতে পড়ে থাকে।

তবু আইনস্টাইন অভাবী নন। লেইডন- অক্সফোর্ডের বৃত্তি আছে, বক্তৃতা থেকে উপার্জন আছে আর আছে বই-এর আয়। মিলেভা আর দুই ছেলেকে টাকা দিতে হয় না; যা আছে, যা উপার্জন হয়, স্বামী স্ত্রী আর সেক্রেটারি ডুকাস ও সহকারী মায়ের—এই চার জনের পক্ষে যথেষ্ট। প্রিন্সটনে যাবার চালাও আমন্ত্রণ আছে; সহকারী ডঃ মায়ের-কে সঙ্গে নিয়ে যেতে চান, সে বন্দোবস্তটিও ফ্লেক্সনার আর এলসা দুজনে মিলে করেন। আমন্ত্রণ আছে অন্যত্রও। আছে ব্রাসেলসে, মাদ্রিদে, ক্যালটেকে এবং হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ে। ফ্রান্সও চায় আইনস্টাইনকে; একটি স্পেশাল অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করে তাঁকে আনার চেষ্টা হয়, তবে প্রস্তাবটি টেঁকে না।

আইনস্টাইন এদিকে বহিষ্কৃত অধ্যাপকদের জন্য একটি উদ্বাস্তু বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার চেষ্টা করেন—সঙ্গী লিও শীলার্ড। এঁদের ইচ্ছা ইংলণ্ডে বিশ্ববিদ্যালয়টি হোক। হয় না, কারণ আইনস্টাইনের বাস্তবজ্ঞানের অভাব—কাজের রূপায়ণে বাধা তাঁর স্বপ্ন।

ওয়াইজমান হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর সহযোগিতা চান। প্যালেস্টাইন ইহুদি রিফুজির চাপে ভেঙ্গে যাচ্ছে। ওয়াইজমান সেই সংকটময় মুহূর্তে আইনস্টাইনের সাহায্য চাইলেন; ডঃ মেগনাসকে নিয়ে কি কাজ করা যায় না? আইনস্টাইনের উত্তর, যায় না। আরো বললেন, পাঁচ বছর আগে হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড থেকে পদত্যাগ করেছি—আমার কোন দায়িত্ব নেই।

নিজের বক্তব্যের সমর্থনে খবর কাগজে এক খোলাখুলি বিবৃত দিলেন আইনস্টাইন। ওয়াইজমানকে স্পষ্ট কিছু বললেন না, জানালেন না; নিজেদের মতবাদের পার্থক্যটা সোজাসুজি জনসাধারনের চোখের সামনে তুলে ধরলেন; সংকটের কালে, প্যালেস্টাইনের কর্তাব্যক্তির মতদ্বৈতটা বিরুদ্ধপন্থীদের কাছে বেশ আমোদের হয়ে দাঁড়াল।—ওয়াইজমান ক্ষোভে ফেটে পড়লেন!

আইনস্টাইনকে একটি দীর্ঘ চিঠি লেখেন ওয়াইজমান। তাঁর আগেকার সব কার্যকলাপ বর্ণনা করে লিখলেন।

"এই পরিপ্রেক্ষিতে, আমার মনে হয়, আপনার কাজটি বড়ই বিস্ময়ের এবং আপনার আচার ব্যবহার এতই অন্যায্য যে বিশ্ববিদ্যালয় অথবা আমার প্রতি আপনার ব্যক্তিগত ব্যবহারের ব্যাখ্যা যদি আমি দাবি করি সেটা অন্যায় হবে না। আর আপনি যদি মনে করেন, আপনার ব্যবহার অসঙ্গত, (আমার নিশ্চিত ধারণা আপনার তাই মনে হবে), তবে আপনার উচিত হবে বিবৃতিটি প্রত্যাহার করা। আপনি স্বনামধন্য সেইজন্য এই অসঙ্গত অন্যায় আঘাতের বেদনা এত বেশী; সত্যি বলতে কি —আপনার আচরণের কোন অর্থ আমি খুঁজে পাই নি।'

আইনস্টাইন তাঁর বক্তব্য প্রত্যাহার করলেন না, অন্য দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড থেকে ওয়াইজমান কেন যে পদত্যাগ করেন নি সেই আচরণের নিন্দা করলেন।

ইহুদি উদ্বাস্তুর স্রোত প্যালেস্টাইনে আছড়ে পড়ছে। টাকা নেই, টাকা সংগ্রহের চেষ্টাও ফলপ্রসূ হচ্ছে না, প্যালেস্টাইনের স্বয়ম্ভরতা বিপন্ন। এই সংকটে আইনস্টাইনকে কাছে পেলে ইহুদিদের জোর বাড়ে। আইনস্টাইন তবু অবিচল, তাঁর দায়দায়িত্ব নেই! অবশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ডের মিটিং ডাকা হয়। মেগনাসের কর্তৃত্বের হেরফের ঘটে। তাঁর প্রমোশন হয়, তিনি হন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট। আরেকজন নিযুক্ত হল রেকটর প্রেসিডেন্ট হিসেবে, তিনি হুগো বার্গমান। রেকটর প্রেসিডেন্টের এডমিনিস্ট্রেশন ক্ষমতা বেশী—আর প্রেসিডেন্ট যেন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার।

আইনস্টাইন যা চেয়েছিলেন, তাই হলো। তবু, তাঁর ইচ্ছাপূরণ হলো জটিল ঘোরালো পথে। সোজাসুজি বক্তব্য পেশ না করে, সোজা পথে না গিয়ে জটিলতার পথে গেলে মন কষাকষি বাড়ে, ব্যক্তিগত শত্রুতার সৃষ্টি হয়, আঘাত আসে, দুঃখ জোটে, আর নিজের জেদের জন্য পরিশেষে থাকে অনুতাপ, মনোবেদনা। এক্ষেত্রে তাই হলো। মেগনাসের ধারণা, ব্যক্তিগত আক্রোশে আইনস্টাইন তাঁকে জব্দ করলেন। কথাটা সত্য নয়। অন্যদিকে হুগো বার্গমানের পরিচালনায় হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি ঘটে—পরিচালকমণ্ডলী আর অধ্যাপকবৃন্দের মধ্যে সহযোগিতার পরিবেশ গড়ে ওঠে। তবু হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে জেদ আঁকড়ে থাকায় সেকালে তাঁর মনোবেদনাই জোটে।

হিটলারের জার্মানিতে, আড়ালে, তাঁর পরিচিত সহকর্মী সহকারীর দলকে ফেলে এসেছেন। তাঁর বন্ধু এরনফেস্ট সহসা কোন এক অজানা কারণে ১৯৩৩ সালের ২৫শে ডিসেম্বর লেইডনে আত্মহত্যা করলেন। এই সদাহাস্যময়, পরিহাস মুখর বিদগ্ধ লোকটি আইনস্টাইনের যে কতটা আপনার ছিল! ইউরোপ তাঁর কাছে বিস্বাদ বিবর্ণ মনে হয়, ইউরোপে থাকার আকর্ষণ তিনি আর খুঁজে পান না। ১৯২৭ সালের সলভে কনফারেন্সে ইলেকট্রন-প্রোটন আলোচনার সভায় যখন সব বিজ্ঞানীরা তাঁদের মতামত জানাতে গিয়ে চূড়ান্ত হট্টোগোলের সৃষ্টি করেছিলেন, সেই সময় এরনফেস্ট নীরবে ব্ল্যাক বোর্ডে লিখলেন, 'The Lord did there confound the language of all the earth—সারা জগতের ভাষা ঈশ্বর এখানে তালগোল পাকিয়ে রেখেছেন।' এরনফেস্টের মৃত্যুতে আইনস্টাইন বিভ্রান্ত, বিস্মিত হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন। তাঁর ভাষা-বুদ্ধিও বুঝি তালগোল পাকিয়ে যায়।

•

হঠাৎ খবর আসে মিলেভা ও তার ছোট ছেলে এডুয়ার্ড অসুস্থ। আইনস্টাইন তখন অক্সফোর্ডে, হার্বার্ট স্পেনসার লেকচারের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। এডুয়ার্ডের অসুস্থতার খবরে অস্থির হয়ে ওঠেন। মাইকেল এঞ্জেলো বেসোর চিঠিতে জানেন, এডুয়ার্ড সিজো-ফ্রেনিয়া রোগের শিকার—যে রোগ তখন পর্যন্ত চিকিৎসারহিত। মাথার অসুখ কিছুটা

বংশগত, মিলেভারও আছে মাথার অসুখ, যন্ত্রণা। সংশয়ের মধ্যে নিজেকে অপরাধী মনে হয়। কেন ভাল করে খোঁজ খবর নেননি বিয়ের আগে ; উন্মাদরোগে যে বংশগতি মেনে চলে। বেসোকে লিখলেন, "জীবনে সব কিছু আমি হয় হাল্কা ভাবে নিয়েছি, নয় নিজেকে সরাসরি দায়ী করিনি। কিন্তু এই ক্ষেত্রে নিজেকে দোষ না দিয়ে পারছি না।"

ওয়াইজমান অক্সফোর্ডে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান। আইনস্টাইনের সময়াভাব, তিনি ব্যস্ত বক্তৃতা রচনায়। তা ছাড়া তাঁর দায়দায়িত্ব নেই!

অক্সফোর্ডে রোডস হাউসে হার্বার্ট স্পেনসার লেকচার দিলেন, 'On the method of theoretical Physics—তাত্বিক পদার্থবিদ্যার গঠন সম্পর্কে। দু দিন পরে দিলেন ডিনেক (Deneke) লেকচার, লেডি মার্গারেট হলে। এখানে চিরন্তন খোঁজার কথা বললেন। "যত দূরে যাই তত অজানার পরিধির বিস্তৃতি চোখে পড়ে, আমার বিশ্বাস, মানুষের ইতিহাসে এই একমাত্র চিরন্তন।" এরপর গ্লাসগো এলেন, গিবসন লেকচার দিতে। কিছু আগে ভিন্ন ট্রেনে গ্লাসগো হাজির, তাঁকে নিয়ে যেতে কেউ আসেনি—অন্য-দিকে সিনেমার গায়িকা মিস টডের সংবর্ধনার জন্য সেদিন স্টেশনে প্রচণ্ড ভিড়। দিশেহারা আইনস্টাইনকে সামলে পৌঁছে দিলেন একজন সাংবাদিক। গর্বিণী মিস টড সব শুনে বললেন, 'আগে বললে না কেন, আমার ভিড়ের খানিকটা আইনস্টাইনকে দিয়ে দিতুম।' গ্লাসগো ইউনিভার্সিটি বুট হলে সমঝদার শ্রোতার কাছে বক্তৃতা দিলেন, 'The origin of the theory of the general theory of Relativity—সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বের সৃষ্টির মূল'। প্রথামত গ্লাসগোর ডক্টরেট ডিগ্রি পান আর তারপর ফিরে যান বেলজিয়ামে। কেণ্টারবারির ডীন হিউলেট জনসন, যাঁর কম্যুনিস্ট বা লাল মতবাদের দিকে ঝোঁক বলে প্রসিদ্ধি, তিনি এর কিছু আগে আইনস্টাইনের শান্তির জন্য শ্রম (Labour for Peace) ভাষণের কিছু কিছু অংশ সুবিধামত পরিবর্তন করে বামপন্থী সুবাস এনেছিলেন—তিনি আইনস্টাইনকে লণ্ডনে তাঁর কাছে যেতে আমন্ত্রণ করলেন। এই আমন্ত্রণ আইনস্টাইন প্রত্যাখ্যান করলেন। শান্তিবাদের প্রচারে অংশী হয়ে তিনি দেখেছেন, তাঁর মতবাদ ডান বা বাম মার্গীরা নিজেদের ইচ্ছেমত পালটে সুবিধেমত ব্যবহার করেছেন ; তিনি প্রতিবাদ করেন নি। শান্তির আহ্বানে যে কোন দলের সভা বা অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন, বাছ বিচার করেননি। তাঁর আদর্শ, তাঁর নিষ্ঠা, হৃদয়ের উদার প্রসারতার জন্য তিনি রাজ-নীতির জটিল জালে বারবার ধরা পড়েছেন ; জাল কেটে বেরুবার পদ্ধতি জানা নেই ; অন্যে তাঁকে ভুল বোঝে ; অথবা কেউ তাঁকে ভুল বোঝায়! ভুল বোঝাবুঝির জন্য গড়ে ওঠে অভিমান। ১৯৩৩-৩৪ সালে তিনি কিছুটা সাবধানী, সংযত। তৃতীয় আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট থেকে সম্পর্ক ত্যাগ করলেন। তিনি নির্দল, গণতন্ত্রী এবং নিছক শান্তিবাদী। তাঁর শান্তিবাদের দৃষ্টিভঙ্গীও পালটাতে থাকে, ঘটনারপরিণতির দিকে তাকিয়ে বোঝেন, অসহ-যোগিতা, অহিংসা একমাত্র হাতিয়ার নয় ; অহিংসা সর্বদমন সর্বত্রগামী নয়! ইউরোপের

সংস্কৃতি যাঁরা যুদ্ধের মারণাস্ত্রের মাধ্যমে বাঁচাতে চান, তাঁর ঝোঁক তাঁদের দিকে। ফ্রয়েডের ভয় সৃষ্টির পথে তাঁর যাত্রা। জার্মানির বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষাবৃত্তির প্রবর্তনের প্রতিবাদে তিনি আন্তর্জাতিক পুলিস বাহিনীর সৃষ্টি এবং আন্তর্জাতিক যুদ্ধ প্রতিরোধের জন্য সৈন্যবাহিনীর অস্তিত্ব চাইলেন। শান্তির পথিকের অন্য জন্ম হলো!

ইতিমধ্যে বেলজিয়ামে ফরাসীদেশীয় আলফ্রেড নাহোন সামরিক ট্রেনিং নিতে অস্বীকার করলেন; নাহোন শান্তিবাদী, সামরিক কাজ বা ট্রেনিং শান্তিবাদীরা গ্রহণ করবেন না; তাঁর অস্বীকৃতি প্রকৃত শান্তিবাদের ধর্ম ঘোষণা করছে। অথচ, নাহোনকে সানন্দে সামরিক কাজ নিতে আইনস্টাইন পরামর্শ দিলেন। বন্ধুরা বিশেষ করে রোম্যাঁ রোল্যাঁ আইনস্টাইনের এই যুযুৎসু মনোভাব দেখে দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ। সময়ের নির্দেশে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাপেক্ষে আইনস্টাইন মনে করেন শান্তির জন্য সংগ্রামে শুধু অহিংসা নয়, হিংসারও স্থানও আছে। আন্তর্জাতিক পুলিশ বাহিনী বা যুদ্ধ-প্রতিরোধ বাহিনীর সাহায্য দরকার —যুদ্ধের আগ্রাসী মনোভাবকে সংকোচন করতে এবং "ক্রমে ক্রমে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ভাব বৃদ্ধি পেলে এও অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠতে পারে"।

"আমার আদর্শ হলো আন্তর্জাতিক সালিশির মাধ্যমে সব বিবাদ বিসম্বাদ মিটিয়ে ফেলা। বছর দেড়েক আগেও ভাবতুম, এই পথে যাত্রার প্রস্তুতি পর্বে প্রথম প্রয়োজন হলো সব মিলিটারি কাজে যোগদানে দৃঢ় অসমর্থন।... আমি এখনও এই বিশ্বাস নিয়ে আছি যে সব আগ্রাসী ক্রিয়া দূর করতে হবে—দেশেদেশে জাতিতে জাতিতে উন্নত সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আমি মনে করি যারা এই আদর্শপূর্তির আশা জাগিয়ে রেখেছে সেই ইউরোপীয় দেশগুলি সম্মিলিত শক্তিকে দুর্বল করারজন্য কোন কিছু করা উচিত হবে না।'

হিংসার হুহুংকারকে শক্তির সাহায্যে দমন করতে হবে—এই তাঁর নতুন উপলব্ধি। তাঁর বন্ধুরা আবার দেখেন শক্তির প্রয়োগের কথা তিনি শুধু জার্মানি সম্পর্কে বলছেন—অন্যান্য দেশ সম্পর্কে তিনি মৌন!

এই সীমাবদ্ধ দৃষ্টি ইহুদী জাতীয়তাবাদে, শান্তি সমীক্ষায়, বা লিগ অফ নেশনের কার্যকলাপে প্রকাশ হলো। লিগ অফ নেশনের অফিসাররা তাঁর এই সঙ্কীর্ণতা দেখে বিস্মিত হন। বিজ্ঞানের চর্চা মানুষের মনের প্রসারতা ঘটায়—এ ধারণায় সংশয় দেখা দেয়। সমগ্র বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানের কোন কোন শাখায় যে মানুষটির প্রবল ও প্রচণ্ড সঞ্চারণ, তিনি সাধারণ, দৈনন্দিন জীবনে অন্যদের চেয়ে যে বেশী বুদ্ধিমানের মত ব্যবহার করবেন এ ধারণা, মনে হয়, অভিজ্ঞতার নিরিখে অসমীচীন। পরিবর্তিত পরিস্থিতি তাঁকে সমগ্রের ধারণা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ অংশের দিকে ফিরে তাকাতে উৎসাহিত করে।

চার্চিলের ধারণা আইনস্টাইন মানে এন্টি-জার্মান। অন্যদিকে রাশিয়ার কম্যুনিস্ট জুজুর প্রতিযোগী হলো হিটলারের জার্মানি। আইনস্টাইনের প্রখর জার্মান-বিরোধিতাকে চার্চিল সাময়িকভাবে কিছুটা সংযত করতে চান। তাঁর অনুরোধ ও আমন্ত্রণে কমন্স সভার সভ্য

লকার-লেম্পনের সাহচর্যে আইনস্টাইন ইংলণ্ডে আসেন।

চার্চিল-চেম্বারলেনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ আলোচনা হয় এবং এই বারই প্রথম দেখা করেন লয়েড জর্জের সঙ্গে। লয়েড জর্জের ভিজিটার বুকে সাক্ষর করে ঠিকানার কলমে লেখেন Ohne যার অর্থ without any, কিছু নেই! আইনস্টাইনের সঠিক নির্দিষ্ট ঠিকানা নেং—তিনি ঠিকানাহীন উদ্বাস্তু।

এই ঠিকানাবিহীন অবস্থার কথা উল্লেখ করে লকার-লেম্পসন কমন্স সভায় আবেগপূর্ণ ভাষণ দিলেন; ইহুদিদের পুনর্বাসনের জন্য যুক্তরাজ্যকে অগ্রণী হতে বললেন। কিছু কাজ হলো, তবু যতটা আশা করা গেছিল তার তুলনায় এটি নামমাত্র। রাদারফোর্ড স্বয়ং জার্মান রিফুজিদের জন্য ইনস্টিট্যুট সৃষ্টির সামিল হতে চেয়ে আরো এক কদম এগিয়ে ইনস্টিট্যুটটির প্রধান হতে স্বীকৃত হলেন। তবু রাদারফোর্ড বেঁকা প্রশ্ন তোলেন, আইন-স্টাইন নিজের জন্য দুটো-একটা চাকরি জুটিয়েছেন তো? জেমস জিনস বলেন, ব্যক্তিগত লাভ ক্ষতির দিকে আইনস্টাইনের দৃষ্টি নেই; তাঁর সমস্ত চেষ্টা জার্মানি থেকে বিতাড়িত উদ্বাস্তু বিজ্ঞানীদের, কলাবিদদের পুনর্বাসনে; নিজের জন্য আইনস্টাইন কারো মুখাপেক্ষী নন।

১৯৩৩-'৩৪ সালে ব্রিটিশ শিবিরে ফ্যাসিস্ট জার্মান জুজুর ভয় তখনো দেখা দেয় নি, উপরন্তু ব্রিটিশরা জার্মানদের চটাতে চান না। অজার্মান দেশগুলিতে একই চিন্তা। German menance বা জার্মানদের কাছ থেকে ভয় পাবার কথা আইনস্টাইন এবং কিছু লোক বলছেন; তবে ইউরোপের অন্যত্র হিটলারের অভ্যুত্থানকে জার্মানদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলেই ধরে নিচ্ছে। ইউরোপে ইহুদিদের পুনর্বাসন কিছুটা হলেও সেটা সার্বিক হলো না, সুষ্ঠুও হলো না। শক্তিশালী জার্মান শক্তির আবির্ভাব ব্রিটেন ফ্রান্সের কাছে আশীর্বাদ; রাশিয়ার বিরুদ্ধ শক্তি জার্মানি; অকম্যুনিস্ট দেশগুলির কাছে জার্মানি এক দেয়াল। ইতিমধ্যে স্পেনে গৃহযুদ্ধ বাঁধে। আর বিস্ময়ে আইনস্টাইন ও অন্যান্য শান্তিবাদীরা লিগ অফ নেশনস, জার্মানি ও রাশিয়ার অভিনয় দেখেন!

লকার-লেম্পসন নানা বিচিত্র ঘোষণার মধ্য দিয়ে জানাচ্ছেন যে আইনস্টাইনের জীবন-সংশয়—যে কোন মুহূর্তে জার্মান ফ্যাসিস্ট গুণ্ডারা এই আনমনা, ভোলেভোলা মনীষীটিকে হত্যা করতে পারে—যারা আইনস্টাইনের মত সর্বজনগ্রাহ্য বিজ্ঞানীকে হত্যা করার চেষ্টা করে, তাদের হাতে সাধারণ ইহুদিদের নিরাপত্তা কোথায়?

আইনস্টাইনকে সংরক্ষিত অবস্থায় লকার-লেম্পসন তাঁর নিজস্ব বাসভূমিতে প্রায় নজরবন্দী করে রাখেন। লকার-লেম্পসনের গল্পের একটা সূত্র অবশ্য ছিল। ৩১শে আগস্ট ১৯৩৩ সালে প্রকাশ হলো 'The brown book of Hitler Terror—by the World Committee for the Victims of German Fascism; হিটলারের নারকীয় অত্যাচারের উপর লেখা ব্রাউন বই—জার্মান ফ্যাসিস্টদের হাতে পীড়িত জনগণের সর্ব-

দেশীয় কমিটি দ্বারা প্রকাশিত।' লেখক হিসাবে অনেকের সঙ্গে আইনস্টাইনের নামও আছে। আইনস্টাইন সোজাসুজি লেখকত্ব অস্বীকার করেন, অন্যদিকে সব লেখার সম্পাদনা সংকলনের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। ক্রুদ্ধ জার্মান শাসক সম্প্রদায় আইনস্টাইনের মাথার দাম ঘোষণা করলেন হাজার পাউণ্ড। জানতে পেরে ছেলেমানুষের মত হেসে, আইনস্টাইন, বলেন, "আমার মাথার এত দাম? জানতাম না তো!"

লকার-লেম্পসন এইসব নানা ঘটনার ভিত্তিতে আইনস্টাইনের বিপদ ও তাঁর নিরাপত্তা নিয়ে এক রহস্য-রোমাঞ্চকর উপন্যাসের শরীরী রূপ দেন—আইনস্টাইন নিভৃতে লুকানো, চারদিকে তার গার্ড। লকার-লেম্পসনের ব্যক্তিগত মহিলা সচিবদ্বয় বন্দুক হাতে আইন-স্টাইনের কাছাকাছি আছেন, সামরিক সতর্কতার দৃষ্টি-জাল দিয়ে আইনস্টাইন ঘেরা। আর সবার উপরে লকার-লেম্পসন ক্ষণে ক্ষণে ঘোষণা করেন, মাভৈঃ, আইনস্টাইন সুস্থ, বহাল তবিয়তে খুশহাল আছেন!

এই সময়ে নিউ স্টেটসম্যান পত্রিকা সম্পাদকীয়তে লিখলেন,

"আমাদের যুগে আইনস্টাইন দ্বৈত প্রতীক—অপার বিশ্বের শীতলতম দুরান্তয় অভিযানের মননের তিনি প্রতীক, আবার তিনি সাহসী, উদার বৃন্তচ্যুত এবং শুদ্ধ অন্তকরণ আর আনন্দময় চৈতন্যের প্রতীক। চেয়ে দেখুন সমুদ্রের বলাভূমিতে অঙ্কক্ষায় নিমগ্ন একজন চার্লিচ্যাপলিন যার ললাট সেক্সপিয়রের। নাজিরা যে তাঁর বিরুদ্ধে বিষোৎগার করে চলেছে সেট অভাবনীয় নয়। যারা তাদের পছন্দ নয়, আইস্টাইনের সংগ্রাম তাদের জন্য, ব্রণ্ড পশুদের বিরুদ্ধে তিনি দাঁড়িয়েছেন—একজন বুদ্ধিমান, স্বতন্ত্র, আন্তর্জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী, শান্তি প্রেমিক, আবার দুষ্টুমি হাসিখুশিভরা ছোট্ট শয়তান। এলবার্ট আইনস্টাইনকে যে এই জঘন্য পশুগুলো আঘাত করবে না, এটা ভাবাই যায় না।'

একমাত্র জন্মে ইহুদি বলে, ধর্মে ক্রিশ্চান, মনেপ্রাণে জার্মান, বিজ্ঞানী হাবেরের স্থান হিটলারের জার্মানিতে হলো না। তাঁকেও বিতাড়িত করা হলো। প্রথম মহা-যুদ্ধের বিষ-ধোঁয়ার আবিষ্কারককে কোন ইউরোপীয় রাষ্ট্র ঠাঁই দিতে চাইল না। ওয়াইজমান তাঁকে প্যালেস্টাইনে যেতে বললেন; তাঁর পূর্বপুরুষের বাসস্থান, যেখানে আছে শান্তি, স্বস্তি, আরাম আর আনন্দ। হাবের সেই স্বর্গলোকের দিকে যাত্রা করলেন আর শীতে, পথের কষ্টে, যাত্রাপথে মারা গেলেন। হাবের তাঁর পিতৃভূমিতে পৌঁছুতে পারলেন না।

ঘরহারা যাযাবর ইহুদিদের দল আরেকবার পথে নেমে এল। ওয়াইজমানরা এই নতুন ইহুদিদের স্রোতে বেসামাল। আর আইনস্টাইন কোন সক্রিয় সাহায্য দিতে পারলেন না।

লিণ্ডামান তাকে পাকাপাকিভাবে অক্সফোর্ডে রাখতে চান। আইনস্টাইন বলেন, আবার আসব; অক্সফোর্ডের সঙ্গে সম্পর্ক যে অচ্ছেদ্য। দিনে দিনে তা দৃঢ় হয়ে উঠেছে। —অন্যদিকে ব্রিটেন থেকে আমেরিকা যাবার তোড়জোড় করেন। লিণ্ডামান তাকিয়ে দেখেন। নিন্দুকেরা বলে লকার-লেম্পসনের বাড়াবাড়িতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে আইনস্টাইন ইউরোপ ছাড়লেন।

সেদিন, আইনস্টাইন যখন অক্সফোর্ডে, তাঁর বন্ধু এডলার তখন লণ্ডনে। সেদিন, দুই বন্ধুর খবরাখবর কেউ জানেন না। তাঁরা দুই মেরুর পথিক। এডলার সোশালিস্ট, সংগঠনের কাজে ব্যস্ত। আইনস্টাইন শান্তিবাদী, আন্তর্জাতিব, বিজ্ঞানী,- শান্তি-আন্তর্জাতীয়তা-বিজ্ঞান সব ক্ষেত্রে এককে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে বিফল হয়ে হতাশ। জার্মান জুজুকে ব্রিটেন-ফ্রান্স তখনো তোয়াজ করছে, ইউরোপ আর পুরনো পৃথিবী সভ্যতার বলিদানের যজ্ঞে দর্শক। হয়তো নতুন পৃথিবীতে তখনো সততা, মূল্যবোধ ও আত্মদান আছে।

৭ই জুলাই ১৯৩৪ সালে, ইংলণ্ড ছেড়ে নিউইয়র্কে যাত্রা করলেন এলবার্ট আইনস্টাইন।— ইউরোপ ছেড়ে আমেরিকায়। তাঁর বয়স তখন পঞ্চান্ন বছর।

আলোর ভক্ত

প্রিন্সটনে স্থায়িভাবে এলবার্ট আইনস্টাইন যোগ দিলেন। ঢিলেঢালা পোশাক, এক মাথা সাদা লম্বা আলুথালু চুলের মুকুট, তীক্ষ্ণ চোখ, নাতি-স্থূল, নাতি-তীক্ষ্ণ নাসা আর ঝুলো গোঁফের পরিহাসোজ্জ্বল একজন বিজ্ঞানী। ১'৭৬ মিটার লম্বা লোকটি ইউরোপের প্রচণ্ড শক্তিমান, প্রায় ১'৬ মিটার লম্বা হিটলারের প্রতিদ্বন্দ্বী, আমেরিকায় আইনস্টাইন হলেন বালক ডেভিড যিনি বিরাট ক্ষমতাশালী গলিয়াথ হিটলারকে আক্রমণের সাহস রাখেন। আইনস্টাইন সেই চমকপ্রদ গল্পের নায়ক যিনি আলোকে বাঁকাতে পারেন, মহাবিশ্বের খবর দেন, সৃষ্টিকর্তা গডের রোজনামচার ভাষা ব্যাখ্যা করতে পারেন। অল্প কদিনের মধ্যে প্রিন্সটন বিদ্যাপীঠ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের আপামর জনসাধারণের কাছে আইনস্টাইন ইনষ্টিট্যুট নামেই পরিচিত হয়ে উঠল।

এদিকে আইনস্টাইনের নিরাপত্তা নিয়ে কর্তৃপক্ষের চিন্তা। লকার-লেম্পসনের আড়ম্বরের ঢেউ আটলান্টিক পার হয়ে এপারেও এসেছে। আইনস্টাইনকে হত্যা করা হতে পারে, সুতরাং তাঁকে লুকিয়ে রাখা দরকার, তাঁর ঠিকানা যেন কেউ না জানে। ঠিকানা-শূন্য লোকটি একটি ঠাঁই পেলেও বেশির ভাগ লোকের কাছে ঠিকানা ছাড়া হয়ে আছেন—তিনি প্রিন্সটনে আছেন, এটুকু সর্বসাধারণের জানা।

আর আইনস্টাইনও সেই রকম। নিজের বাড়ির ঠিকানাটাও মনে রাখতে পারেন না। গল্পে আছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন প্রফেসর আইসেনহার্টের বাড়িতে সন্ধ্যের দিকে ফোন বেজে ওঠে।...কি চাই? আইনস্টাইনের বাড়ির ঠিকানাটা দয়া করে একটু বলবেন!... না, ঠিকানা জানানো হবে না।—এবং তারপর ফোন নিস্তব্ধ। আবার ফোন বেজে ওঠে, সেই একই গলা অপরাধী কণ্ঠে, চুপিচুপি বলেন, দেখুন আমি আইনস্টাইন; আমার বাড়ির ঠিকানাটা আর পথের হদিশটা ভুলে গেছি, দয়া করে জানাবেন?...

জীবনের প্রথম দিকে বাড়ির চাবি-ভোলা ছেলেটি মাঝবয়সে ঠিকানা ভুলছেন। অন্যদিকে প্রথম জীবনে নব বিজ্ঞানের দরজার চাবিটি তিনি খুলেছিলেন, আর তারপর থেকে খুঁজছেন বিশ্বের সব শক্তির সব ক্ষেত্রের উৎসের সঠিক ঠিকানা!

প্রিন্সটনের বাচ্চাদের কাছে আইনস্টাইন ভারি প্রিয়; তাদের সঙ্গ তাঁর ভাল লাগে। ছাত্ররা তাঁর ভালবাসার। অন্যদিকে পোশাকে পরিচ্ছদে চার্লি চ্যাপলিনের এক নব সংস্করণ তিনি। কোট-জ্যাকেট পরেন না। গলাবন্ধ সোয়েটার পছন্দ। টাই নেই, মোজা নেই, টুপি পরলে পরেন সাধারণ হাল্কা খড়ের টুপি। চুল লম্বা, গোঁফ আছাঁটা আর মাঝে মাঝে সোয়েটারের উপর লম্বা-হাতা শার্টের হাতটা কেটে তাই পরে ঘুরে বেড়ান। শোনা যায়, গায়ে মাখা সাবান দিয়ে দাড়ি কামান। প্রশ্ন করলে ভারি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করেন, "সেকি, দুরকমের সাবান আবার কেন?"—মোজা কেন পরেন না? একগাল হেসে উত্তর দেন, "মোজা বড্ড ছিঁড়ে যায় যে!" ইংলণ্ডে কেন থাকলেন না শুধোলে ভয়ানক গম্ভীর হয়ে সিরিয়াস মুখে বলেন, "বড্ড বেশী সাজ পোশাকের, আচার-আচরণের বাড়াবাড়ি ওদেশে। আমার অতো ঝামেলা-ঝক্কি পোষায় না।"—এই অভিনব চরিত্রটির পপুলার হতে দেরী হল না। নানা গল্প তাঁর নামে চালু হলো, আর পাগলা দাশুর গল্পের মতো সব গল্প তাঁকে মানায়। নামে পাগলা প্রফেসর হলেও, দুষ্টুমি করতে, খুনসুটি করতে ভালবাসেন। তাঁর স্থিতপ্রজ্ঞ মনের মুক্তি ছাত্র আর শিশুদের খোলামেলা মনের এলোমেলো বাতাসে।

প্রিন্সটনে ছাত্ররা আইনস্টাইনের নামে গান লিখে গাইতেন

> The bright boys they all study Maths,
> And Albie Einstein points the paths.
> Although he seldom takes the air
> We wish to God he'd cut his hair.
> (ভাল ছেলেরা কষে অঙ্ক/ আইনস্টাইন নিয়ম শেখান,
> বাইরে যেতে যার আতঙ্ক/কাটতে চুল যে জন ডরান।)

গান শুনে মহাখুশি আইনস্টাইন, একগাল হাসতেন, কখনো রাগের ভঙ্গী করে তাড়া করে যেতেন অথবা জিভ ভেঙচাতেন। আইনস্টাইন মানে বাইরের জগতে একটি বিদ্রোহী বোহেমিয়ান দুষ্টুমিভরা জীবনচর্চার আমেজ। ভেতরে ভেতরে আইনস্টাইন ক্রমশ নিঃসঙ্গ হয়ে উঠছেন। নানা প্রতিষ্ঠানের দিক থেকে তাঁর সময়ের উপর দাবি বেড়ে চলেছে বাইরের জগতের কোলাহল-মুখর পথে চললেও তিনি স্বতন্ত্র, বহু ভাবনা, বহু চিন্তার ভিড়ে তাঁর নিজস্ব চিন্তাভাবনাটুকু বিশিষ্ট। নৈতিক দায়িত্বের বন্ধন থাকুক না কেন, আত্মার দিক থেকে তিনি বন্ধন-মুক্ত।

বিলাস-আরামের উপকরণের বাহুল্যবর্জিত তাঁর জীবনে মাত্র কয়েকটি উপকরণ দরকার—কিছু সাদা কাগজ আর পেন্সিল, যা দিয়ে অঙ্ক কষবেন, পদার্থবিদ্যার সমীকরণ সমাধান

করবেন ; আবার পছন্দ না হলে যাদের তিনি ছুঁড়ে ফেলে দেবেন। একটা বাক্সে ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি তাঁর স্টাডিতে রাখা আছে ; এলসার ইচ্ছে ঘরময় কাগজ ফেলে নোংরা না করে তাঁর এলবি একটু গোছালো হন। এলসার কথা সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করেন আইনস্টাইন, আর কাজের সময় কাগজ ফেলেন যত্র তত্র।

প্রিন্সটনের বিদগ্ধ সমাজে আইনস্টাইন একটি সুন্দর ব্যতিক্রম! আর কথাবার্তা? মুডে থাকলে ভারি আড্ডাবাজ, মজার মজার কথা বলেন ; মজার কথা, তবু বেশ অর্থবহ। প্রোফেসর আইসেনহার্ট একবার আড্ডায় জিজ্ঞেস করেন, কোন ইতিহাস-পুরুষের দেখা পেলে তিনি খুশি হবেন? আইনস্টাইনের উত্তর, "মুসা। জানতে চাই তাঁর অনুগামীর দল তাঁর আইন এত দীর্ঘদিন ধরে মানবেন এটি তিনি কি জানতেন?"

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। প্রেসিডেন্ট আর মিসেস রুজভেল্ট আইনস্টাইনের ব্যবহার দেখে ভারি খুশি ; "ঠিক যেন বিজ্ঞানী, তাই না?"—ফিরে এসে রুজভেল্টকে ধন্যবাদ জানিয়ে একটি ছড়া লিখে পাঠান। (আইনস্টাইন লিখিত এই ছড়াটির হদিশ বহু চেষ্টা করেও পাওয়া যায়নি।)

প্রিন্সটনে স্থিতু হয়ে বসতে বেশী সময় যায় না। এই সম্মানিত দুঃখী পরিবারটি প্রতিবেশীদের কাছে স্বাভাবিকভাবেই একাত্ম হয়ে ওঠে,—প্রতিবেশীদের ছোট ছেলে-মেয়েরা অপরিচয়ের গণ্ডী প্রথম ভাঙে।

তাঁর প্রথম কাজ কিন্তু প্রিন্সটনে ইহুদিব জন্য অর্থসংগ্রহ। এই সময় হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে কিছুটা আগ্রহ জেগে ওঠে। জার্মান থেকে বিতাড়িত ইহুদি বিজ্ঞানীরা প্যালেস্টাইনে অনেকেই যেতে চান। আইনস্টাইনের পরামর্শ, বুড়ো হাবড়া লোকদের বাদ দিয়ে তরুণ যুবকদের কাজে সুযোগ দেওয়া হোক। তরুণ রক্ত এই প্রাচীন ইহুদি জাতটাকে নতুন করে গড়ে তুলতে পারবে ; দরকার যদি হয়, বৃদ্ধেরা পরামর্শ দিতে পারবে।

মনের মধ্যে একটি ছোট কাঁটা খচখচ করে—সেটি অক্সফোর্ডের ক্রাইস্ট চার্চ কলেজের রিসার্চ স্টুডেন্ট পদটি। অক্সফোর্ডে যাওয়া হয় না, যেতে পারছেন না, এবং সম্ভবত ভবিষ্যতেও যেতে পারবেন না। শ্রোয়েডিঙ্গার প্রিন্সটনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন, তাঁকে এই সংকটের কথা জানান। তাঁর ইচ্ছে, তাঁর স্টাইপেণ্ডের টাকাটা সম্ভব হলে অক্সফোর্ড যেন দুঃস্থ বিজ্ঞানীদের সাহায্যের জন্য দিয়ে দেন।

হিটলারের রাজত্বে যাঁরা অজার্মান অর্থাৎ ইহুদি, সেই সব বিজ্ঞানীরা বিতাড়িত। এডিংটনের চেষ্টায় ফ্রয়েনড্লিশ স্কটল্যাণ্ডের St Andrews কলেজে স্থান পান ; শ্রোয়েডিঙ্গার এদিক ওদিক ঘুরে স্থিতু হন ডাবলিনে। মাক্সবোর্ন কিছুদিন কেম্ব্রিজে সাময়িকভাবে থেকে স্থায়ীভাবে যোগ দেন এডিনবরায়। লিও শীলার্ড হাঙ্গেরি থেকে পালিয়ে ইংলণ্ডে কিছুদিন থেকে চলে আসেন যুক্তরাষ্ট্রে। একদা আইনস্টাইনের সহকারী, জন্মে, বংশে জার্মান, অটো স্টার্ন তাঁর কাজ-কর্মের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হতে দেখে পদত্যাগ করে

জার্মানি ছেড়ে যুক্তরাষ্ট্রের কার্নেগি ইনষ্টিট্যুটে চলে আসেন। শুধু আইনস্টাইনের বন্ধু ফন লাউএ জার্মানি ছেড়ে যান না ; বেড়িয়ে এসেও আবার ফিরে যান; কারণ, "ওদের আমি এত ঘৃণা করি যে ওদের কাছে আমাকে থাকতে হবে। আমাকে ফিরে যেতে হবে।" চোদ্দ পুরুষে জার্মান ফন লাউএ শুধু নাৎসিদের ঘৃণা করার জন্য জার্মানি ফিরে গেলেন।

প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানীরা কোথাও না কোথাও স্থান পাচ্ছেন, সাধারণ বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ বা অধ্যাপকদের সেই সৌভাগ্য নেই। এই দুঃস্থ বিজ্ঞানীদের সাহায্যের জন্য আইনস্টাইনের বৃত্তির টাকাটা দেওয়া যায় না ?

ডাবলিনে যাবার পথে শ্রোয়েডিঙ্গার ইংলণ্ডে আইনস্টাইনের অভিলাষ লিণ্ডামানকে জানালেন। ইতিমধ্যে আইনস্টাইনও সবকিছু জানিয়ে সোজাসুজি লিণ্ডামানকে চিঠি দিয়েছেন, আইনস্টাইন আর যাবেন না, তবু তাঁর বৃত্তির টাকাটা দুঃস্থ বিজ্ঞানীদের সাহায্যে দেওয়া যায় না ? লিণ্ডামানের চেষ্টায় তিন বছরের বৃত্তি ১২০০ পাউণ্ড বৃন্তচ্যুত বিজ্ঞানীদের সাহায্যের জন্য অক্সফোর্ড বিদ্যালয় দান করেন।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম দিকটা বাইরের জগতের দাবি মিটাতে আইনস্টাইন ব্যস্ত। হিটলারের আগ্রাসী মনোভাবের দিকে বিশ্বের বিবেকবান লোকেদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা, জার্মানি থেকে বিতাড়িত বিজ্ঞানীদের পুনর্বাসনের চেষ্টা আর সবার উপরে নতুন যাযাবর ইহুদি-জাতির স্থায়িত্ব চিন্তা ইত্যাদির প্রচেষ্টায় যে সব বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সক্রিয়, তাদের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে তিনি জড়িয়ে পড়তে থাকেন। মনে মনে তিনি কোন দলের শামিল নন, অথচ প্রায় প্রতিটি মানব হিতৈষী দলে আইনস্টাইনের নাম আছে। সমস্ত দলের উর্ধ্বে থেকেও তিনি মানুষের আত্মঘাতী ধ্বংসের জন্য সংগ্রাম করতে আগ্রহী।

তাঁর এই নিরাসক্ত নৈর্ব্যক্তিক নিরলংকার দৃষ্টিভঙ্গী তাঁকে দার্শনিকের রূপে অনেকের কাছে প্রতিষ্ঠিত করে। তাঁর জীবনদর্শনে মোহ নেই, সেন্টিমেণ্ট নেই,—মানুষের ভবিষ্যৎ নিয়ে শুধু সংশয় আছে। তাঁর বিশ্বাস, একদিন আত্মরক্ষার খাতিরে মানুষের পৃথিবীকে একরাট হতে হবে। বহুধা বিভক্ত পৃথিবীকে এক হতে হবে ; ঐ একত্বে মানব-জাতির সুষমা।

তাঁর আন্তর্জাতিকতাবাদ, শান্তিবাদ সব কিছুর মধ্য থেকে একটি সত্য উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিচ্ছে—একটি রাষ্ট্রোত্তর সংস্থা প্রতিষ্ঠান করা ; কোন একটি বিশেষ জাতির একতরফা সমরসজ্জা, যা সাধারণ অনিশ্চয়তা আর বিভ্রান্তিকে বাড়িয়ে তুলবে—এর প্রতিষেধক হবে এই রাষ্ট্রোত্তর সংস্থা।

মানবীয় দিক বাদ দিয়ে কোন ধর্ম দাঁড়াতে পারে না। আশা-আকাঙ্ক্ষা আর মূল্যবোধের জন্য বৃহত্তর মানবতাবোধ সুনির্দিষ্ট আধারের অবলম্বন এনে দেয়—এইতো ধর্ম।

"সমগ্র মানব জাতির সেবার জন্য ব্যক্তি মানুষ যাতে তার ক্ষমতা মুক্তভাবে প্রয়োগ করতে পারে তার জন্য অবাধ ও দায়িত্বপূর্ণ বিকাশের প্রয়োজন। এতে কোন ব্যক্তি বিশেষ তো দূরের কথা, কোন বিশেষ শ্রেণী, গোষ্ঠী বা জাতির উপর দেবত্ব আরোপ করার সুযোগ নেই। ......ব্যক্তি মানব একমাত্র আত্মার অধিকারী আর ব্যক্তিমানবের মহান কর্তব্য হলো সেবা করা। শাসন বা অন্য কোন উপায়ে নিজেকে কারো উপরে চাপিয়ে দেওয়া তার স্বধর্ম নয়। বাইরের আবরণ ঘুচিয়ে যদি এর মূল বস্তুর দিকে কেউ তাকায়, তা হলে দেখব গণতন্ত্রের মূলনীতি হলো এই উক্তি। যথার্থ গণতন্ত্রী তার নিজের জাতির ততটুকু সেবা করতে পারে যতটুকু একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব। ধর্মপ্রাণ শব্দটিকে এখানে আমি যে অর্থে বলছি, সেই ভাবে গ্রহণ করতে হবে।"

আইনস্টাইনের কাছে ধর্ম হলো মানবতাবাদী গণতন্ত্রের ধারণা। ধর্মের চিন্তা, মানবতাবাদ আর গণতন্ত্র একসূত্রে বাঁধা।

অন্যদিকে বিজ্ঞানেও সেই এক ধারণা। বিজ্ঞান আর ধর্মে প্রভেদ নেই, প্রভেদ দেখার ভঙ্গীতে।

"বিজ্ঞান শুধু 'কি' তার উত্তর দিতে পারে, 'কেন' বা 'কি হওয়া উচিত' এ প্রশ্নের মীমাংসা করার সাধ্য বিজ্ঞানের নেই। তাই বিজ্ঞানের পরিধির বাইরে সবকিছুর মূল্যবোধের বিচারের সুযোগ থাকে। অন্যদিকে ধর্ম শুধু মানুষের কাজ আর চিন্তার মূল্যায়ন করে, প্রকৃততথ্য আর তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ বিষয়ে কথা বলার অধিকার এর নেই। ......ধর্ম আর বিজ্ঞানের বিহার ক্ষেত্র যদিও আলাদা তবুও এদুটির মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ আর নির্ভরশীলতা রয়েছে। ধর্ম হয়তো মানবজীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করে, তবু বিজ্ঞানের কাছ থেকে সেই লক্ষ্যে পৌঁছুবার সঠিক পথটির পাঠ তাকে গ্রহণ করতে হয়েছে। যারা সত্য এবং বোধী লাভের আকাঙ্ক্ষায় পরিপূর্ণ ভাবে নিমগ্ন, তারাই বিজ্ঞান সৃষ্টি করতে পারে। অবশ্য অনুভূতির এই উৎসমুখ রয়েছে ধর্মের এলাকায়। এরই শাখায় আছে, থাকে, একটি সম্ভাবনায় বিশ্বাস— এই অস্তিত্বময় জগতের মূলে যে সব কারণ আছে,তা যুক্তি দিয়ে তাদের বোঝা যায়। এই বিশ্বাস নির্দ্বিধায় গ্রহণ না করলে, আমার মনে হয় কেউ যথার্থ বিজ্ঞানী হতে পারেন না। ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান পঙ্গু, আর বিজ্ঞান ছাড়া ধর্ম অন্ধ।"

গণতন্ত্রের সাধনা ও মানবতাবাদ, ধর্ম এবং বিজ্ঞান : এরা পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক, নির্ভরশীল এক মহাভাবনার উৎস থেকে এই চিন্তা নির্গত। আন্তর্জাতিকতা, ধর্ম, শান্তিবাদ সব নৈতিক ধ্যানধারণার মূলে আছে একটি সত্য, অখণ্ড মানবিকতাবোধ। ফন লাউএ ১৯৩৩ সালে তাঁকে বলেছিলেন, রাজনীতির জগতে বিজ্ঞানীরা মৌন থাকবেন ; অথবা বৃহত্তর ক্ষেত্রে মানুষের পদার্পণকে এড়িয়ে যাবেন বিজ্ঞানী।—আইনস্টাইন এই বক্তব্য মানতে পারেন নি। তাঁর মতে বিজ্ঞানীরা মানব সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন একটি ক্ষুদ্র অংশ নয় ; সর্বসাধারণের মধ্যে আছে, এবং থাকবে বিজ্ঞানীরা। সাধারণের মধ্যে থেকেও তাঁরা দায়িত্বভার সচেতন সমাজের ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত একটি বিশিষ্টের দল। তাঁরা স্পিনোজার কথিত সেই বুদ্ধিমানের দল, যাঁরা বুদ্ধিমান বলেই, ঈশ্বরের বেশী কৃপা পেয়েছেন বলেই, বেশী দায়িত্বের অধিকারী। তিনি মনে করেন, বিজ্ঞানীরা শুধু যে দায়িত্বসম্পন্ন তা নয়, তাঁরা ধার্মিক—মানুষের অগ্রসরের ইতিহাসে যুক্তির সাহায্যে অস্তিত্বের মূলটিকে বারবার তাঁরা জানাবেন ; তাঁরা শিক্ষক।

১৯৩৪-৩৯ সাল পর্যন্ত চিন্তার এই ক্রমবিকাশ ঘটতে থাকে আর সবার উপরে থাকে বিজ্ঞানে তার একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বের আলোচনা।

ইতিমধ্যে পরিবারের বৃদ্ধি ঘটে। ১৯৩৪ সালে বড মেয়ে ইলসের (Ilse) অসুস্থতার খবরে এলসা ফ্রান্সে চলে যান। কাছাখোলা স্বামীটির ভার নেন ডঃ ও মিসেস বাকি (Bucky) এবং সেক্রেটারি মিস ডুকাস। বোড আইল্যাণ্ডে বাকি পরিবারের অতিথি হয়ে দিন কাটান আইনস্টাইন, সঙ্গী দুজন কিশোর বালক। কোলাহল ও গতি থেকে দূরে শান্ত, স্থির, নির্জন জগতে তিনটি অসম বয়সী শিশু ও বৃদ্ধশিশু সময় কাটান আর তাদের দিকে দৃষ্টি রাখেন মিসেস বাকি ও মিস ডুকাস। নিরবচ্ছিন্ন, নিরুপদ্রব অবসর।

ইলসের মৃত্যু হয়। এলসা ফিরে আসেন। আর তারপর শুরু হয় ইউরোপ থেকে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের আগমন। আসেন এলসার দ্বিতীয় কন্যা মার্গট, ইলসের স্বামী রুডলফ কাইসের, সবার পরে ডাক্তার প্লেখ; যাকে ছেড়ে বাবার কাছে চলে আসে এলবার্ট-মিলেভার বড় ছেলে হান্স আইনস্টাইন আর ১৯৩৭ সালে আসেন বোন মাজা।

১৯৩৫ সালে ১১২ নম্বর মেসার (Mercer) স্ট্রিটে একটি বাড়ি কেনেন আইনস্টাইন। আর এই বছরেই জার্মানিতে ফেলে আসা তাঁর আসবাব-কাগজপত্র ফরাসীদের হাতঘুরে আমেরিকায় তাঁর কাছে আসে। নতুন বাসা পুরোনো আসবাবে ভাবি আরামে সেজে দাঁড়ায়।

১৯৩৬ সালের ২৮শে মার্চ বুধবার সস্ত্রীক আইনস্টাইন, মিস ডুকাস এবং মার্গট আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব পান আর ঠিক তার পরদিন জানা গেল জার্মান সরকারের আদেশে তিনি জার্মানির নাগরিকত্ব এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধে হারালেন।

এই ১৯৩৬ সালে এলসাও অসুস্থ হয়ে পড়েন। ১৯১৯ থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ ষোল বছরের সঙ্গী এলসা, যখন আইনস্টাইন প্রতিষ্ঠিত-সম্মানিত মহাবিজ্ঞানী, যখন বিজ্ঞান-সাধনার নির্জন অঞ্চল থেকে বেরিয়ে তিনি বাইরের জগতে এলেন। মিলেভার সঙ্গে বিবাহ জীবনে তিনি একজন অনুভূতি-শূন্য কট্টর যুক্তিবাদী বিজ্ঞানী ছিলেন। ছিলেন মানুষের অনুভূতি বিশ্লেষণের সবরকম বৌদ্ধিক বা মানসিক শক্তি বিবর্জিত একজন নিরাসক্ত সন্ন্যাসী। তাঁর নিরাসক্তির প্রখর দাহ মিলেভার কাছে অসহনীয় ছিল, দুজনের মধ্যে শ্রদ্ধা-ভালবাসা থাকলেও, ছিল না সহানুভূতি বা সহনশীলতা। ৬।৭ বছরের মধ্যেই বিয়ের আকর্ষণ কেটে যায়, তারপরও থাকে মানিয়ে নেওয়া, মানিয়ে চলার চেষ্টা। বার্লিনে আসার পর সেই চেষ্টাও বিনষ্ট হয়। তাঁর নির্মোহ, নিরাসক্ত, অনুভূতির শূন্য-রূপ স্ত্রী মিলেভা সহ্য করতে পারেননি—সেই রূপ শুধু দুঃসহ নয়, অসহ।

অন্যদিকে দ্বিতীয় বিবাহ পর্বে তিনি বাইরের রঙিন পৃথিবীর একজন রূপতাপস, যাঁর ঘরের পালে বাইরের উত্তাল হাওয়ার ইশারা। তাঁর তপস্যায় আছে মানবতা, শান্তির রূপাকৃতি, আছে বিজ্ঞানের রাজত্বে অনন্ত একের প্রতিষ্ঠা। শান্তি-ভরা, সহযোগিতাভরা, মানব-দরদী

একটি একরাট পৃথিবীর রূপ তাঁর স্বপ্ন আর অন্য আরেকটি স্বপ্ন হলো সৃষ্টির রহস্যে সেই একটি নিয়মকে জানা যেখানে সব শক্তি-ক্ষেত্রের জন্ম, যেটি সব শক্তি-ক্ষেত্রের উৎস। সর্বতোভদ্র পৃথিবী আর সর্বানুভূতত্ত্ব এই তাঁর কল্পনা, তাঁর আকাঙ্ক্ষা। এই বাসনার রঙিন স্বপ্নে বিভোর থেকে তিনি আপনজনকে অবহেলা করেছেন, বন্ধুদের আঘাত করেছেন, আশা-আকাঙ্ক্ষার তীব্র আকর্ষণের টানে দ্বিধার দোলায় দুলেছেন, সংকট ঘটিয়েছেন, সংশয় সৃষ্টি করেছেন। এই পর্যায়ে তাঁর সাথী ও রক্ষক, বন্ধু ও পালক স্ত্রী এলসা। মিসেস আইসেনহার্ট একদিন আইনস্টাইনকে বললেন, "মনে হয় আপনার স্ত্রী আপনার কাছে সবকিছু, কি আপনি তাঁকে দিয়েছেন?" আইনস্টাইন বলেন, "মনের মিল। তাঁর আর আমার মধ্যে বোঝাপড়ায় অসঙ্গতি নেই।"

গর্বিণী এলসা, আইনস্টাইনের সুখে সুখী। নিশ্চিন্তে ঘোষণা করেন, এলবি সব জানে। অথবা, সৃষ্টির রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য বিরাট বিরাট বীক্ষণাগার বা অবজারভেটরি দেখে বলেন, এসব তো এলবির কাগজে লেখা আছে। তবু কোন এক নিভৃত অবসরে, অশান্ত মুহূর্তে এই নারীটি চুপিচুপি কখনো কখনো বলেছেন, "জানেন আমার জন্য, আমার কথা ভেবে উনি কখনো কিছু করেন না। শুনেছি প্রথমা স্ত্রীর জন্য সাজসজ্জা করতেন, আমার জন্য তাও করেন নি।" অসুস্থ অবস্থায় আইনস্টাইনের সাহচর্য মনে মনে তিনি চেয়েছিলেন, তাঁর শারীরিক উপস্থিতি তাঁর কাছে কত যে সুখের, কত যে আনন্দের। তাঁর সামান্য কুশলসংবাদ-জিজ্ঞাসা কত যে শান্তি এনে দেয়। তাঁর এলবির কর্তব্যের জগতে আপনজনদের, প্রিয়জনের জন্য সময়ের বড় অভাব। এলসা যা চান, হয়তো সেটি ভুল করে চাওয়া, যা পাচ্ছেন, সেও যে অনেকখানি। অসুখের সময়, তবু, এলসা বহুবার তাঁর একাকিত্বের কথা বলেন। এই নিঃসঙ্গতা একজনের অদর্শনে, অভাবে। আর সেই একজন তখন বিশ্বের এবং বিজ্ঞানের একাত্ম খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে এলসা খোঁজ নেন এলবির খাওয়া হয়েছে কিনা; তাঁর যে নাওয়া-খাওয়ার হুঁশ থাকে না, তাঁকে তাগিদ দিতে হয়। মিস ডুকাস আর কন্যা মার্গট এলসার সেবা করেন আর এলসা বলেন, এলবার্টের দিকে দৃষ্টি দিতে।...সূর্যের তেজ তার স্ত্রী সংজ্ঞা সইতে পারেনি, পালিয়ে গিয়েছিলেন। বিশ্বকর্মা সূর্যের তেজের হ্রাস করে তাকে সংজ্ঞার কাছে সহনীয় করেছিল। যৌবনের প্রদীপ্ত এলবার্ট হয়তো বা মিলেভার কাছে অসহনীয়, আর বিশ্বজগতের পরিব্রাজক এলবার্ট—সেও কি এলসার কাছে সহনীয় ছিল?

একমাথা এলোমেলো কেশরের মত ঝাঁকড়া চুল আইনস্টাইনকে দেখে অনেকে বিটোফেনের কথা ভাবেন। বধির বলে অন্তর্মুখী, স্বভাব-গম্ভীর মুখচোরা বিটোফেন, চেহারায় হয়তো সুশ্রীতার অভাব আছে, অথচ হেসে উঠলে সারামুখ হাসির ছটায় ভরে ওঠে, মনে হয় কি সুন্দর। সঙ্গীতে, সৃষ্টিতে মগ্ন হলে, মনে হয়, কি অবাস্তব তিনি! আইনস্টাইনকে দেখে এলসা বিটোফেনের ধ্রুপদী সুরের স্পর্শ পান। এলবি কি যে সুন্দর, অথচ কি অবাস্তব।

কত সরল, অথচ লোকে তাঁকে ভাবে জটিল।
যিনি বিটোফেনের জীবন সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে ভরে দিতে চেয়েছিলেন, চেষ্টা করেছিলেন, তাঁর সম্বন্ধে বিটোফেন বললেন, "ইনি এবং এজাতীয় লোকেরা আমাকে কি দিতে পারে, আমার কাছে সেটুকুরই মূল্য। এদের আমি যন্ত্র ভাবি, যখন ইচ্ছে হয় এই যন্ত্রে সুর তুলি।" এই নিরাসক্ত স্বার্থপরতা কি এলবার্টের মনে? এলসা শিউরে উঠে ভাবেন, না এলবি বোধশূন্য স্বার্থপর দানব নন। এলবি একটি শিশু, যে শিশুর মতই স্বার্থপর; আপনজনের কাছে তাঁর শিশুর মতই দাবি। এলসা বলেন, বিজ্ঞানের খেলায় মাতলে, এলবির বাহ্যজ্ঞান থাকে না, না ডাকলে নাওয়া-খাওয়া করেন না, ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েন, এমনি অবুঝ! তাঁর অবর্তমানে এলবির কি হবে? অসুস্থতার চেয়েও এলবির ভবিষ্যৎ ভেবে তাঁর দুশ্চিন্তা। সংসারের কাজ, নিজের কাজ এলবি আপন হাতে করছেন, এ তিনি ভাবতে পারেন না! ভাবা যায় না।
এই দুর্ভাবনার বোঝা নিয়ে ১৯৩৬ সালের ডিসেম্বর মাসে এলসা মারা গেলেন।
আইনস্টাইনের জন্য সেদিন কর্মযোগ ছিল, ছিল বিশ্বলোক। শোকের অবসরটুকু সামান্য·

তবু এলসার মৃত্যুর পর আইনস্টাইন দেহেমনে বৃদ্ধ হয়ে ওঠেন। বলেন, "বড় ক্লান্ত লাগে, চিন্তা করার শক্তি কমে আসছে, সহজে আর অঙ্ক কষতে পারিনে!" নিজেই বলেন, "প্রিন্সটনের ওরা আমাকে বুড়ো হাবড়া ভাবছে!"
বিজ্ঞানী লিওপোল্ড ইনফেল্ড এই সময়ে ইউরোপ থেকে আমেরিকায় পালিয়ে এলেন। একটা কাজ জুটিয়ে দিতে আইনস্টাইনকে অনুরোধ করেন ইনফেল্ড। প্রিন্সটনে কিছু হয় না। ইনফেল্ড লেখেন, "বেশির ভাগ অধ্যাপক প্রিন্সটনে আইনস্টাইনকে প্রাগৈতিহাসিক ফসিল ভাবেন, তাঁদের কাছে তিনি জীবন্ত বিজ্ঞানী নন।" বিজ্ঞানের নতুন ধারা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে আইনস্টাইন একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব গঠনে ব্যস্ত। নববিজ্ঞানের সম্ভাবনার, অনিশ্চয়তার ধারাটুকু সেই অনন্য তত্ত্বটিকে জানলে নিশ্চিত হবে, জানা যাবে অনিশ্চয়তার কারণটি। অনিশ্চয়তার জগৎ তিনি মানেন না, তাকে জানতেও চান না— তাঁর প্রয়োজন নেই; বিজ্ঞানের প্রবাহ থেকে সরে এসে নিজের জগতের কাঠামো, নিজের জোগাড় করা মালমশলা দিয়ে গড়তে চাইলেন, সেটি অন্যের কাছে অবোধ্য; আর যা ঘটছে, যা জানা যাচ্ছে, তিনি তার ত্রিসীমানায় হাঁটতে চান না। দুর্বোধ্য, অবোধ্য বিজ্ঞানে হাতড়াচ্ছেন তিনি; শুধু এ কারণেই মাক্স বোর্নকেও প্রিন্সটনে আনতে পারলেন না। মাক্স বোর্ন লিখলেন, "প্রিন্সটনে চাকরি পাওয়া গেল না। বিদ্যালয়ের আধুনিক মুরুব্বিদের কাছে একটি ফসিলই যথেষ্ট।"
মনের এই জড়তার কালে ইনফেল্ড-এর সাহচর্য ভাল লাগে। ইনফেল্ড বলেন, বই লিখে উপার্জন করলে কি হয়। আইনস্টাইন অমনি এক পায়ে খাড়া। দুজনে মিলে পপুলার

সায়েন্স বই লেখেন, "পদার্থ বিদ্যার অভিব্যক্তি" (The Evolution of Physics)। ১৯৩৭ সালে বইটির প্রকাশ হলো আর অতি দ্রুত এটি বিখ্যাত হয়ে ওঠে। বিক্রি ভাল হয়, ভাল টাকা জোটে; ইনফেল্ডের তাৎক্ষণিক অভাবের উপশম হয়।

১৯৩৯ সাল আসে। আইনস্টাইনের ষাট বছর পূর্ণ হয়। বিপত্নীক, আপনভোলা লোকটি প্রতিদিন নিজের কাজটি করে যান—যেখানে প্রধান হলো একীভূত ক্ষেত্রের গবেষণা। আর কাজ করেন সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের উপর। বারবার তিনবার তারা জানিয়েছে মাধ্যাকর্ষের ফলে আলোর গতিপথ বাঁকে, তবু সংশয় থাকে। আলোর পথ বাঁকে, আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য কমে যায়—এগুলি পরীক্ষিত; তবে পরিমাণ বা মাত্রায় সন্দেহ। যন্ত্রপাতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মাপ জোঁকে ভুলের সম্ভাবনা কমে আসে—মনে হয় যতটুকু বিচ্যুতির কথা তিনি তাঁর তত্ত্বের গণিতের ছকে জানিয়েছেন সেই ঘোষণায় বুঝি ভুল আছে। তা ছাড়া আছে মহাবিশ্বের আকৃতি, তার গঠন-রহস্য—এটিও তাঁর গবেষণার বিষয়। তবে এখানে তিনি একা নন। অনেক বিজ্ঞানী এই রহস্যের সমাধান করার চেষ্টা করেছেন, তিনি সেই অনেকের একজন। আর আছে কোয়াণ্টাম তত্ত্ব—অনিশ্চয়তার জগতে যেটি হাজির। এই অনিশ্চয়তাকে তিনি মানতে পারছেন না—এটিকে অপ্রমাণ করার জন্য তিনি চেষ্টা করে যান!

বিজ্ঞান ছাড়াও আছে, শান্তিবাদের আলোচনা, আন্তর্জাতিকতা-বিশ্বমানবতার আহ্বান। এছাড়াও থাকে দৈনিক চিঠির উত্তর দেওয়া। বহু চিঠি তিনি পান, বেশির ভাগই অদ্ভুত। রবীন্দ্রনাথের পাগলা ফাইলের চিঠির বয়ানের মত অজস্র চিঠি।—মিস ডুকাস এসব চিঠির অনেকগুলি তাঁর বকলমে উত্তর দেন। কাগজ-পত্র-পত্রিকা ঠিক রাখেন; যেটি তিনি পড়তে চান বা যেটিতে তাঁর ইণ্টারেস্ট সেটুকু তিনি দাগ দিয়ে, নিশানা দিয়ে রেখে দেন। দুপুরের দিকে লাঞ্চের পর সামান্য একটু বিশ্রাম ছাড়া দিনেব বাকি অংশটুকু তিনি বিদ্যালয়ে নিজের কাজের ঘরটিতে সহকারীদের সঙ্গে কাটান। আর সন্ধ্যাবেলায় পায়চারি করেন; কখনো কখনো বা ছুটিছাটায় লং আইল্যাণ্ডের সমুদ্রের তীরে নৌকো চালান।

১৯৩৯ সালে ইউরোপে মহাযুদ্ধ বাধে আর এমনি সময়ে তার নিস্তরঙ্গ বাঁধাধরার দিনগুলিতে আসেন শীলার্ড, একান্তে আইনস্টাইনের সঙ্গে দেখা করে আলোচনা করেন, বিষয় পারমাণবিক শক্তি। সব শুনে বিস্ময়ে আইনস্টাইন বলে ওঠেন, "Daran habe ich gar nicht gedacht"—"আমার ধারণায় এটা আসেনি!"—

১৯০৫ সালে প্রকাশিত তার বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বে তিনি ভর ও শক্তির সমীকরণটি জানিয়েছিলেন, $E=mc^2$। এই সমীকরণটি সে আমলে জার্মানি, সুইজারল্যাণ্ড, পোলাণ্ড বা চেকোশ্লোভাকিয়ায় যখন ব্যাখ্যা করে সামান্য ভরের পরিবর্তে অসামান্য শক্তির প্রাপ্তির কথা বলতেন, তখন অনেক শ্রোতা জানতে চাইতেন কিভাবে এই শক্তিকে পাওয়া যেতে পারে। আইনস্টাইন বলতেন, "এই প্রাপ্তি আমাদের জীবনে সম্ভব নয়।"

বিশেষ আপক্ষিক তত্ত্বের অন্য সব উপপত্তির প্রমাণ ১৯৩৭ সালের আগেই পাওয়া গেছে, ভরশক্তির সাজুয্যের প্রমাণ সুস্পষ্টভাবে জানা যায়নি। এই রূপান্তরের যে সব তথ্য জানা গেছে, তার আলোচনার সময় আইনস্টাইন স্বয়ং উপস্থিত থাকলে ভারি খুশি হয়ে বলতেন, 'ভারি আশ্চর্য," কিংবা "তাই নাকি" অথবা "কি অদ্ভুত"! শক্তিভরের রূপান্তরের তথ্যভিত্তিক প্রমাণ তাঁর জীবনে পাওয়া যাবে না, এ তাঁর ধারণা।

প্রমাণ এলো দেরীতে, কিছুটা ঘুরপথে।

১৯১৯ সালে এডিংটন যখন রয়েল সোসাইটিতে আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের আলোর গতিপথের বিচ্যুতির প্রমাণ ঘোষণা করছেন, সেই মিটিংএ কিছু দেরী করে এলেন আর্নস্ট রাদারফোর্ড। তাঁর দেরির অজুহাত জানিয়ে বললেন, "একটু ভাঙাগড়ার জন্য ব্যস্ত ছিলাম।" এই ভাঙাগড়া কেভেণ্ডিস লেবরেটারির ভাঙাগড়া নয়। রাদারফোর্ড মূলপদার্থের রূপান্তরের চেষ্টা করছিলেন। ঐ এক ৯১৯ সালেই তিনি নাইট্রোজেনকে হিলিয়াম দিয়ে আঘাত করে পেলেন তেজস্ক্রিয় অক্সিজেন, পর্যায় সারণীর সাত নম্বর মৌলের পরিবর্তে পাওয়া গেল আট নম্বর মৌল। মূল পদার্থের রূপান্তর সম্ভব হলো। ১৯৩২ সালে ককরফট আর ওয়ালটন দ্রুতগামী হাইড্রোজেন-প্রোটনের আঘাত দিয়ে লিথিয়াম ধাতু ভাঙলেন—মৌলটি ভাঙা গেল আর জানা গেল ভাঙাগড়া দুটি পদ্ধতি দিয়ে মৌলের রূপান্তর সম্ভব।

ধাতুকে ভেঙে ফেলে অসম্ভব শক্তি পাওয়া যেতে পারে, যদি ভাঙার গুলিটি ঠিকমত এটমের কেন্দ্রে আঘাত করতে পারে। আইনস্টাইন হেসে বলেন, "এ তো সহজ নয়; আকাশে যখন সামান্য কয়েকটা পাখি, সেখানে এ চেষ্টা অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া।" আর রাদারফোর্ড একটি শব্দে তার বক্তব্য জানালেন, "Moon shine"—পাগলামো। ১৯৩৭ সালে রাদারফোর্ডের মৃত্যু হলো। জীবিত কালে ধাতুর ভাঙা বা ফিসনের ফলে অসম্ভব শক্তির প্রকাশ তিনি দেখে গেলেন না—তবে এটির সম্ভাবনাকে মুখে নাকচ করলেও, লেখায় প্রকাশ করে গেলেন। শীলার্ডের অন্যরকম চিন্তা। আইনস্টাইন বলেছেন টার্গেটটি দুরুহ আর গুলি ছোঁড়া হবে আন্দাজে, অন্ধকারে। যদি গুলি না ছুঁড়ে ছররা মারা যায়, আর যদি পাওয়া যায় এমন ছররাগুলি, যা চার্জহীন বলে এটমের কেন্দ্রে সহজে যেতে পারে তবে অসম্ভব সম্ভব হতে পারে। গুলি পাওয়া গেছে আগে, ১৯৩২ সালে চাডউইক চার্জহীন নিউট্রনের আবিষ্কার করলেন। এই নিউট্রনের আঘাতে যদি কোন মৌলকে ভেঙে আরো নিউট্রন পাওয়া যায় যারা আরো এটম ভাঙতে পারে তবে চেন রি-অ্যাকসনের ফলে নিউট্রনের সৃষ্টির ধারা আর ভাঙার প্রবাহ অবিরাম বয়ে যাবে, অনেক ভরের পরিবর্তনে পাওয়া যাবে অসম্ভব শক্তি। নব উৎসের ধারণাটি গোপনে শীলার্ড পেটেন্ট নেন আর ব্রিটিশ এডমিরালটি অফিসে এই অসম্ভব শক্তিপ্রাপ্তির সম্ভাবনাটি জানান।

এর কিছু পরে চাডউইকের নিউট্রনের ধারা দিয়ে এনরিকো ফের্মি ইউরেনিয়াম ধাতুর

এটমকে আঘাত করে পেলেন নতুন এক ধাতু যা ইউরেনিয়াম নয়, ইউরেনিয়ামের পরবর্তী কোন এক নতুন অজানা ধাতু !—ফের্মি তার আবিষ্কার ঘোষণা করলেন।

ফের্মির যুগান্তকারী পরীক্ষা নিয়ে বিভিন্ন দেশে কাজ শুরু হয়। জার্মানিতে অটো হান আর ফ্রিৎস স্ট্রাসমান এবং ফ্রান্সে ফ্রেদরিক ও আইরিন জুলিও কুরি কাজ করেন। হানদের কাজের ফলে কি পাওয়া যায় তার ব্যাখ্যা জানান ভিয়েনার মহিলা বিজ্ঞানী লিসে মীটনার, যাঁকে আইনস্টাইন সসম্মানে বলতেন আমাদের মাদাম কুরী। মীটনারের সঙ্গে আলোচনার পর হান ও স্ট্রাসমান আরো ধৈর্য এবং সাবধানতা নিয়ে কাজ করেন, বুঝতে চান ইউরেনিয়ামকে নিউট্রন দিয়ে আঘাত করে কি পাওয়া যাবে।

ইতিমধ্যে হিটলার অষ্ট্রিয়া অধিকার করেছেন। ইহুদি লিসে মীটনার তাঁর অষ্ট্রিয়ার নাগরিকত্ব হারিয়ে পেলেন জার্মান নাগরিকত্ব।—মীটনার ইহুদি, বন্দী হবার ভয়ে জার্মানি ছেড়ে হল্যাণ্ড হয়ে পালিয়ে আসেন সুইডেনে। ইতিমধ্যে হান ও স্ট্রাসমান ১৯৩৮ সালের শেষাশেষি তাঁদের কাজটি শেষ করেন। ভারি ধাতু ইউরেনিয়ামকে নিউট্রন দিয়ে আঘাত করে পাওয়া গেল একটি ইউরেনিয়ামোত্তর ধাতু যেটি ভেঙে গেল দুটি অন্য ধাতুতে এবং পাওয়া গেল দুটি নিউট্রন ও কিছুটা শক্তি। লিসে মীটনারের ভবিষ্যদ্বুক্তি মিলে গেল। সফল বিজ্ঞানী দুজন তাদের কাজের ফলাফল মীটনারকে সুইডেনে জানালেন।

সেদিন মীটনারের কাছে বেড়াতে এসেছেন তার ভাইপো কোপেনহাগেনে নীয়েলবোরের ছাত্র, বিজ্ঞানী অটো ফ্রিশ। পিসী ভাইপোকে হানদের কাজ নিয়ে কথা বলেন, ভাইপোকে হানদের পরীক্ষার তাৎপর্য বোঝান—বোঝান ভরের রূপান্তরে শক্তি পাবার কথা এবং নিউট্রন পাবার সম্ভাবনা। সবার উপরে চেন রি-অ্যাকশন ঘটার প্রস্তাবনা; অনন্ত শক্তি, প্রায় অপরিমেয় শক্তিপ্রাপ্তির দ্বারে বিজ্ঞান হাজির। নিউট্রনের ধারার সৃষ্টির ফলে নতুন শক্তির উৎসটি হাতের নাগালে এসে গেছে। পিসীর পরামর্শে ভাইপো ফ্রিশ ডেনমার্কে ফিরে এসে বোরকে তখনো অজ্ঞাত হানদের পরীক্ষার ফলাফল জানান। বোর সেদিন আমেরিকায় তাত্ত্বিক পদার্থবিদদের পঞ্চম কংগ্রেসে যোগ দেবার জন্য রওনা হচ্ছিলেন। উত্তেজিত বোর জাহাজটিকে প্রায় মিস করেন। আমেরিকায় এসে শীলার্ড ও ফের্মিকে হানদের পরীক্ষার ফল আর মীটনারের ব্যাখ্যা জানান বোর। আর সব কাজ ফেলে শীলার্ড ও ফের্মি হানদের পরীক্ষাটি কলম্বিয়া পরীক্ষাগারে পুনরাবৃত্তি করেন। তাঁরাও নিউট্রনের ধারা পেলেন। ফ্রান্সে জুলিও দম্পতি প্রমাণ করলেন যে নিউট্রনের ধারা পাওয়া যায়। তাঁরা এটম ভাঙার এই নব রীতির নাম দিলেন ফিসন। ফিসনের ক্রিয়ার ফলে চেন রি-অ্যাকশনের সাহায্যে পারমাণবিক শক্তি পাওয়া যাবে—এটম বানানো সম্ভব। ১৯৩৯ সালেই সে সম্ভাবনা জানা গেল—অবিশ্বাস্য কাণ্ড! কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির ডীন অফ গ্রেজুয়েট ফেকালটির জর্জ পেগ্রাম এই সম্ভাবনার কথা ইউ এস এ'র সামরিক বিভাগকে জানাতে শীলার্ড আর ফের্মিকে বললেন। অন্যদিকে হল্যাণ্ড, ফ্রান্স, সর্বত্র

পরমাণু-বিভাজন নিয়ে আরো কাজ চলে। দেখা যায় সবচেয়ে সুবিধাজনক ধাতু ইউ-রেনিয়াম আর সেদিনের পৃথিবীর ইউরেনিয়ামের প্রায় সবটাই পাওয়া যায় বেলজিয়াম কঙ্গো থেকে। সব রাষ্ট্র তড়িঘড়ি বেলজিয়ামে ইউরেনিয়ামের অর্ডার দেয়—সবার ইচ্ছে জার্মানির হাতে যেন ইউনিয়ামের সম্ভার না পড়ে। জার্মান শিবিরেও এদিকে এটম বোমার ধারণা দানা বাঁধে –বিজ্ঞানের মাধ্যমে জার্মান সামরিক অধিকর্তারাও ওয়াকিবহাল হন। পরমাণু-বিভাজন গবেষণা দু' শিবিরে জোর কদমে এগিয়ে চলে।

বিতাড়িত বিজ্ঞানী শীলার্ড প্রভৃতির ইচ্ছা জার্মানির হাতে যেন ইউরেনিয়াম না পড়ে। জার্মানিকে ইউরেনিয়াম না দেবার ক্ষমতা আছে বেলজিয়াম সরকারের,—যার রাজা আইনস্টাইনের পরিচিত। তা ছাড়া, আইনস্টাইনের নামে তখনো বিদ্যুৎ গতিতে কাজ হয়। শীলার্ড আইনস্টাইনকে ব্যবহার করতে চাইলেন।

১৯৩৯ সালে কয়েকবারেই শীলার্ড আইনস্টাইনের সঙ্গে দেখা করতে এলেন, সঙ্গে নিয়ে এলেন এডুয়ার্ড টেলের (Teller) নামে একজন হাঙ্গেরিয়ান বিজ্ঞানীকে যিনি পরবর্তীকালে হাইড্রোজেন বোমার সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য কাজ করেন। শক্তিভর রূপান্তর এবং পারমাণবিক বিভাজনের এই নতুন চেহারা দেখে আইনস্টাইন বিস্মিত, বারবার বলেন, "আমার ধারণায় এটি আসেনি।" আইনস্টাইন বোঝেন, নিষ্ঠুর জার্মানদের হাতে ইউরেনিয়াম ধাতু যাওয়া মানে পৃথিবী আর মানবজগতের ধ্বংসের অপ্রতিহত ক্ষমতা জার্মানদের হাতে আসা।

নীয়েল বোরও এ সময়ে দেখা করতে আসেন—তিনিও জানান পারমাণবিক শক্তি প্রাপ্তির সম্ভাবনা; তাঁর সমীকরণ $E=mc^2$ প্রমাণ হতে চলেছে; সামান্য ভরের রূপান্তরে পাওয়া যাচ্ছে অমেয় শক্তি। বোরকে আইনস্টাইন বলেন, "আমার জীবিত কালে এ শক্তি পাওয়া যাবে, ভাবিনি।"

শক্তি প্রাপ্তির এই সম্ভাবনাকে নাকচ করা যায় না, অন্যদিকে German menace বা জার্মানদের দিক থেকে বিপদ সম্পর্কে আইনস্টাইনের কোন দ্বিধা নেই। আইনস্টাইনের সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক হয় বেলজিয়াম সরকারের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ করা যুক্তিযুক্ত হবে না। সাধারণ বিজ্ঞানীদের রাজনৈতিক জগতের জটিলতার আবর্তে না যাওয়ায় ভাল। যতবড় বিজ্ঞানী আইনস্টাইন হোন না কেন, তাঁর বক্তব্যের গুরুত্ব বেলজিয়ামের রাজা অনুধাবন করলেও, তাঁর মন্ত্রীসভাকে স্বমতে আনানো কঠিন হতে পারে। ঠিক হয়, সব ঘটনাটা এবং ঘটনার প্রচণ্ড গুরুত্বটা প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে জানান সমীচীন। তিনি পরবর্তী ধাপগুলি সহজেই পার হয়ে যা উচিত তা করতে পারবেন। আইন-স্টাইনের সঙ্গে আলোচনা করে শীলার্ড দুটি চিঠির খসড়া করেন, একটি সংক্ষিপ্ত আর দ্বিতীয়টি কিছু দীর্ঘ। এর যে কোন একটি প্রেসিডেন্টকে পাঠানো হবে ঠিক হয়। আইনস্টাইন দুটি চিঠিই সই করেন পরে অবশ্য দীর্ঘ চিঠিটি পাঠান সাব্যস্ত হয়। এবার কাজ এই চিঠিটি সোজাসুজি রুজভেল্টের হাতে পৌঁছুনো। পৌঁছুনোর দায়িত্ব পরে রুজ-

ভেল্টের বন্ধু বিখ্যাত ইকনমিস্ট ডঃ আলেকজান্ডার সাশের (Sachs) উপর। ২রা আগস্ট তারিখে সই করা ঐ চিঠি এবং সঙ্গে পত্রের পরিশিষ্টে শীলার্ডের একটি মেমোরান্ডাম রুজভেল্ট ডঃ সাশের মারফত ১১ই অক্টোবর পান। ডঃ সাশ স্বয়ং চিঠিটি রুজভেল্টকে পড়ে শোনান। সেদিনই তাঁর কাছে ছিলেন প্রেসিডেন্টের মিলিটারি এ্যাটাশে জেনারেল ওয়াটসন। রুজভেল্ট চিঠিটি তাঁর হাতে দিয়ে বলেন, "ডাড, দেখতো; মনে হচ্ছে ব্যাপারটা গুরুতর।" এরপরই সৃষ্টি হয় ব্রিগস কমিটি, যার কাজ হলো পারমাণবিক বিভাজন আর বিস্ফোরণের সম্ভাব্য দিকটা খুঁটিয়ে দেখা অন্যদিকে সরকারী শাসকদের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পারমাণবিক বিজ্ঞানীদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে ডঃ শাসকে বলেন। আইনস্টাইন, বিজ্ঞান জগতে আইনস্টাইন এক সুপরিচিত নাম, তাঁর বক্তব্য আর উপদেশের ফলে ব্রিগস কমিটির কাজ এগিয়ে চলল। অথচ ডঃ শাসকে তাঁর বক্তব্য জানালেও, সোজাসুজি কমিটির কাছে আইনস্টাইন নিজেকে জড়াতে চান না, বিভিন্ন অজুহাতে এড়িয়ে চলেন।

শীলার্ড কিন্তু কাজের অগ্রগতিতে সন্তুষ্ট নন। ইতিমধ্যে পারমাণবিক বিভাজন নিয়ে আরো কাজ হয়েছে, শীলার্ড নিজেও একটি উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন; তাঁর কাজের ফলে এটম বোমা সৃষ্টির আরেকটি ধাপ পার হওয়া গেল। শীলার্ড সুস্পষ্টভাবে বললেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী আর সামরিক অধিকর্তাদের মধ্যে আলোচনা দরকার, নইলে তিনি তাঁর কাজ আর গোপন রাখবেন না, প্রকাশ করে দেবেন। ব্রিগস কমিটির ধীরে-যাবার নীতি পরিবর্তিত-পরিস্থিতিতে খাপ খায় না। রুজভেল্ট অবশেষে সামরিক অধিকর্তা এবং বিজ্ঞানীদের আলোচনায় ডাকেন। এবারও আইনস্টাইন অসুস্থতার অজুহাতে অনুপস্থিত রইলেন। তাঁর বক্তব্য এবারও জানালেন ডঃ শাস। আলোচনার ফলে পারমাণবিক বোমার সম্ভাবনা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৯৪০ সালের ৭ই মার্চ তারিখে গড়ে ওঠে U.S. সিনেটের পারমানবিক শক্তি স্পেশাল কমিটি।

আবার শীলার্ড আসেন আইনস্টাইনের কাছে। যুদ্ধ ঘনিয়ে উঠেছে—জার্মানদের অগ্রগতি অক্ষুণ্ণ। অন্য দিকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পারমাণবিক শক্তির গবেষণায় এটম বোমা সৃষ্টির পথটি সুগম হয়ে দাঁড়াচ্ছে। যুদ্ধে জিততে হলে, যুদ্ধ থামাতে হলে এটম বোমা জার্মানির আগে তৈরি করা দরকার। রুজভেল্টকে আরেকটি চিঠি লেখেন বিজ্ঞানীরা—সাক্ষরকারীর প্রথমে আছেন আইনস্টাইন। রুজভেল্ট পারমাণবিক শক্তির ভীষণতা উপলব্ধি করেন, বোঝেন জার্মানির আগে এই বোমা তৈরি করা প্রয়োজন। কিছুদিনের মধ্যে সৃষ্টি হলো মানহাটান প্রজেক্ট।

অনেক পরে আইনস্টাইন এই ঘটনার উল্লেখ করে তাঁর চরিতকারকে বললেন, "আমি শুধু টাইপকরা চিঠির নীচে সই করেছিলাম। দায়দায়িত্ব আমার; তবে রচনা আমার নয়।" রচনাটি শীলার্ড প্রমুখ বিজ্ঞানীদের।

মানহাটান প্রজেক্টে আইনস্টাইন প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নন। কখনো কিছু একটা

তাত্ত্বিক সমস্যার সমাধানের জন্য তাঁর পরামর্শ চাওয়া হয়েছিল—কি জন্য পরামর্শ দরকার আইনস্টাইনকে জানানো হয়নি। সামরিক বিভাগের আইনস্টাইন সম্পর্কে একটা দ্বিধা থাকে; তাঁর বামপন্থী ধারণার কথা, তাঁর স্পষ্ট কথা বলার অভ্যেস, সামরিক গোপনতার পক্ষে আদর্শ নয়। মানহাটান প্রজেক্টে। গবেষণার বিষয় অফিসিয়েলি আইনস্টাইন জানতেন না, এবং হয়তো তিনি জানতে চাননি। তাঁর মনের গড়ন, তাঁর কাজের চরিত্র, তাঁর জীবনযাত্রা তাঁকে নিরাসক্ত হতে শিখিয়েছে। জীবনযাত্রার উপকরণ, বা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয়, যা তাঁর প্রয়োজন নেই, সেখানে তিনি নিস্পৃহ, কৌতূহলরহিত। তাঁর জানার ইচ্ছে নেই, জানলেও ভুলে যেতে আপত্তি নেই। এটম বোমা তৈরির খবর আইনস্টাইন হয়তো পেয়েছিলেন, তবে তাঁর নিরাসক্ত উদাসীন স্মৃতিতে এই খবর কোন ছাপ ফেলেনি। তিনি পরে বলেছিলেন, তিনি এটি জানতেন না।

ইতিমধ্যে আমেরিকা যুদ্ধে নেমেছে। প্রতিরক্ষার কাজে যৎসামান্য অংশ নিয়েছেন আইনস্টাইন। নিজের প্রারম্ভিক পেপারগুলির পাণ্ডুলিপি যুদ্ধের সাহায্যের জন্য নিলামে বিক্রি করতে দেন। বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের মূল পাণ্ডুলিপিটি হারিয়ে যায়, প্রকাশিত পেপার থেকে নিজের হাতে কপি করেন। চারটি পাণ্ডুলিপি থেকে নিলামের ডাকে পাওয়া গেল সাড়ে ছয় মিলিয়ন ডলার।

যুদ্ধের কাজে নিজে থেকেই অংশ নিচ্ছেন। পরম শান্তিবাদীদের যুদ্ধের সময় যুদ্ধশীল রাষ্ট্রের যে কোন কাজে অসহযোগিতার বক্তব্য তিনি মানতে পারছেন না। তাঁর পরিবর্তিত মত হলো, সব কিছু পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। শান্তিবাদের জগতে কোথাও নেই সেই পরম তত্ত্ব। যুদ্ধে জিততে হবে—এটা হলো সাধারণ বুদ্ধির কথা।।

এই যুদ্ধে পারমাণবিক গবেষণায় সব পারমাণবিক বিজ্ঞানী শামিল; একজন শুধু ব্যতিক্রম। তিনি মাক্স বোর্ন। এটম বোমার গবেষণায় বোর্ন অস্বীকৃতি জানান, এটি বিজ্ঞানীদের কাজ নয়। অথচ তার সহকারী ফুক্স আণবিক বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক গবেষণা ত্যাগ করে আমেরিকা যান মানহাটান প্রজেক্টে যোগ দিতে। এই ফুক্স পরে এটম বোমা তৈরির গোপন তত্ত্ব ব্রিটেন ও রাশিয়ার কাছে ফাঁস করেন।

মাক্স বোর্ন অবশ্য যুদ্ধের কাজে ছোটখাট সহায়তা করেছেন। তাঁর আপত্তি এটম বোমা সৃষ্টির কাজে অংশী হতে। আইনস্টাইনকে যুদ্ধের কাজে অংশী হতে দেখে তিনি বিস্মিত হন না। পরিস্থিতি ও ঘটনা কার্যকরণ নিয়ন্ত্রণ করে। আইনস্টাইন ব্যতিক্রম নন; তাঁর বর্তমান কাজ পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাপেক্ষ বিচার্য। বোর্ন লিখলেন,

"ঘটনার ফল থেকে তিনি এই শিক্ষাই নিতে পারলেন যে, যে-সব মৌলিক নৈতিক মূল্যবোধের উপর মানুষের অস্তিত্ব দাঁড়িয়ে আছে, তাদের যে করে হোক টিকিয়ে রাখতে হবে; দরকার হলে শক্তির প্রয়োগ করতে হবে, মানুষের জীবন বিসর্জন যদি দরকার হয়, তাও দিতে হবে!"

১৯৪৪ সালে তাঁর একটি জীবনী প্রকাশ হয়। লেখক এলসার ছোট মেয়ে মার্গটের ডিভোর্স করা ভূতপূর্ব স্বামী দিমিত্রি মারিয়ানোফ। পপুলার ধাঁচে লেখা। আইনস্টাইন বলেন, "সাধারণভাবে বিশ্বাসের যোগ্য নয়—যতটুকু পড়েছি, তার মধ্যে সত্যের ঠাঁই খুবই কম।"

এর আগে এলসার বড় মেয়ের স্বামী রুডলফ কাইসার ছদ্মনামে (রীসার নামে) তাঁর জীবনী লিখেছিলেন—সেটিকে তিনি একেবারে অবিশ্বাস্য গাল-গল্পে ভরা বলেন নি। রুডলফ কাইসারও ইউরোপ ছেড়ে আমেরিকা চ'লে আসেন। আর এই সময়েই তিনি আইনস্টাইনের বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা প্রবন্ধ, পত্রাবলী থেকে সংকলিত Mein weltbid, নামে বইটির একটি নতুন সংস্করণ সম্পাদনা করেন; আর প্রকাশ করেন এটির একটি ইংরিজি অনুবাদ, The world as I see it—এ পৃথিবী যেমন দেখছি। বিষয় অনুসারে বইটিতে পাঁচটি ভাগ: এখানে আছে বিজ্ঞান, ধর্ম ও দর্শন, আন্তর্জাতিকতাবাদ, শান্তি এবং জার্মানি ও ইহুদি সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে তার মতামত। বিভিন্ন সময়ে লেখা রচনাগুলি তাঁর চিন্তার সততা ও ক্রমবিকাশটি বোঝাচ্ছে। সব লেখার মধ্যে একটি মূল সুর শোনা যায়—মানবতা, মানুষ জাতির প্রতি শ্রদ্ধা। মানুষের দাবির কাছে আর সব কিছু তুচ্ছ—সবার উপরে চিরন্তন মৌলিক নৈতিক মূল্যবোধ। যা তাঁর কাছে যুক্তিযুক্ত, বিচারসহ এবং অমোঘ সেটিকেও দেখতে হবে পরিবর্তিত পরিস্থিতির নিরিখে। সেই নির্দেশের পরিবর্তন ঘটতে পারে, তবে ঘটানো হবে শুধু মূল সুরটিকে অব্যয়-অক্ষয় করে রাখতে।

১৯৪৪ সালে কোপার্নিকাসের জন্ম চতুর্থ শতবার্ষিকী উৎসবে চিন্তাজগতে বিপ্লবী বিজ্ঞানী, যাঁরা আমেরিকায় আছেন, তাঁরা আমন্ত্রিত হন। আইনস্টাইনও আসেন। একটি সাদামাটা সাধাসিধে বক্তৃতা ইংরিজিতে দেন। তাঁর বক্তৃতা কেউ না বুঝলেও তিনি প্রচণ্ড সংবর্ধনা পান। আইনস্টাইন অবোধ্য, তাঁর তত্ত্ব আরো অবোধ্য। তবু তিনি চিন্তাজগতে বিপ্লবী—কোপার্নিকাসের যোগ্য উত্তরসূরী। একজন সাহসী পুরুষ। তাঁর সম্মানে মানুষ নিজে সম্মানিত হয়!

জার্মানির পতন আসন্ন হয়ে ওঠে। জাপানের সঙ্গে যুদ্ধের ফলাফলও ঘোষণা করা যাচ্ছে। আমেরিকার হাতে এটম বোমা এসে যায়, শুধু শেষ কটা কাজ আর পরীক্ষা বাকি। শীলার্ড এবং অন্যান্য বিজ্ঞানীরা এটম বোমা সৃষ্টি এবং তার প্রয়োগ রোধ করতে অগ্রণী হয়েছেন। অক্ষশিবিরে এটম বোমা তৈরি করার সম্ভাবনা সুদূর; এই অবস্থায় ভয়ংকর মারণাস্ত্র নিয়ে খেলা বন্ধ করতে বিজ্ঞানীরা প্রয়াসী হন; বিজ্ঞানীরা তামস-ব্রতের সাধক নন। শীলার্ড আরেকবার আইনস্টাইনের দ্বারস্থ হন। তাঁর ব্যক্তিগত অনুরোধে আইনস্টাইন একটি চিঠি লেখেন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে এবং শীলার্ডের একটি পরিচিতি পত্র। শীলার্ড প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করে বক্তব্য বিষয় পরিস্ফুট করে বলুক—চিঠিতে সব লেখা যায় না।

প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করার আগে শীলার্ড মিসেস রুজভেল্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কয়েকদিন পর প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা হবে স্থির হয়। সেদিনটি কিন্তু আসে না, তার আগেই রুজভেল্টের মৃত্যু ঘটে। নতুন প্রেসিডেন্ট হন ট্রুমান। কিছুদিন পর শীলার্ডের সঙ্গে দেখা হয় ট্রুমানের। ইতিমধ্যে মেক্সিকোর আলমাগোর্ডো মরুভূমিতে এটম বোমার পরীক্ষাধীন বিস্ফোরণ ঘটে গেছে। বিজ্ঞানীদের হাত থেকে ১৬ই জুলাই ১৯৪৫ সালের পরীক্ষার পর এটম বোমার ভবিষ্যৎ রাজনীতি-বিদদের হাতে চলে এসেছে। শীলার্ড চান পারমাণবিক বোমার ব্যবহার নিয়ে বিজ্ঞানীদের সক্রিয় অন্তর্ভুক্তি। তিনি চান এ জাতীয় পারমাণবিক গবেষণার ক্ষেত্রে একটি বিশ্বসরকারের নিয়ন্ত্রণ—যেখানে বিজ্ঞানীরা তাঁদের মতামত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতে পারবেন। শীলার্ড বহু কথা বলেন, তাঁর বক্তব্য জানান; তবু পরমাণু শক্তির প্রত্যাবর্তন বিজ্ঞানীদের কাছে ঘটে না। ৬ই আগস্ট ১৯৪৫ সালে হিরোশিমার উপর এটম বোমা ফেলা হলো; তারপর নাগাসাকি।

রেডিওতে এ খবর শোনেন আইনস্টাইন; বলে ওঠেন oh weh, সেকি? সেই মুহূর্তে তাঁর ঘোষিত তত্ত্বের প্রমাণে খুশি না হয়ে বিরাট ধ্বংসলীলার খবর পেয়ে তিনি স্তম্ভিত। পারমাণবিক শক্তির উৎস তিনি জানিয়েছেন; আবার মানহাটান প্রজেক্ট সৃষ্টির মূলে রুজভেল্টকে লেখা চিঠির সাক্ষরকারী তিনি। হিরোশিমা-নাগাসাকির ধ্বংস-যজ্ঞের হোতা-উদ্গাতা যেই হন না কেন, যজ্ঞের সমিধ-উপকরণ তিনি সংগ্রহ করেছেন। ধ্বংসের দায়ভাগের বৃহৎ অংশের অংশী তিনি—এ তাঁর বিবেকের বিধান।

নিজের কাজের সাফাই গাইতে চেষ্টা করেন, এ যেন তাঁর নিজেকে বুঝ দেওয়া, বিবেক-দংশনের জ্বালা নিবারণের চেষ্টা করা, অপরাধের বোঝা ক্ষালন করা। তিনি বলেন, চিঠির ব্যাপারে তিনি পোস্ট অফিসের কাজ করেছেন। আরেকবার বললেন, 'একটা সাফাই আছে, জার্মানি এটা করতে পারত।' কিছুদিন পরে জানতে পারেন, জার্মানি এটম বোমা তৈরি করতে পারত না, সম্ভব ছিল না।

১৯৩৯ সালের জার্মানিতে বিশ্ববরেণ্য সক্রিয় বিজ্ঞানীর সংখ্যা নগণ্য, হান আর হাইসেনবার্গ তাঁদের অন্যতম। আর যাঁরা ছিলেন, তাঁরা হয় বিতাড়িত, বা বন্দী, নয় বয়সের ভারে স্থবির। এই তরুণ বিজ্ঞানীর দল জার্মানির বিজ্ঞানের ক্লেদ দূর করতে প্রয়াসী হন। ১৯৪০ সালে, হিটলারের পরম সাফল্যের দিনে, এঁরা ইহুদিদের হাতে-গড়া বিজ্ঞানের পুনর্মূল্যায়ন করেন। ইহুদি বিজ্ঞানীদের অবর্তমানে জার্মান তাত্ত্বিক বিজ্ঞানে এক ভয়ানক শূন্যতা দেখা দিয়েছে; ফলিত বিজ্ঞান তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের সহযোগিতা ছাড়া উন্নত হতে পারে না। কিছু দূর পর্যন্ত এগিয়ে থাকার পর ফলিত বিজ্ঞানের গতিপথে তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের সহায়তা দরকার, নইলে এগিয়ে যাবার পথে বাধা অনতিক্রম্য হয়, নতুন সৃষ্টিতে অন্তরায় ঘটে। হান-হাইসেনবার্গের দল এটি জানেন। আরো জানেন, পারমাণবিক বিজ্ঞানের চর্চা বা আধুনিক বিজ্ঞানের আলোচনা—একটি

দেশের একার অধিকার হতে পারে না, নতুন বিজ্ঞানের চর্চায় বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞান-চিন্তার আদান-প্রদানের প্রয়োজন। যুদ্ধের জন্য জার্মানি একঘরে, বাইরের অজার্মান জগতে কি ঘটছে জানা যায় না ; অন্য দিকে বিতাড়িত জার্মানির বিজ্ঞানীরা সুস্পষ্ট জানেন, জার্মানির কাজের পরিধি কি—পরীক্ষাগারে আছে কি সুবিধা। ১৯৪২ সালে হাইসেনবার্গের সহায়তায় জার্মানিতে এটমবোমা সৃষ্টির প্রচেষ্টা শুরু হয়। সীমাবদ্ধ সঙ্গতি ও প্লান এই প্রচেষ্টার একটি বিরাট বাধা। ইহুদি বিতাড়নের ফলে সৃষ্ট বিরাট শূন্যতা দ্রুত পূরণ হতে পারে না, অন্য দিকে হাইসেনবার্গের নিজস্ব ইচ্ছা এটম বোমা সৃষ্টি না করা। হিটলার, নির্দয় নিষ্ঠুর হিটলার, তিনিও খুব একটা জোর দিচ্ছেন না।

১৯৪০ সালে তরুণ জার্মান বিজ্ঞানী দল মিউনিক কনফারেন্সে কয়েকটি সিদ্ধান্ত—রিজোলিউশন নিলেন। হিটলারের সাম্রাজ্যে এই রিজোলিউশন জার্মান বিজ্ঞানীদের অসীম সাহস প্রকাশ করছে। তাঁরা বললেন,

(১) বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব পরীক্ষায় প্রমাণিত। সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব প্রমাণে কিছুটা সংশয় এখনো আছে।

(২) পদার্থবিদ্যার প্রতি শাখায় তাত্ত্বিক বিদ্যার প্রয়োগ প্রয়োজন।

(৩) আপেক্ষিকতার দর্শনের সঙ্গে আপেক্ষিক তত্ত্বের কোন মিল নেই। দেশকালের বর্ণনায় নেই কোন নতুন ধারণা।

(৪) আধুনিক কোয়াণ্টাম মেকানিকস এটমের গুণাগুণ জানার একমাত্র উপায়। এটমের অভ্যন্তরের গঠন-প্রকৃতি এখন পর্যন্ত গাণিতিক কাঠামোর বাইরে জানা যায়নি।

মিউনিকে সমবেত বিজ্ঞানীরা আইনস্টাইনকে প্রতিষ্ঠা করলেন এবং প্রতিষ্ঠা করলেন, মাক্স বোর্ন, শ্রোয়েডিঙ্গার, লীসে মাইটনার, এরনফেস্ট ইত্যাদি ইহুদিদের হাতে গড়া কোয়ান্টাম মেকানিক্স। প্রফেসর লেনার্ডের দলের হইচই নব বিজ্ঞানীদের প্রত্যয়ের কাছে মৌন হয়ে গেল।

১৯৪২ সালে আরেকবার আইনস্টাইনের তত্ত্ব নিয়ে জার্মানিতে আলোচনা হয়। প্রমাণ হয়, পূর্বসূরী লরেন্স, পোআঁকার ইত্যাদির সার্থক উত্তরাধিকারী আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব। এই তত্ত্ব স্বয়ম্ভু নয় এবং নয় ইহুদি ধর্মের বাই-প্রডাক্ট। লেনার্ড দলের এতদিনের অভিযান সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে দিলেন নতুন বিজ্ঞানীদের দল। ১৯৪২ সালে হিটলারের জার্মানিতে জার্মান বিজ্ঞানীদের এই ঘোষণা অভূতপূর্ব অসম সাহসের পরিচয়। যুদ্ধের মাঝখানে এই সংবাদ মিত্রশিবিরেও পৌঁছায়।

জার্মানির পতনের পর, যখন পারমাণবিক বিজ্ঞানী হাইসেনবার্গ, হান ইত্যাদিকে সসম্মানে বন্দী করে মিত্রশিবিরে আনা হয়, তখন প্রশ্নের উত্তরে এঁরা বলেন, পারমাণবিক বোমা সৃষ্টির কাজে তাঁরা ইচ্ছুক ছিলেন না। অন্য দিকে, বোমা তৈরি সম্ভব ছিল না, ছিল না প্রয়োজনীয় অর্থ এবং জ্ঞান। তবে, সম্ভব হলেও, বোমা তৈরি তাঁরা করতেন না। তাঁরা জার্মান হলেও ঘাতক নন, তাঁরা বিজ্ঞানী।

এই সংবাদ আইনস্টাইন শোনেন। বোমা সৃষ্টির জন্য তাঁর দায়িত্ব লাঘবের কোন ওজর নেই। তিনি পোস্ট অফিস, তবু ঘটনার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেতে পারেন না। মাক্স বোর্নকে দুঃখে অনুশোচনায় বললেন, "পরমাণু বোমা তৈরির প্রস্তাব জানিয়ে রুজভেল্টকে চিঠি লেখা আমার প্রধানতম ভুল।"

১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে হিরোসিমা-নাগাসাকির ধ্বংসলীলার পর একই আগস্ট মাসে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে তাঁর মানসিক চিন্তা ব্যক্ত করেন; প্রবন্ধটির শিরোনাম "পারমাণবিক যুদ্ধ অথবা শান্তি।" তিনি বললেন,

"পারমাণবিক শক্তির আবিষ্কার কোন নতুন সমস্যা সৃষ্টি করেনি। এর ফলে শুধু উপস্থিত সমস্যার সমাধানের জন্য তৎপর হবার প্রয়োজনীয়তা একটু বেশী দেখা দিয়েছে। বলতে পারি, পারমাণবিক শক্তির আবিষ্কার আমাদের পরিমাণগতভাবে স্পর্শ করেছে, গুণগতভাবে নয়। যতদিন অমিত ক্ষমতার আকর সার্বভৌম রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকবে, যুদ্ধ ততদিন অপরিহার্য। কবে যুদ্ধ হবে, সেই ভবিষ্যদ্বাণী করা যাচ্ছে না, শুধু বলা হচ্ছে যুদ্ধ হবেই। পারমাণবিক বোমা সৃষ্টির আগে এ তথ্য সত্য ছিল, এবার শুধু যুদ্ধের বিধ্বংসকারিতার রূপ পালটেছে।......পারমাণবিক বোমার রহস্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের হাতে দেয়া উচিত বলে আমি মনে করছি না। আমার মতে সোভিয়েট রাশিয়াকেও এই রহস্য জানান বর্তমানে সমীচীন হবে না। দুটো অবস্থাতেই ব্যাপারটা দাঁড়াবে যে একজন মূলধন-নিয়োগকারী ব্যক্তি ব্যবসা করতে নেমে নিজের পুঁজির অর্ধেক কাউকে দিয়ে, তাকে অংশীদার হতে আহ্বান করছে। দ্বিতীয় ব্যক্তির সহযোগিতা পাবার উদ্দেশ্যে এ ব্যবস্থা করা হলেও, এরকম সুযোগ পাবার পর অক্লেশে সে নিজে একটি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান খাড়া করতে পারে।......পারমাণবিক বোমার রহস্য একটি বিশ্বসরকারের হাতে দিতে হবে এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রকে অবিলম্বে ঘোষণা করতে হবে যে এর জন্য তারা প্রস্তুত। যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন আর গ্রেট ব্রিটেন—সামরিক শক্তিতে অগ্রণী এই তিনটি রাষ্ট্র বিশ্বসরকারের কাছে তাদের যাবতীয় সামরিক শক্তি অর্পণ করবেন। তিনটি মাত্র রাষ্ট্র উচ্চমাত্রায় সামরিক শক্তি বিশিষ্ট হবার ফলে, এজাতীয় বিশ্বসরকার গঠন কঠিন না হয়ে বরং সহজ হয়ে উঠবে।......যাবতীয় সামরিক ব্যাপারের উপর এই বিশ্বসরকারের কর্তৃত্ব তো থাকবে, তা ছাড়া থাকবে আরো একটি ক্ষমতা। যে সব দেশে মুষ্টিমেয় কয়েকজন সেখানকার সংখ্যাগুরুদের উপর অত্যাচার করছে, এবং এইভাবে এক অনিশ্চিত অবস্থা সৃষ্টি করছে যার পরিণাম হবে যুদ্ধ, সেই সব ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপের অধিকার বিশ্বরাষ্ট্রের থাকবে।......হস্তক্ষেপ না করার ধারণার পরিসমাপ্তি প্রয়োজন এর অবসান শান্তির অঙ্গ।...পারমাণবিক বোমার গুপ্ত রহস্য বেশী দিন আর গোপন থাকবে না। জানি, একদল লোকের যুক্তি এই যে পারমাণবিক বোমা আবিষ্কারের জন্য খরচ করার উপযোগী সম্পদ আর কোনো দেশে নেই বলে, এ তথ্য বহুদিন গোপন থাকবে। শুধু টাকা দিয়ে কোন বিষয়ের বিচার করা একটি সাধারণ ভ্রান্তি।......কোন কাজ করার জন্য অর্থই একমাত্র নয়। চাই শুধু উপযুক্ত মানুষ, উপকরণ ও ইচ্ছা।......পারমাণবিক শক্তি সত্বর এক আশীর্বাদ হয়ে দেখা দেবে সেরকম মনে হচ্ছে না। এই শক্তি এখন ভীতির কারণ। হয়তো এরকম ভালই হয়েছে। ভয় পেয়ে মানবজাতি হয়তো তাদের আন্তর্জাতিক সম্বন্ধের ক্ষেত্রে নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রবর্তন করবে। ভয়ের চাপ না থাকলে মানুষ বোধহয় এরকম করবে না।"

আত্মরক্ষার খাতিরে মানুষের পৃথিবীকে একরাট হতে হবে—এই বিশ্বাসের ঘোষণা এটম বোমার বিস্ফোরণের কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি করলেন। যুদ্ধ জিততে হবে এও যেমন সত্য, যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে তেমনি প্রয়োজন নিয়ন্ত্রণের। এই নিয়ন্ত্রণ একটি মানবদরদী আন্তর্জাতিক বিশ্বরাষ্ট্রই করতে পারে—যার হাতে থাকবে ক্ষমতা এবং

থাকবে ক্ষমতা ব্যবহারের সুযোগ। সবার উপরে থাকে ভয়—যে ভয়কে ফ্রয়েড শান্তির সোপান বলেছিলেন। আইনস্টাইনের পরিবর্তিত চিন্তাতে ভয়ের স্থান আছে, ভয়কে বাদ দেওয়া যাবে না।

এই চিন্তার আরো বিস্তৃতি ঘটালেন ১৯৪৭ সালের আরেকটি নিবন্ধে। ইতিমধ্যে পারমাণবিক শক্তির আস্ফালনে রাশিয়া ও ইউ এস এর প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়েছে; প্যালেস্টাইনে আরব ইহুদিরা সংগ্রামের মুখোমুখি। অন্য দিকে যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর ধ্বংস স্তূপে নতুন করে দেশ গড়ার কাজ চলেছে—সবার উপরে দরকার জার্মানি, ইটালি ও জাপানের পুনর্গঠন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বললেন,

"আমরা এমন একটা যুদ্ধের ভিতর দিয়ে এসেছি যখন আমাদের শত্রুপক্ষকে অতি হীন নৈতিক মানদণ্ড মেনে নিতে হয়েছিল। সেই মানদণ্ডের শ্বাসরোধী পরিবেশ থেকে মুক্ত হয়ে মানবজীবনের শুচিতা আবার প্রতিষ্ঠা করার অথবা অসামরিক জনগণের নিরাপত্তা বিধান করার বদলে আগের যুদ্ধের শত্রুপক্ষের নিম্ন শ্রেণীর মানদণ্ডটিকে বর্তমানে আত্মস্থ করতে চলেছি, নিজেদের কুরুচি আরেকটি যুদ্ধের দিকে আমাদের ঠেলে দিচ্ছে।......নিরাপত্তা বিধানের কর্তৃত্বযুক্ত বিশ্বসরকারে যোগ দেবার জন্য আমি রাশিয়াকে আমন্ত্রণ করার পক্ষপাতী। যদি তারা যোগ দিতে অনিচ্ছুক হন, তা হলে তাদের বাদ দিয়ে রাষ্ট্রোত্তর নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে যাওয়া উচিত হবে।......স্বীকার করি, ভীষণ বিপদের সম্ভাবনা এতে থাকছে। তবু যুদ্ধ সম্ভাবনাকে হ্রাস করা এই সংগঠনের স্বভাবধর্ম হবে।......রাশিয়াকে বাদ দিয়ে কোন রাষ্ট্রোত্তর ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে এর কাজের আন্তরিকতার পরিণামের উপর এটির শান্তি-প্রীতি রূপ নির্ভর করবে। রাশিয়া যাতে এতে অংশ নেয় তার উপরে জোর দেবার প্রয়াস চালিয়ে যেতে হবে।......আমি বিশ্বাস করি, পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং কেবল প্রেরণাশক্তির মাধ্যমেই বিশ্বসরকার মূর্ত হতে পারে। তবে এই পথে উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে হলে কেবল যুক্তিবাদের কাছে আবেদন করা যথেষ্ট নয়। প্রাচ্যের কম্যুনিষ্ট প্রথার একটি বিশেষত্ব হলো যে এর ভিতর এক ধরনের ধর্ম বিশ্বাসের ভাব আছে, সাম্যবাদীরা কতকটা ধর্মীয় উন্মাদনায় অনুপ্রাণিত হয়ে কাজ করেন। ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে গড়া শান্তির আদর্শ কতকটা ঐ জাতীয় ধর্মীয় অনুপ্রেরণা দিয়ে পুষ্ট না হলে এর সাফল্যের আশা অতি ক্ষীণ।......আমার মনে হয়, পরমাণু বিজ্ঞানীরা স্থির জেনেছেন যে, কেবলমাত্র যুক্তির দোহাই দিয়ে তারা আমেরিকার জনসাধারণকে এই যুগের সত্যিকারের রূপ সম্বন্ধে সচেতন করতে পারবেন না। এর সঙ্গে ধর্মের মূল, হৃদয়াবেগের গভীর শক্তি, সেটিও যুক্ত হওয়া দরকার।"

আইনস্টাইনের বিশ্বসরকারের ধারণা না-আমেরিকান, না-রাশিয়ান, কোন শিবিরেই অভ্যর্থনা পায়নি। সে আমলে (এমন কি আজকেও) এইসব আদর্শের অধিকাংশই দুর্বোধ্য ছিল। দুটি শিবির সংশয়ের দৃষ্টিতে দুজনকে দেখছেন; মানবতা, হৃদয়াবেগ, ন্যায়বিচার ইত্যাদির ব্যাখ্যা দুদলই নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর সাপেক্ষে দিচ্ছেন। আইনস্টাইনের বক্তব্যের প্রতিবাদ রাশিয়ার একাদেমির সদস্যবৃন্দ নিউ টাইমসে চারজন বিজ্ঞানীর সাক্ষর করা চিঠির প্রকাশের মধ্য দিয়ে জানালেন। যদিও একাদেমির সদস্যদের সাক্ষরিত পত্র, তবু অন্তরালে সোভিয়েট রাশিয়ার সরকারী মুসাবিদার ছাপ স্পষ্ট চেনা যায়। "একান্ত স্পষ্ট ও কুটনৈতিক অলংকরণ বিবর্জিত ভাষায়" আইন-

নিধর্মীয়, গণতন্ত্রী রাষ্ট্রের স্বপ্ন তিনি দেখতেন, সেটি প্যালেস্টাইন। ১৯৪৮ সালে জানলেন, তাঁর স্বপ্নের বাস্তবায়িত রূপ প্যালেস্টাইনে সম্ভব নয়। প্যালেস্টাইনের জুইস রেসিসট্যান্স মুভমেন্টের হিংসাত্মক কার্যকলাপের সম্মতি তিনি জানালেন,—জানালেন তাঁদের আর্থিক সাহায্য করে।

অনিশ্চয়তার বিরুদ্ধে তাঁর জেহাদ—সেখানে তিনি একা। নীয়েল বোরকে শ্রদ্ধা করেন, অথচ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ মানে দুজনের নব কোয়ান্টাম তত্ত্ব নিয়ে আলোচনার নামে তর্কাতর্কি, একটি হার্দ্য অথচ প্রচণ্ড লড়াই। কোয়ান্টাম তত্ত্বের অনিশ্চয়তা এবং পরিপূরক তত্ত্ব আইনস্টাইন মানতে চান না। অন্য দিকে বোরের ধারণা নব কোয়ান্টাম তত্ত্ব এটম ও শক্তিকণার গুণাগুণ প্রকৃতি বোঝালেও, আইনস্টাইন না মানলে সে তত্ত্ব নিখুঁত নয়। আইনস্টাইনের স্বীকৃতিতে নব কোয়ান্টাম তত্ত্বের জয়। বোর কোপেনহেগেন ইনস্টিট্যুটের প্রতিষ্ঠাতা-ডিরেক্টর, আবার প্রিন্সটনের বিদেশী অধ্যাপক। বয়সে আইনস্টাইনের চেয়ে ছ'বছরের ছোট, নোবেল প্রাইজ পান ১৯২২ সালে, আইনস্টাইনের পরের বছর। আমেরিকা এলে তিনি আইনস্টাইনের সঙ্গে দেখা করবেন আর তারপরই শুরু হবে দুটি ষাট উত্তীর্ণ বৃদ্ধের বিজ্ঞানের জটিলতা নিয়ে তর্ক। সহকর্মী অল্পবয়সী বিজ্ঞানীরা সম্ভ্রমে সহাস্যে সেই আলোচনা শুনছেন। কখনো কখনো বোর ক্ষুব্ধ হয়ে বলে ওঠেন, "না। এই বুড়োটা কিছুতেই বুঝতে চায় না ; ভারি একগুঁয়ে।" আব্রাহাম পাইস (Pais) এই দুই বৃদ্ধের দুজনের জন্য দুজনের আকর্ষণ, শ্রদ্ধার কথা বলেছেন ; দেখা হবার উৎকণ্ঠা তাদের যেমন, দেখা হলে তর্কের প্রবণতাও ততখানি !

১৯৪৯ সালে নববিজ্ঞান সম্বন্ধে নিজের ধারণার কথা জানাতে গিয়ে আইনস্টাইন বললেন,

"সারাজীবন পদার্থবিদ্যার মূলভিত্তির সঙ্গে নতুন পাওয়া তথ্যগুলো মেলাতে গিয়ে বিফল হলাম। মনে হয়েছে যেন, আমাদের পায়ের তলা থেকে মাটি পিছলে সরে যাচ্ছে, দাঁড়াবার কোন কঠিন ভূমি নেই। এই অস্থির বৈপরীত্যভরা ভিত ভূমি থেকে বোর, একজন আশ্চর্য ধীমান ও তীক্ষ্ণ কল্পনাশক্তি বিশিষ্ট মানুষ, কি করে যে বর্ণালির রেখার মৌলিক নিয়ম, ইলেকট্রনের মৌলের গঠন অথবা মৌলের রাসায়নিক চরিত্র ইত্যাদির ব্যাখ্যা দিলেন। আমি তো ভেবেই পাইনে। এসবই আমার কাছে অদ্ভুত-আশ্চর্য ব্যাপার ; চিন্তার রাজ্যে এ যেন সাঙ্গীতিকী প্রকৃতির একটি মহৎ প্রকাশ।"

নব কোয়ান্টাম তত্ত্বের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হতে হবে। অথচ তার সুসমায় নেই অখণ্ডত্ব, অনিবার্যতা ; —এটি তিনি মানতে পারছেন না ; অথচ এটমের জগতে অনিশ্চয়তার সূত্রটিকে বিসর্জন দেওয়া যাচ্ছে না ! এও যে হতাশা !

বন্ধু মাক্স বোর্ন ১৯৫২ সালে জার্মানি ফিরে গেলেন। বিস্মিত আইনস্টাইন বল্লেন, 'ঐ খুনীদের দেশে ফিরে যাবে ?" বোর্ন বল্লেন, "জার্মানরা মাস মার্ডারার নয়, তারা গণহত্যা করেনি। আমাদের অনেক বন্ধু জার্মানিতে থেকে তোমার আমার চেয়ে নাৎসিদের অত্যাচার বেশী সহ্য করেছে। আর আমেরিকানরা ড্রেসডেন, হিরোশিমো, নাগাসাকিতে সর্বাংশী ধ্বংসের যে দ্রুততা দেখিয়েছে সেই তুলনায় জার্মানরা তুচ্ছ।"

জার্মানদের সম্পর্কে তাঁর প্রাচীন ধারণা—সেখানেও কি ভুল থাকে?

লুইটপোল্ড জিমনাসিয়ামের আইনকানুন কড়া সামরিক শাসনের ছাঁচে গড়া ছিল। এই সামরিক চেতনা জার্মান জাতির শিরায় প্রবহমান। হিটলার জার্মানির সেই মূলধর্মের প্রতিভূ, ইহুদি হত্যা সেই ধর্মের বহিঃপ্রকাশ। তিনি লিখেছেন, "জার্মানরা নিষ্ঠুর।" "নির্দয়তা প্রকাশ করে পৃথিবীতে আর কোন জাতি এত খুশি হয় না।" "ভেবেছিলাম জার্মানদের বুঝি; গত দুবছরে তাদের নিষ্ঠুরতার হদিশই শুধু খুঁজে পেলাম।" "জার্মানদের মেরে ফেলতে পার, বন্দী করতে পার,—তবু সময়ের নির্দিষ্ট কাঠামোতে তাদের কোনদিন পরমতসহিষ্ণু, গণতন্ত্রী করতে পারবেনা।" জার্মানজাতি সম্পর্কে এই তাঁর বিশ্বাস। জার্মান অনুশাসন বা ৎসুয়াং সম্পর্কে তাঁর এক এলার্জি—আজীবন জার্মান ৎসুয়াং এর বিরোধিতা করে এলেন। হিটলারের অত্যাচারের গল্প শুনলেই তিনি প্রমাণ বা তথ্য চান না, বিশ্বাস করেন। কারণ, নিষ্ঠুরতা, নির্দয়তা, পাশবিকতা জার্মান জাতির রক্তে আছে। ব্যতিক্রম নিশ্চয় আছে, তবে সেই ব্যতিক্রম অতি নগণ্য। যারা ব্যতিক্রম, তারা ভীরু, প্রতিবাদে মুখর নন।

এই অভিমানে, মাক্স প্লাঙ্কের অসুস্থতার খবর শুনেও তিনি উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেন নি। ৮৯ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু সংবাদ ১৯৪৭ সালে শুনে ফ্রাউ প্লাঙ্ককে চিঠি লেখেন; তাঁর স্মৃতিচারণ করেন, সুখের মুহূর্তগুলি তুলে নিয়ে স্মৃতির সুতোয় শ্রদ্ধার মালা গাঁথেন। স্নেহের স্পর্শের আমেজটুকু নিয়ে চোখের বাষ্প মুছে ফেলেন। প্লাঙ্ক মনে প্রাণে জার্মান। তবু, তিনি তাঁর বন্ধু-সচিব-সখা, তাঁর গাইড। তিনি ব্যতিক্রম।

জার্মান জাতি সম্পর্কে তাঁর এই মনোভাব বাইরে অবিদিত নয়। চার্চিল বলতেন, যুদ্ধোত্তর জার্মানির আর্থনৈতিক নবজাগরণের প্রচেষ্টাকে আইনস্টাইন কখনই স্বাগত জানাবেন না।—তাঁর অসহিষ্ণুতা তাঁর দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে রাখে।

আর্নল্ড সমারফেল্ড তাঁকে বাভেরিয়ান একাদেমির সভ্য করতে চাইলেন। আইনস্টাইনের উত্তর, না।

তাঁর জন্মভূমি উলম শহর এবং পশ্চিম জার্মানি তাঁকে স্বাধীন নাগরিকত্ব দিতে চাইল। আইনস্টাইন গ্রহণ করতে অপারগ।

হাইসেনবার্গ-হান কাইজার ভিলহেলম ইনস্টিট্যুট তাঁকে বিদেশী সভ্য হিসেবে বরণ করতে চাইলেন। আইনস্টাইনের এই সম্মান-স্বীকারে আপত্তি আছে।

পশ্চিম জার্মানির প্রেসিডেন্ট হিউস (Heuss) শান্তি সম্মেলনে যোগ দিতে তাঁকে আহ্বান জানালেন। আইনস্টাইন জার্মানিতে সম্মিলনে যাবেন না।

না, না, না—জার্মানির দাবি-অনুরোধ সম্পর্কে তাঁর একটি কথায় উত্তর। জার্মানির কোন ব্যাপারে তিনি থাকতে চান না। ওরা খুনের জাত।

মাক্স বোর্নের জবাবে তিনি নতুন করে ভাবতে থাকেন। হাইসেনবার্গ-হান এঁরা কি খুনে? এঁরা হিটলারের রাজত্বে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। বন্ধু ফন লাউএ

তিনি কি নিষ্ঠুর? হিটলারের অত্যাচার তিনি জার্মানিতে থেকেও সয়েছিলেন। এঁরা এটম বোমা তৈরি করতে চাননি। চাননি সমারফেল্ড এবং বোর্ন।

ইহুদি হত্যা-বিতাড়ন, ধরে নেওয়া যায়, এটি সত্য। যুদ্ধোত্তর জার্মানির নিপীড়ন কি অসত্য। যুদ্ধজয়ী মিত্রশক্তির সৈন্যের নিষ্ঠুরতা কি সহনীয়? সমগ্র যুদ্ধের নিষ্ঠুরতা কি হিরোসিমো-নাগাসাকির ধ্বংসের সঙ্গে তুলনীয়? নিষ্ঠুরতাও কি আপেক্ষিক নয়?

তিনি প্রতিভাবান, তবু সমসাময়িক কেউ কেউ বললেন, তিনি যেন একটি একাচরা বুনোহাতি, সামঞ্জস্য-সুষমার জগতে তিনি একটি ভিন্ন ছাঁচের পুতুল। একজন সাদা-মাথা গোঁড়া-লোক।

তাঁর গোড়ামি জার্মান জাতির ধারণায়, গোঁড়ামি কোয়ান্টাম মেকানিক্সের সন্দেহে, শান্তিবাদের ঘোষণায়, একরাট পৃথিবীর কল্পনায় এবং একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বের প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায়। 'সবার উপরে মানবতার' প্রচারে তিনি গোঁড়া। বিজ্ঞানের অনুভূতিহীন চর্চা এই মানবতার স্পর্শে কোমল হয়ে দাঁড়ায়। এনফেল্ড লিখেছেন, 'তাঁর কাছে এলে মনে হয়েছে ইনি মন্দ থেকে ভাল বেছে নিতে পারেন—অন্যায় থেকে পারেন ন্যায়কে পৃথক করতে। ইনি জয় করতে না বেরিয়েও জয়ী হয়েছেন; জয়ের সম্মান আর তাঁরই জন্য হিংসার জ্বালা দুই সমানভাবে সয়েছেন। তাঁর উপস্থিতিতে নৈতিক শক্তির প্রাবল্য জেগে ওঠে। তিনি অনেক করেছেন, তবু তার চেয়েও বেশী কাজ হয়েছে তাঁর ব্যক্তিগত উপস্থিতিতে।'—সমসাময়িকরা নানাভাবে তাঁকে দেখেন; তিনি বিজ্ঞানী, তিনি দার্শনিক, তিনি বিজ্ঞান দার্শনিক।

তবু তিনি কি সফল?

১৯৫০ সালে নতুন তত্ত্ব প্রকাশ করলেন আইনস্টাইন, তাঁর বয়স তখন ৭১। মহাকর্ষের সর্বজনীন তত্ত্ব (A Generalised theory of Gravitation); তাঁর তিরিশ বছরের চিন্তার ফসল কঠিন গণিতের কাঠামোয় বাঁধা একটি তত্ত্ব। The meaning of Relativity নামের বইয়ের চতুর্থ সংস্করণের পরিশিষ্ট ভাগে এটি পরে সংযোজিত হলো। বিজ্ঞানীদের এই তত্ত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তাঁরা বলেন, আগে পড়ি, বুঝি, তারপরতো বক্তব্য মন্তব্য বা আলোচনা। আইনস্টাইনকে সংক্ষেপে তাঁর বক্তব্য জানাতে অনুরোধ করলে তিনি বলেন, কুড়ি বছর কেটে যাক, তারপর দেখা যাবে।

এডিংটনের জীবনীকার ডগলাসের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে বলেন, "বিজ্ঞান কি আর লেম্যানদের বোঝানো যায়। বিজ্ঞানের তত্ত্ব সহজবোধ্য করতে গেলে বিজ্ঞানীরা যে ফাঁকির হয়ে যাবে; রহস্যের কিছু আড়াল তাকে রাখতে হবে।" তিনিই আবার বোরের সঙ্গে আলোচনার সময় বলেছিলেন, কোয়ান্টাম মেকানিক্সের জগৎ কেন গণিত-ভিত্তিক হবে? ভাষায়, প্রপঞ্চের জগতে কেন তার অনুবাদ পাওয়া যাবে না? "একটা শিশুকে যদি বিজ্ঞানের তত্ত্ব না বোঝানো যায়, তবে সে তত্ত্ব নয়।"

১৯৫০ সালে যে তত্ত্ব তিনি জানালেন, সেখানে বিদ্যুৎ চুম্বক তত্ত্ব আর মহাকর্ষের উপলব্ধিকে একসূত্রে গাঁথতে চাইলেন যাতে প্রকৃতির মধ্যে কর্মবাদের যে আভাস আছে তা বোঝা যায়। যে সব উপাদান নিয়ে তিনি কাজ করলেন, তা অকিঞ্চিৎকর ; এতে এমন উপাদান বাদ দেওয়া হয়েছিল যা সেকালীন নব পদার্থবিদ্যার জগতে জানা থাকলেও আইনস্টাইন হয়তো জানতেন না, অথবা জানলেও তাদের ব্যবহার করতে চাননি। তাঁর এই চেষ্টার কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে ওপেনহাইমার বললেন, "শোচনীয় ভাবে সীমাবদ্ধ আর ঐতিহাসিক দিক দিয়ে আকস্মিকতা দিয়ে নিয়ন্ত্রিত।"

সবার কাছ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখে নিঃসঙ্গ বিজ্ঞানীটি সৃষ্টির রহস্যের ব্যাখ্যায় প্রয়াসী হয়ে সামান্য কয়েকটি উপকরণ নিয়ে কাটুমকুটুম গড়ছেন—যে গঠনের মধ্যে আছে সৃষ্টির উৎসের আদরা, তার ইঙ্গিত। কাজের সীমাবদ্ধতা তাঁর জানা, তবু যে কাজে হাত দিয়েছেন, তার শেষ না দেখে তিনি থামতে পারছেন না। অনেক ছাই ঘেঁটে অমূল্য রতন মিলতে পারে—কেউ পায়, কেউ সারাজীবন ছাই ঘেঁটে চলে। তবু সেই ছাই সরানোর কাজে মানুষকে ব্রতী হতে হয়। ফুল ফোটান শুধু নয়, বাগানের সৌন্দর্য সৃষ্টিতে লাগে আগাছা-ঝরাপাতা পরিষ্কার করা। সব মিলিয়ে বাগানের রূপ আর সব কাজেই তো মালির মুনশিয়ানা।

পরশপাথর খোঁজার যার কামনা, সে সামান্য সোনা রূপোয় সন্তুষ্ট হতে পারে না। আইনস্টাইন পারেন নি।

বিশ বছর নয়, আরো আগে তার তত্ত্বের সংকীর্ণতা প্রকাশ হলো। এই তত্ত্ব সর্বব্যাপী নয়, সর্বানুভূ নয়। তবু সেই কৌতূহলী সন্ধানী সাধকটিকে সেদিনের বিজ্ঞান জগৎ ভালবেসেছিল, তাঁরই জন্য ছিল সকলের স্নেহমমতা।

১৯০৪ থেকে ১৯২৪ সাল—বিশ বছরের সুবিপুল পরিভ্রমণ! বিশ বছরের চেষ্টায় বিজ্ঞানের নবদিগন্তের ঊষরভূমি শস্য শ্যামল হয়ে সেজে দাঁড়ায়। বিজ্ঞানের পরিধি বাড়ে, বাড়ে কাজের চৌহদ্দি, চিন্তার সাম্রাজ্য। অনেক পথ পার হয়ে দেউড়ি হেঁটে তিনি অজানা রাজ্যের হাজারদুয়ারী প্রাসাদে এলেন—সেখানে একটি কক্ষে আছে পরম রত্ন—সৃষ্টির আদি রহস্যের নিয়মটি। সেই কক্ষের চাবিটি অনেক গলি ঘুঁজি ভরা গোলক ধাঁধার মত পথঘাটে লুকোনো আছে। তিনি চাবিটি না খুঁজে, আপ্রাণ চেষ্টায় একা, একটি করে দরজা খুলে একটি করে কক্ষে ঢুকছেন—সেখানে ভিতরে ঢুকে দেখেন শূন্যতা—খোঁজার আনন্দ আছে, তবু ত্রিশ বছরের খোঁজার শেষে যে হতাশা দেখা দেয়, তার আঘাত কম নয়।

যশের সঙ্গে মেলে দুর্দশা, আনন্দের সঙ্গে হতাশা। মাধুর্যের পুলকের সঙ্গে জোটে তিক্ততার আঘাত।—হেসে বলেন, "গড আর শয়তানে তফাত খুবই কম। এক-জনের সামনে আছে প্লাস চিহ্ন, অন্য জনের সামনে মাইনাস।" সৃষ্টির রাজ্যে, অনুভূতির ক্ষেত্রে, প্রাপ্তির অধিকারে বৈপরীত্য আছে ; চরম বা পরম কোথাও নেই। সবই আপেক্ষিক।

১৯৫০ সালে তার একাত্তরতম জন্মদিনে ওপেনহাইমারের সঙ্গে হেঁটে ফিরছেন। আইনস্টাইন বলেন, "বুঝলে, মানুষ একবার বুদ্ধির পরিচয় দেবার মতো একটা কিছু করলে তারপর বাদবাকি জীবনটা বেশ সুন্দর হয়ে ওঠে।"

তাঁর তত্ত্বে মহাকর্ষ আর তড়িৎ চুম্বক শক্তির "সংযোগহীন পারম্পর্য এক সঙ্গিতহীন, ব্যবধানের বক্তব্যহীন শূন্যতার বিনিময়ে" পাওয়া গেল, তাদের মেলানো গেল না। একরাট পৃথিবী গড়ায় স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়। শান্তির জন্য প্রয়োজন হয় অস্ত্রের সংগ্রাম। জার্মান জাতি সম্বন্ধে তাঁর ধারণা নির্ভুল নয়। কোথাও একটা ত্রুটি আছে। তবু তার কাছে জীবন সুন্দর। নিজেকে সরিয়ে নিবিষ্ট হবার ক্ষমতা গড়ে তোলার সুফল-কুফল দুই ছিল। অন্যের ভাল করার সদিচ্ছা অন্যদিক দিয়ে আঘাত হেনেছে,—তবু সব মিলিয়ে জীবন তাঁর কাছে মধুর।

তাঁর কাজের শেষে আছে তাঁর গৃহকোণ—সেখানে আছে বোন মাজার অন্তরঙ্গতা আছে মিস ডুকাস-এর স্নেহচ্ছায়া—এই মহিলাটির কাছে জগৎ সংসার মানে-প্রফেসর আইনস্টাইন, তাঁর কাজ, তাঁর যত্ন, তাঁর স্বাচ্ছন্দ্য বিধান।

১৯৫১ সালে মাজার মৃত্যু হয়। নিঃসঙ্গতা বাড়ে ; নৈশব্দ্য হানা দেয়।

নিজের কথা বলতে ১৯৩৬ সালে একবার বলেছিলেন, "মানুষ কদাচিৎ নিজের অস্তিত্বের বিশেষত্ব নিয়ে সচেতন থাকে, অন্য কাউকে এ নিয়ে ব্যস্ত করা চলে না। সারা জীবন ধরে যে মাছ জলে সাঁতার কাটে, সেই জল সম্বন্ধে তার জ্ঞান কতটুকু? কটু আর মধুর বাইরে থেকে আসে আর কঠিনের আবির্ভাব হয় ভেতর থেকে—মানুষের কাজই এর স্রষ্টা। আমি এক নিঃসঙ্গতার সাম্রাজ্যে বাস করি। এই একাকিত্ব যৌবনে পীড়াদায়ক, কিন্তু পরিণত বয়সে বড়ই মধুর।"

মাছ জানে না জলের খবর, মানুষ জানে না বিশ্বলোকের রহস্য। তবু মানুষ, মানুষ বলেই রহস্যের সমাধান চাইবে। এ নিশ্চয় কঠিন, তবু কঠিনের রহস্য জানার সাধনা মানুষের—সেখানে সে হয়তো একা, হয়তো বা অনেকের মধ্যে। তবু কঠিনের সান্নিধ্যে সে নিঃসঙ্গ, তার অস্তিত্বের বিশেষত্ব সেইখানেই। এই নিঃসঙ্গতাও মধুর!

জার্মান অনুশাসনে বিরোধী আইনস্টাইন শেষ জীবনে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্ব দেখলেন ; বিজ্ঞানীদের কাজে সর্বত্র স্বাধীনতা নেই, আছে রাষ্ট্রশক্তির পদে পদে বাধা সৃষ্টির প্রচেষ্টা। এও এক ৎসুয়াং—একেও তিনি সইতে পারেন না। ১৯৫১ সালে মুখর হয়ে বললেন,

"আজ যদি আমি কোন তরুণ যুবক হতাম, আর আমাকে আমার ভবিষ্যৎ পেশা বেছে নিতে বলা হতো, আমি তা হলে বিজ্ঞানী, গবেষক বা অধ্যাপক হতাম না, বর্তমানের এই অবস্থায়, নামমাত্র স্বাধীনতা এখনো যেটুকু আছে, তার আশায় আমি বরং মিস্তিরি বা ফিরিওলা হতাম।"

ওপেনহাইমার একই কথার স্মৃতিচারণ করলেন,

"জীবনের শেষভাগে মারণাস্ত্র আর যুদ্ধের বীভৎসতা দেখে হতাশ হয়ে আইনস্টাইন বলেছিলেন যে, নতুন করে জীবন শুরু করার সুযোগ যদি তার হতো তা হলে তিনি বরং প্লাম্বার হতেন। তাঁর এই বক্তব্য গাম্ভীর্য আর ব্যঙ্গের এমন একটা সমন্বয় যে তার রদবদল করার চেষ্টা আজ কারো করা উচিত নয়।"

বুদ্ধিজীবীদের স্বাধীনতা নেই। অথচ তাঁদের দায়িত্ব বেশী, সেই দায়িত্বের বিকাশ যদি না ঘটে, তবে বুদ্ধিজীবী আর সাধারণ পেশার কারবারীদের তফাত নেই। তাঁর অনন্য পবিত্র সত্তা তাঁকে দায়িত্ব গ্রহণ করতে প্রবৃত্ত করে, এড়াতে নয়।

মানবীয় সমস্যার প্রতি তাঁর যে দৃষ্টিভঙ্গী তার ব্যাখ্যা ওপেনহাইমারের মতে একটি মাত্র সংস্কৃত শব্দে করা যায়,

"সেটি অহিংসা যার অর্থ কাউকে আঘাত না করা, কারো ক্ষতি না করা। কর্তৃত্ব আর ক্ষমতার প্রতি তাঁর অবিশ্বাস ছিল। আনস্ট রাদারফোর্ড এবং নীয়েল্স বোর সম্ভবত যে দুইজন বিজ্ঞানী খ্যাতিতে প্রায় তাঁর সমতুল্য ছিলেন, তাঁদের মতো আইনস্টাইন রাষ্ট্রনায়ক ও কর্তৃত্ববান ব্যক্তিদের সঙ্গে অনায়াসে সাবলীল বাক্যালাপে অভ্যস্ত ছিলেন না।...তবু যেখানেই তিনি হিংসা আর নিষ্ঠুরতা দেখুন না কেন, তাঁর কণ্ঠ তার বিরুদ্ধে স্বর হয়ে উঠত। কোনরকম রাখা-ঢাকার ব্যাপার নেই—একেবারে স্পষ্ট কথা।"

তাঁর শেষ জীবনের সহযোগী লিওপোল্ড ইনফেল্ড লিখেছেন,

'সারা পৃথিবীর বিবেকের মতো এই মানুষটি মনে মনে যাবতীয় আত্মপ্রচারে, ভীতি প্রদর্শন আর নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে গভীর ঘৃণা পোষণ করতেন। এর থেকে সহজে মনে হতে পারে যে, তিনি যেন এক অনুভূতি প্রবণ মানুষ, অবিচার হিংসার নাম শুনলে উত্তেজিত হন। তাঁর মতো নিঃসঙ্গ নির্জন জীবনযাপন করতে আমি অন্য কাউকে দেখিনি। তাঁর মহান হিতৈষণা, পবিত্র সততা, আর সামাজিক চিন্তাধারা বাইরে যেমন প্রকাশ পাক না কেন, আসলে পুরোপুরি নৈর্ব্যক্তিক—যেন অন্য কোন জগতে তাদের সৃষ্টি। তাঁর হৃদয়ে রক্ত ঝরে না, তার চোখে নেই কান্না।"

যে নৈর্ব্যক্তিক, অনুভূতি শূন্য নিরাসক্ত যুক্তিবাদী দৃষ্টি নিয়ে বিজ্ঞানের চর্চা শুরু করেছিলেন, সেই একই দৃষ্টি নিয়ে জগৎকে দেখছেন, জীবনকে বুঝতে চাইছেন। বিজ্ঞানের তত্ত্ব অথবা মানুষের ইতিহাস ও নিয়তি সব কিছু যুক্তি দিয়ে চিন্তা দিয়ে, বোধি দিয়ে বুঝতে চেয়েছেন। অথচ মনের এই নৈর্ব্যক্তিকভাব তাঁকে শুষ্ক নিরস করে তোলেনি। তাঁর চরিত্রের সরসতা তাঁকে হেসে উঠতে সাহায্য করেছে। বিচিত্র কথা বলে হেসে ওঠা স্বাভাবিক।

এক তরুণী মহিলা সাংবাদিক তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, ফিজিক্স ছাড়া আর কোন বিষয়ে কথাবার্তা বলেন না? প্রশ্নের উত্তরে আইনস্টাইন মহিলাটিকে দৃষ্টি দিয়ে জরিপ করে চোখ মটকে বলেন, "বলি, তোমার সঙ্গে বলা হয় নি।"

নিমন্ত্রিত অতিথিরা বিদায় নিয়েও যখন দরজায় দাঁড়িয়ে শেষ কথা বলে চলেন, তখন আইনস্টাইন চুপি চুপি বলে, "এসব দেখে আমার সময়ের কথা মনে হয়—চিরকাল চলে, তবু একেবারে যায় না।"

ডাক্তাররা সিগার খাওয়া বন্ধ করে পাইপ খেতে বলেন। আইনস্টাইন শিউরে উঠে বলেন, "পাইপ যে বড্ড খরচ, দেশলাই এর কত কাঠি পোড়ে।" অথবা যে খাদ্য তাঁর খাবার কথা নয় সেটিকে দৃষ্টিভোগ করে বলেন, "জীবনে আনন্দ সম্ভোগের একটা শাস্তি শয়তান ঠিকই দেবে। হয় শরীরে বা মনে কষ্ট পাবে, নয় মোটা হবে।"

এই হাসি-পরিহাসোচ্ছলতা ধীরে ধীরে কমে আসে। ব্যক্তি-জীবন নিস্তরঙ্গ হয়ে

ওঠে। দৈনন্দিন কাজে বাইরের দাবি বেড়ে ওঠে, অন্য দিকে আছে অংক ফিজিক্স নিয়ে আঁকি বুঁকি খেলা। বিজ্ঞানের তত্ত্ব প্রকাশের ভাষা যে জটিলতম গণিতের পদ্ধতির প্রয়োগে পাওয়া যাবে, এ সম্বন্ধে দ্বিধাহীন হয়ে উঠছেন। "অনেক বছর ধরে স্বাধীনভাবে গবেষণা করে এই কথাটি হৃদয়ঙ্গম" করেছেন। এই কাজের আকর্ষণে প্রতিদিন ইনস্টিট্যুটে নিজের ছোট ঘরটিতে হেঁটে যান, সহকারী সহকর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন, কাজ করেন, আবার ধীর পায়ে ফিরে আসেন, হাতে একটি লাঠি। কখনো কখনো বেহালায় ছড় টানেন, কোন সুরের আদল জাগে, সুস্পষ্ট সুরটির রেশ পাওয়া যায় না। সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে বোন মাজার রোগশয্যায় বসে কিছু পাঠ করেন। বোনের মৃত্যুর পর সে পাঠও শেষ!

জীবনের চৌহদ্দিতে সারল্য প্রকাশ দেখা দেয়। তাঁর কাজে কর্মে, কথাবার্তায় আলাপে আলোচনায় এই সরলতা ফুটে ওঠে। শূন্য থেকে, মানুষের অভিজ্ঞতার বাইরের জগৎ থেকে মূল সত্যটি এনে যিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন সেই জটিল চিন্তার লোকটির সরলতায় মুগ্ধ হতে হয়। সঙ্গীতের ধ্রুপদী শিল্পী বিটোফেনের সঙ্গে তুলনা খুঁজে পান কিছু লোক। বিটোফেন সম্পর্কে ভাষ্যকার লেনার্ড বার্নস্টাইনের কথা উদ্ধৃতি করে কেউ বলেন, কত জটিল অথচ কি সরল। অন্য কেউ বলেছেন, চার্লি চ্যাপলিনের চেহারায় শেক্সপিয়রের ললাট। তুলনা যত, প্রতিতুলনাও ততখানি।

রাজনীতিতে তিনি গান্ধীজীর সমকক্ষ নন। অথচ রাজনীতিক জগৎকে নাড়া দিয়েছিলেন। তাঁর স্টাডিতে শোভা পেত গান্ধীজীর একটি ছবি। এ যুগের শ্রেষ্ঠ মানুষ তাঁর মতে কে—এ প্রশ্নের দ্বিধাহীন উত্তর, গান্ধী। ডক্টর শ্বাইৎসার—তিনিও মহামানব। তাঁর জানা শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ্ হলেন লরেন্স। গণিতবিদ্ গিবস তাঁদের পূর্বসূরী, তবে লরেন্সের পাশে তাঁকে বসাতে তাঁর দ্বিধা নেই। "মিনকোওস্কি গণিতবিদ্, আমার সীমিত গণিত-জ্ঞান তাঁর প্রতিভার সম্যক বিচার করতে পারে না।"

১৯৫৪-৫৫ সাল। কয়েকটি ঘটনা পরপর ঘটে। ১৯৫৫ সালে বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বের পঞ্চাশ বছর পূর্তি হবে। বের্ন সহরে এই উপলক্ষে আপেক্ষিক তত্ত্বের উপরে একটি সেমিনার হবে, সুইস সরকার তাঁকে যোগ দিতে অনুরোধ করে। আইনস্টাইনের যাবার ইচ্ছে, অথচ শরীর খারাপ। বিশেষ আপক্ষিকতাবাদ প্রমাণিত তত্ত্ব, অন্যদিকে সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বে তখনো সংশয় আছে। মাক্স বোর্ন বললেন,

"প্রকৃতির রহস্য উন্মোচনের জন্য এটি মানুষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তা। তবু তিনটি উপপত্তির মধ্যে যেটি বিশাল জগৎ নিয়ে গড়ে উঠ, সেই ভেনাসের কক্ষগতির তাৎপর্যের নির্ভুল ব্যাখ্যা এই তত্ত্ব দিতে পারে, অন্যদিকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রের জগতে, মাইক্রো ওয়ার্লডে, আলোর বাঁক আর আলোর সরণ এই দুটি উপপত্তির পরিমাণ (Magnitude) নিয়ে সংশয় থাকে। হয়তো যে আপেক্ষিকতাবাদ আমাদের জানা সে তত্ত্ব এখনও নিখুঁত নয়।"

১৯৫৪ সালে মাক্স বোর্ন নোবেল প্রাইজ পান। এ সংবাদ কত যে আনন্দের।

ইতিমধ্যে ওয়াইজম্যানের মৃত্যু হয়েছে। ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনগুরিয়ন আইনস্টাইনকে ইসরাইলের প্রেসিডেন্ট হতে বলেন। আইনস্টাইন অস্বীকৃতি জানান; বলেন, 'প্রকৃতির কিছু কিছু বুঝি, মানুষের রহস্যের কিছু বুঝি না।" ইসরাইলের কর্তৃপক্ষ বলেন, প্রেসিডেন্ট হলো রাজমুকুটের মতো, রাজার অনন্যতার দ্যোতনা। ইহুদি জাতির শোভার জন্য অসাধারণ আইনস্টাইন ছাড়া প্রেসিডেন্ট হতে আর কে পারেন? আইনস্টাইন বলেন, প্রেসিডেন্ট নির্জীব নন, তিনি শোভা হলেও দেশের সব কিছু কাজের দায়িত্বের মূল ভাগীদার। তাঁর নিজস্ব বিবেক ইসরাইলের সব কাজের সমর্থন করতে তাঁকে বাধ্য নাও করতে পারে। তিনি প্রেসিডেন্ট হবেন না।

ইনফেল্ড যাকে বিশ্ববিবেক বলেছেন, নিজের বিবেকটি তিনি কি করে বিসর্জন দেবেন?

বিজ্ঞান যুক্তিনিষ্ঠ আর মানব জগতে যুক্তি সর্বত্র খাটে না। সৃষ্টির রহস্যে লুকিয়ে থাকে নিয়ম আর মানব জগতে বেনিয়মের হাঙ্গামা। প্রকৃতি বোঝা যায়, মানুষকে বোঝা যায় না। তবুও থাকে মূল্য বোধ এবং বিবেক। নিউটনের মহাকর্ষ বা গ্রেভি-টেশন তত্ত্ব থেকে পৃথক যে সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব তিনি গড়ে তুললেন তার প্রথম পার্থক্য হলো সৌরজগতে সূর্যের আকর্ষণ না থাকলে পৃথিবী তৎক্ষণাৎ মহাশূন্যে ভেসে যাবে—নিউটনের এই উপপত্তির বিরোধিতা। আইনস্টাইন বললেন, পৃথিবী ভেসে যাবে—এটি নিশ্চিত; তবে তৎক্ষণাৎ নয়, প্রায় আট মিনিট পর—সূর্যের আলো পৃথিবীতে আসতে যে সময়টুকু লাগে। মহাবিশ্বের মডেল আর মহাকর্ষ তত্ত্ব এ দুটি জ্যামিতিকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে, দেশকালের বক্রতার জ্যামিতি। অন্যদিকে আলোর কণার গণিতে তিনি সম্ভাবনার তত্ত্ব বা প্রবাবিলিটিকে নিয়ে এলেন। তারই পথ ধরে অন্য বিজ্ঞানীদের হাতে গড়ে ওঠে অনিশ্চয়তা ভরা সম্ভাবনার নির্দেশে গড়া কোয়ান্টাম ফিজিক্স। সম্ভাবনার এই নির্দেশনা আইনস্টাইন মেনে নিতে পারেননি। তাঁর ধারণা ছিল পদার্থবিদ্যার সব শাখাকে জ্যামিতির সূত্রে গাঁথা যাবে। প্রিন্সটনে এসে সম্ভাবনার সূত্রে গড়া কোয়ান্টাম ফিজিক্স-এর বিকল্পটি জ্যামিতির পথে খুঁজে গেলেন; ত্রিশ বছরের খোঁজা বিফল হলো।

আধুনিক বিজ্ঞানে ফিজিক্স-এর একীভূততার চিহ্ন পাওয়া যায় জ্যামিতিতে নয়, কোয়ান্টাম ফিজিক্স-এ। তবে এখানেও একটি তত্ত্ব কোয়ান্টামের সর্বগ্রাসী আলিঙ্গন এড়িয়ে পৃথক ও বিশিষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে—সেটি আইনস্টাইনের মহাকর্ষ তত্ত্ব। দুটি জানালা দিয়ে দুটি জগৎ এখনো দেখা হচ্ছে; কোয়ান্টাম ফিজিক্স-এর আলোয় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জগৎটিকে আর মহাবিশ্ব লোকের বিশালত্ব চেনা যায় রিলেটিভিটির আলোকে। আইনস্টাইন এখনো অনন্য।

মহাকাশ তত্ত্ব গঠনের সময় জোর করে সামঞ্জস্য টেনে আনতে গিয়ে নিজের গণিতে পাওয়া বর্ধমান প্রসারিত বিশ্বলোকের ধারণাটিকে এড়িয়ে গেলেন। হাবেলের তথ্যে

জানা গেল এ বিশ্বলোক সম্প্রসারিত, বর্ধমান। নিজের ধারণাটিকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে গণিতের ব্যাখ্যার অস্বীকৃতিটিকে পরবর্তীকালে বললেন, "জীবনের সবচেয়ে অন্যতম ভুল।" বিজ্ঞান জগতে তাঁর দ্বিতীয় ভুল হলো, সামান্য কটি তথ্যের ভিত্তিতে একীভূত ক্ষেত্র তত্ত্বটিকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা। ১৯২১ সালে তিনি একবার লিখেছিলেন, "চমকপ্রদ আবিষ্কার হলো তরুণদের জন্য। সুতরাং আমার কাছে এসব অতীতের বস্তু।" তাঁর উক্তির দীর্ঘ ছায়া তাঁর শেষ জীবনটিকে যেন ঢেকে রেখেছিল।

তবু ওপেনহাইমার মনে করেন, এ ভুলের অধিকার তাঁর ছিল। নিজেকে ঠাট্টা করে বলতেন, "জানো, প্রিন্সটনে ওরা আমাকে বুড়ো-হাবড়া, ওল্ড ফুল বা ইতিহাসের বস্তু ভাবে।' সত্যকে খোঁজার নিরন্তর প্রচেষ্টা থেকে তবু নিবৃত্ত হতে পারেন না। যে পথ ভুল—সে পথ জানারও প্রয়োজন আছে—ভবিষ্যতের বিজ্ঞানীদের কাছে পথের নির্দেশ খোঁজার বিকল্পগুলি সংকুচিত হয়ে দাঁড়ায়। হার্বার্ট স্পেনসারের একটি উক্তির উদ্ধৃতি তিনি বারবার করতেন, "সব তত্ত্বই একদিন ভুল জানা যায়, ভুল প্রমাণিত হয়—এটাই ট্রাজেডি। তবু যে সৎ ভাবনা তার মধ্যে থাকে তা বয়ে চলে তত্ত্ব থেকে তত্ত্বান্তরে, চিরন্তন সত্যের প্রতিষ্ঠার পথ বেয়ে।" ভুল জানাটাও যে সত্যের অন্বেষণের সোপান!

১৯৫২ সালে লিখলেন, "আমার কাজ নিয়ে বিশেষ কিছু বলার নেই,—কোন ফলাফল রেজাল্ট আর পাচ্ছি না। এখন আমার ভূমিকা হলো বর্ষিয়ান রাজনীতিবিদ্ আর জুইস স্বাধুসন্তের।"

মধ্য বয়সে বিজ্ঞানের পথ ছেড়ে রাজনীতির জগতে পা বাড়িয়েছিলেন। শেষ বয়সে চেয়ে দেখেন বিজ্ঞান তাঁর পাশ থেকে দূরে সরে আছে ; তাঁর কপালে আঁটা রাজনীতিকের কাঁটার মুকুট আর ইহুদি সেন্টের জ্যোতির্বলয়। বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ গঠনের সময় একবার তিনি বলেছিলেন, "সন্দেহজনক চরিত্রটি হলো সময়।"—জীবনের শেষ অংশে জানলেন, সময় শুধু সন্দেহজনক নয়, সেই দোষী। এনফেল্ডকে তিনি হেসে বললেন, "এটাও একটা সত্য।"

জীবনের পচাঁত্তর বছর পূর্ণ হবার কালে আরেকবার তিনি ঝড়ের শামিল হন। বার্ট্রান্ড রাসেলের বুদ্ধিজীবীদের পাগওয়াশ আন্দোলনের তিনি শরিক হলেন। রাসেলের সঙ্গে যোগ দিয়ে প্রস্তাব করেন যে, বিজ্ঞানীদের একত্রে সমবেত হয়ে দেখা উচিত যে তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে পারেন কিনা এবং মারণাস্ত্র বৃদ্ধির প্রতিযোগিতার পরিমাপে যে সর্বনাশের আগুন বিশ্বব্যাপী জ্বলতে চলেছে সেটিকে এড়ানো যায় কিনা। রাসেলকে বলেন, "আপনি সেনাপতি। আমরা সৈন্য। শান্তির জন্য আমরা আপনার সঙ্গে আছি, পেছনে আছি।"

১৯৫৫ সালের ১৬ই এপ্রিল তারিখে বিশ্ববিবেকের কাছে ইসরাইলের কথা তুললেন। একটি নিপীড়িত জাতির আবাস এই রাষ্ট্রটিকে রক্ষার কর্তব্য বিশ্ববিবেকের ; শান্তি প্রতিষ্ঠার এই পরীক্ষায় পিছিয়ে থাকলে চলবে না।

এর কিছুদিন আগে অসুস্থতা বোধ করেছেন। তবু রাসেলের জন্য, বিশ্বশান্তির মেনিফেস্টোর খসরা লিখে যাচ্ছেন। নিজের চারদিকে যে হতাশার গণ্ডী গড়ে তুলেছিলেন, সেটি ভেঙে ফেলে আবার সক্রিয় হয়ে উঠতে চাইছেন। ইসরাইলের নিউ-ইয়র্কের কন্সাল ডাফনির সঙ্গে তাঁর লেখাটি নিয়ে আলোচনা করেন—কতটুকু জোর দিয়ে লেখা হলে বক্তব্যটি সুস্পষ্ট হবে সেকথা তোলেন কিছু পরে হঠাৎ ভীষণ অসুস্থ হযে পড়েন। মিস ডুকাস প্রতিবেশীদের সহায়তায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যান। ডাক্তাররা পরীক্ষা করে বলেন, হৃৎপিণ্ডের পাশে মহাধমনীর আচ্ছাদন প্রচণ্ড-ভাবে ফুলে উঠেছে, যে কোন মুহূর্তে ফেটে গিয়ে তিনি মারা যেতে পারেন অপারেশন করা দরকার।

আইনস্টাইন বলেন, "অপারেশন—না। ধমনী ফাটে ফাটুক; এক সময়ে সব শেষ হবে, কি ক্ষতি; সেই অনিবার্য কাল যখন আসে, আসুক। জীবনের স্রোত প্রবহমান। আমি সেখানে বিশিষ্ট নই, বিচ্ছিন্নও নই।"

হাসপাতালে কেবিনে চিৎ হয়ে শুয়ে শুয়ে লেখার খসরাটি শেষ করতে থাকেন। ১৭ই এপ্রিল সন্ধ্যেবেলা সহকারী সহযোগী বিজ্ঞানী বন্ধুরা দেখা করতে আসেন। তাঁদের সঙ্গে তার একীভুত ক্ষেত্রে তত্ব নিয়ে আলোচনা করেন, মহাকর্ষ আর তড়িৎ চুম্বক তত্ত্বের ক্ষেত্রের স্বতন্ত্র চেহারাটিকে মিলিয়ে দিয়ে বিশ্বের অম্লান সুষমাটিকে প্রকাশ করবেন, সেদিনও তাঁর সেই আকাঙ্ক্ষা। আর দ্বিতীয় চিন্তা হলো, বিশ্বশান্তির জন্য সর্ব শিবিরের বুদ্ধিজীবীদের একত্রিত করা। স্পিনোজার কথা উদ্ধৃত করে বললেন, Amar Dei Intellectualis, ভগবান বুদ্ধিমানদের ভালবাসেন। ভালবাসা একতরফা নয়। বুদ্ধিমানদেরও এই পৃথিবীকে ভালবাসতে হবে।

১৮ই ধমনী ফেটে যায়। অজ্ঞান অবস্থায় তিনি কথা বলেন: ভাষা জার্মান, তাঁর মাতৃভাষা, তাঁর মনোবেদনার যারা কারণ সেই জার্মান নাৎসীদের ভাষা। পাশে বসে থাকা সিস্টার জার্মান ভাষা জানেন না। জানা গেল না তিনি কি বলেছিলেন, কি বলতে চেয়েছিলেন।

তাঁর শেষ লেখা শান্তিবাদের খসরাটি হারিয়ে যায়। পরে এটি প্রকাশ হয়—তবে যেভাবে এটি প্রকাশ হয় সেটি তাঁর বক্তব্য কিনা সন্দেহ থাকে।

১৯৫৫ সালের ১৮ই এপ্রিল তিনি মারা গেলেন। তাঁর ইচ্ছামতন, মৃতদেহটি পুড়িয়ে ফেলে ছাই ছড়িয়ে দেওয়া হলো অজানা অজ্ঞাত স্থানে।

তাঁর শেষ লেখা, শেষ বক্তব্যটি জাসা গেল না। জানা গেল না কোথায় ছড়িয়ে আছে তাঁর দেহের শেষ স্মৃতি।

মহাবিশ্ব আর মানব বিশ্বের সুষমার খোঁজে একজন নিঃসঙ্গ সন্ধানী চারণিকের পদধ্বনি মৌন হয়ে গেল। বিশেষ আপক্ষিকতা বাদের পঞ্চাশ বছর পূর্তির সেমিনারে তত্ত্বের স্রষ্টার আসনটি শূন্য থাকে। সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের খুঁত কটি দূর করবার জন্য সেই কারিগরটি বেঠিকানা হয়।

একটি জীবনের শেষে একটি যুগের শেষ হলো।......

নিজের মনের মধ্যে যে বেড়া উঠেছিল, সেটিকে টপকে যাবার আকাঙ্ক্ষা জাগে, তবে সেদিন মন্ত্রের মত কেও যেন বলেছিল, তল্পি গোটাও, এখন যাবার সময়, কেউ থাকে না। আইনস্টাইন হেসে বললেন, "ক্ষতি কি ? যেতে তো হবেই।"

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিচরণ করে ফিরে এসে রোজনামচা লিখতে বসে জানা গেল, শেষ কোথাও থাকে না ; শেষের কথা, শেষের লেখা নিঃশেষ থাকে বলে হারিয়ে যায়। আইনস্টাইন এক গাল হেসে ওপেনহাইমারকে বললেন, 'অসারের অসার, সবই অসার।'

ইউরোপ ও আমেরিকার দুটি ভূ-খণ্ডে পরিব্রাজকের মতো ঘুরে এসে বিজ্ঞান ছাড়া আর কোথাও ঠিকানা খুঁজে পেলেন না তিনি। হেসে বোর্নকে লিখলেন আইনস্টাইন, "অপরিচিতের তকমা এঁটে ছিন্নমূল মানুষের মতো হেথায় হোথায় চিরকাল শুধু ঘুরে বেড়ালাম। জানলাম না কিছু।"

খোঁজার নাম বিজ্ঞান, আর খোঁজার সেই পথিকটির নাম আইনস্টাইন। যিনি এক আলোর মশাল থেকে অন্য আলো জ্বালার কাজে নিমগ্ন ছিলেন। আলোর উজ্জ্বল শিখার সুষমা জানতে গিয়ে আনন্দে জ্বলে পুড়েছিলেন। আইনস্টাইন স্বীকার করে বলেছেন, "এই পথ বেছে নেবার জন্য আমার কোন অনুশোচনা হয়নি।'

পথের শেষে ভুলের কাঁটা ছড়ানো। জগৎ-কাঁপানো তত্ত্বে সংশয় দেখা দেয়। সংকট সংশয় দিগ্‌বিদিকে। আইনস্টাইন চুপি চুপি হার্বার্ট স্পেনসারের কথা উদ্ধৃতি দিয়ে বললেন, "কি জানো, সব তত্ত্বই একদিন ভুল জানা যায়। তবু যে সত্য তার মধ্যে থাকে তার ক্ষয় নেই, লয় নেই—সে চির প্রবহমান।"

যাকে বলো ট্রাজেডি, সেইতো সত্যের প্রবহমানতা। সেখানেই থাকে বিজ্ঞান, থাকে জীবন ; আর থাকেন আইনস্টাইন ! এলবার্ট আইনস্টাইন।

সূর্যবন্দনা

মৃত্যুর সাতদিন আগে ১১ই এপ্রিল ১৯৫৫ সালে এলবার্ট আইনস্টাইন আণবিক যুদ্ধের বিরুদ্ধে, শান্তির আবেদনে বিজ্ঞানীদের শামিল হবার ঘোষণাপত্রটি সই করেন। এই মেনিফেস্টোটির স্বাক্ষরকারী অন্যান্যরা হলেন, বার্টাণ্ড রাসেল (ইউ. কে.), ম্যাক্স বোর্ন (জার্মানি), পি. ব্রিজমেন (ইউ. এস. এ.), এল, ইনফেল্ড (পোলাণ্ড), এফ. জুলিও কুরী (ফ্রান্স), এইচ. জে. মুলার (ইউ. এস এ.), এল. পাউলিং (ইউ. এস. এ.), সি. এফ. পাউয়েল (ইউ. কে), জে. রোথলাট (ইউ. কে) এবং এইচ. ইউকাওয়া (জাপান)। স্বাক্ষরকারীরা দু'জন ছাড়া সকলেই নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী-গণিতবিদ। এই মেনিফেস্টোর পরবর্তী ধাপে ১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে পাগওয়াশ সম্মেলনের সূচনা। মেনিফেস্টোটি রাসেল ও আইনস্টাইনের যুগ্ম প্রচেষ্টা, এর ছত্রে ছত্রে আছে আইনস্টাইনের শান্তিবাদ ও বিজ্ঞানীর কর্তব্যের ঘোষণা, মেনিফেস্টোর শেষ দুটি স্তবকে এঁরা বললেন, "অনুভূতির রাজ্যে আমরা কেউই প্রায় নিরপেক্ষ নই। তবুও, মানুষ হিসেবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিরোধের কারণগুলি যদি কোন একটি পদ্ধতিতে মোকাবিলা করতে হয়, এবং তা' যদি কোন একটি দলকে স্বস্তি এনে দেয়—সে দল কমুনিস্ট, এন্টি-কমুনিস্ট, এশীয়, ইউরোপীয়-আমেরিকান, সাদা বা কালো যাই হোক না কেন—সেই পদ্ধতি, আর যা'হোক, যুদ্ধ নয়। পূর্ব ও পশ্চিম গোলার্ধের মানবসমাজকে এই কথাটিই আমরা বোঝাতে চাই।

আমরা চাইলে, এইখানে, আমাদের সামনে নিত্য প্রবহমান রবে জ্ঞান, বুদ্ধি ও সুখ। অন্যদিকে, নিজেদের ঝগড়া ভুলতে না পেরে আমরা কি যুদ্ধকে ডেকে নেব? মানুষ হিসেবে মানুষের কাছে আমাদের আবেদন, নিজেদের মানবত্বকে, মানবতাবোধকে শুধু মনে রাখুন, আর সব ভুলে যান।—যদি তা' করা যায় তবে সামনে থাকে নতুন স্বর্গের খোলা দরজা; আর যদি তা' না পারা যায়, তবে যা সামনে থাকে, তা' বিশ্বব্যাপী মৃত্যুর নিশানা।"

ফ্রানক্ জোনসকে শেষ জীবনে আইনস্টাইন বলেছিলেন, "বিংশ শতাব্দীর শুরুতে কে ভেবেছিল যে পঞ্চাশ বছরে আমরা জ্ঞানের রাজ্যে এতটা অগ্রসর হব, আর সঙ্গে সঙ্গে এতটা অবুঝ হব?...আজ হয়তো ছুটন্ত মহিষের পালের পায়ে দলিত না হলে আমরা খুশি হই।...ভবিষ্যতের কথা আমি ভাবতে পারিনে—কারণ বড় তাড়াতাড়ি সে এসে যায়।"

আর মরিস সলোভিনকে চিঠিতে লিখেছিলেন, "আপনি হয়তো ভাবছেন, নিরুত্তাপ সন্তোষ নিয়ে আমি পিছন ফিরে আমার সারাজীবনের কাজের দিকে চেয়ে থাকি। কাছে

থেকে যা দেখি তা কিন্তু আলাদা। আমার মনে হয় না কোন একটি তত্ত্ব স্থায়ী হবে। আমি ঠিক রাস্তায় চলেছি কিনা জানিনা, সেখানেও আমার সংশয়। আমি সঠিক হতে চাইনি। চেয়েছিলাম জানতে যে আমি সঠিক পথযাত্রী। (I do not want to be right. I only want to know whether I am right.)"

মানবতার প্রচারে, বিশ্বশান্তির প্রচেষ্টায় আজকে জগতের নিরীখে আইনস্টাইন নিশ্চিত সঠিক পথযাত্রী। বিজ্ঞানের রাজ্যে তাঁর তত্ত্ব কতটা স্থায়ী—সে আলোচনা চলেছে এবং চলবে। আর যত দিন যায়, বিচার-বিবেচনায় তাঁর তত্ত্বের নতুন নতুন সুকুমার সৌন্দর্য চোখে ধরা পড়ে।

আপেক্ষিকতাবাদকে সরিয়ে রাখলেও বিজ্ঞান জগতে স্বমহিমায় তিনি অধিষ্ঠিত থাকেন। তাপ গতিবিজ্ঞানে স্ট্যাটিসটিক্যাল মেথডের ব্যবহারে তিনি গণিতবিদ গিবসের সার্থক উত্তরসূরী। কোয়াণ্টাম তত্ত্বের সূচনা প্লাঙ্কের হাতে হলেও তার কাঠামো আইনস্টাইনের হাতে গড়া। নিউটনের কোর্পাসিকুলার তত্ত্বের নব রূপায়ণে তাঁর হাতে আলোক কণা ফোটন কণা-তরঙ্গের দ্বৈত রূপ পায়। সমকণার সাংখ্যায়নিক গবেষণা ক্ষেত্রে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে তিনিও পথিকৃত। আর আলোক-তড়িৎ ফল গবেষণায় তিনি নতুন সাম্রাজ্যের দ্বার ফলিত-বিজ্ঞানীদের জন্য খুলে দিয়ে গেলেন। বর্তমান মহাবিশ্ব গবেষণার ক্ষেত্রে জটিল, সংবদ্ধ কম্পোজিট বস্তুর সৃষ্টিতে তাঁর ব্রাউনিয়ান মুভমেন্ট তত্ত্বের প্রয়োগ হচ্ছে। আর পরমাণুর স্বাভাবিক ভেঙে যাবার প্রবণতা বোঝাতে যে তত্ত্ব তিনি দিলেন, সেই পথে গড়ে ওঠে লেসার ও মেস্যার রশ্মি। এই কাজ গুলির যে কোনটিই তাঁকে বিজ্ঞান জগতে চিহ্নিত করতে পারত।

বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের সৃষ্টি ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করে ; এ তত্ত্ব আইনস্টাইন না গড়লেও হয়তো বা লরেন্স অথবা পোআঁকার এই সত্য উপলব্ধি করতে পারতেন। ১৯০৫ সালের পরিবর্তে হয়তো এ তত্ত্বের দ্বারে বিজ্ঞানকে তাঁরা ১৯০৮ বা ১৯১০ সাল নাগাদ পৌঁছে দিতেন। সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ, অন্যদিকে, সম্পূর্ণভাবে তাঁর নিজের সৃষ্টি। আবার এরই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তাঁর বিশ্বতত্ত্ব ঘোষণা করলেন, জানালেন মহাবিশ্বের আকার ও তার উৎপত্তির আনুমানিক সম্ভাবনা।

সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ সৃষ্টির কালে আইনস্টাইনের হাতে যে কটি সামান্য উপকরণ ছিল, তা হলো নিউটনের কয়েনসিডেন্সের আইডিয়া অথবা মিলের ধারণা—জাড্য বা ইনারশিয়া জনিত ভর বা মাস এবং মহাকর্ষজনিত ভরের সমানত্বের বোধ ; এবং ম্যাকের তত্ত্ব যা বিজ্ঞানের যুক্তিতে প্রমাণ করা যায় না অথচ দর্শনের আলোকে যা উদ্ভাসিত। ম্যাক তাঁর আপেক্ষিকতাবোধ জানাতে গিয়ে জানালেন যে দূরে, মহাবিশ্বে

নানা স্তরের অন্তর্ক্রিয়ার শক্তিতে গড়ে ওঠে জাড্য বা ইনারশিয়ার শক্তি বা ফোর্স। এই দুটি মাত্র সূত্রের ইঙ্গিতে আইনস্টাইন সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ গড়ে তুললেন। নিশ্চিতে বলা যেতে পারে, আইনস্টাইন এই তত্ত্ব প্রকাশ না করলে, বিজ্ঞানের যে ধারা তখন প্রবহমান ছিল, তারই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আরও পঞ্চাশ বছর পর এই তত্ত্বের দ্বারে পৌঁছাতাম। ১৯১৬ সালে কিছুতেই নয়।

তাঁর হাতে গড়া বিশ্বলোকতত্ত্ব বা কসমোলজি নিয়ে গত পঁচিশ বছর ধরে বহু চিন্তা ভাবনা হয়েছে। ১৯৪৮ সালে ব্রিটিশ বিজ্ঞানীমহল আইনস্টাইনের তত্ত্ব পরিবর্তন করে Steady State বা স্থির অবস্থা তত্ত্ব ঘোষণা করেন। বর্তমানে মহাকাশ গবেষণা কিন্তু আইনস্টাইন—লা মেটারের তত্ত্বই সঠিক জানাচ্ছে।

অন্য দিকে বোর-হাইসেনবার্গ-শ্রোয়েডিঙ্গার এই ত্রয়ীর হাতে গড়ে ওঠা আধুনিক কোয়ান্টাম গণিত আইনস্টাইনের পূর্ণ সম্মতি পায়নি। শ্রোয়েডিঙ্গারকে একবার একটি চিঠিতে (৩১শে মে, ১৯২৮ সাল) জানালেন, "হাইসেনবার্গ-বোরের নিদ্রা-উদ্রেককারী দর্শন (না কি ধর্মশাস্ত্র?) এত সূক্ষ্মভাবে বোনা হয়েছে যে গোঁড়া বিশ্বাসীদের কাছে এ যেন এক নরম আরামের বালিশ—এ থেকে মাথা তোলা কঠিন। তাহলে শুয়েই থাকা যাক।" ম্যাক্স বোর্নকে ১৯২৬ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখের চিঠিতে লিখলেন, "কোয়ান্টাম মেকানিক্স নিশ্চিত মনোহর। তবু আমার মনের ভিতর থেকে কে যেন জানাচ্ছে, এটি সত্য নয়। এই তত্ত্ব জানাচ্ছে অনেক, তবু পুরনো জগতের গুপ্ত দ্বারের কাছে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে পারছে না। যে ভাবেই দেখি, অন্তত আমি স্থির প্রত্যয়ী যে সেইজন পাশা খেলতে বসেন নি (He is not playing at dice)।" কোয়ান্টাম গণিতের সম্ভাবনার জগতে এটমের গঠনের, অণুর আকারের আদরা জানা যায়—তবু এখানেও আছে সীমাবদ্ধতা। রসায়ন শাস্ত্র বৃহদণু বা পরমাণুর সার্থক আকারটি জানতে এখনো উদগ্রীব। ১৯৬০ সালে জি. এফ. চিউ গুরু অন্তর্ক্রিয়া (Strong interaction), যেটি নিউক্লিয়ার সিমেন্টের বা গঁদের কাজ করে, সেই শক্তিটির পুনর্মূল্যায়নের কথা তুললেন। বর্তমানে, সত্তরের দশকে পাওয়া তথ্যে সেই বিষয়ের কিছু নির্দেশনা পাওয়া গেছে। সম্ভাবনার সাম্রাজ্য তবু এখনো স্থির প্রতিষ্ঠিত নয়।

একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব, যা আইনস্টাইনের শেষ জীবনের সাধনা, সেটি তাঁর সমন্বয় বোধের চরম কথা। মহাকর্ষ, বিদ্যুৎ চুম্বক শক্তি, গুরু অন্তর্ক্রিয়া এবং ফের্মি প্রবর্তিত লঘু অন্তর্ক্রিয়া (weak interaction) এই চারটি শক্তিকে আইনস্টাইন একটি সূত্রে বাঁধতে চেয়েছিলেন; এ কাজ তিনি শেষ করে যেতে পারেন নি। ১৯৬০-৭৮ কাল ব্যাপী নানা কাজের ভিত্তিতে বর্তমানে লঘু অন্তর্ক্রিয়া ও বিদ্যুৎ চুম্বক শক্তির [illegible]

এডহক সমন্বয়ের ধারণা গড়ে উঠেছে। যাকে বলা হচ্ছে ইলেক্ট্রোউইক (Electroweak) অন্তর্ক্রিয়া। ১৯৭৯ সালে যে প্রমাণ পাওয়া গেছে তা বেশ আশাপ্রদ। আবার ১৯৮২ সাল নাগাদ একটি প্রামাণ্য পরীক্ষার ফলে এটি সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা হয়। তবুও বর্তমানে এই দুটি শক্তির মিলন অনেক আলগা; এখানে নেই আইন-স্টাইনের সমন্বয় বোধের রূপরেখার সুষমার টান।

কোয়াণ্টাম গণিত আর বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের সমন্বয় ধারণার শুরু আইন-স্টাইনের জীবিত কালে। ডিরাক, পাউলি, উইসকফ, ফেনমান, তোমোনাগা প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা এই দুটি ধারার মেলবন্ধন ঘটানোর চেষ্টা করেন—এখানে প্রকাশ পায়নি আইনস্টাইনের স্বকীয় রূপময় বৈশিষ্ট্য; নেই গণিতের সুদৃঢ় ভিত্তিভূমি। কাজ এখনো চলেছে, তবু শেষের সীমারেখাটি এখনো অদৃশ্য।

মহাকর্ষ ও অন্যান্য শক্তির সমন্বয় ধারণার উপর চিন্তা এবং পরীক্ষা চলেছে। সাধারণ আপেক্ষিকতবাদ ও কোয়ান্টাম মেকানিক্স-এর মেলবন্ধনের সঠিক রীতি এখনো অজানা। এক অজানা তত্ত্বের কথা ভাবা হয়—অভিমহাকর্ষবাদ বা সুপার গ্রেভিটি। একটি সুন্দর মনোহর তত্ত্ব—তবু মেলবন্ধন ঘটেনি।

আপেক্ষিকতাবাদের বিশেষত্ব সাদৃশ-ধারণায়। নিউটনের মেকানিক্স ও ফেরাডে মেক্সওয়েলের তড়িৎ চুম্বক তত্ত্বের মিল এবং ত্বরণ ও মহাকর্ষে মিল খুঁজে পেলেন আইন-স্টাইন। এই সাদৃশ্য বোধকে হুইকেটার বললেন, Postulate of Impotence বা ক্লৈব্যের উপপত্তি। অথচ এই উপপত্তিটি বিজ্ঞান জগতে বহু ফলপ্রসু। বিশেষ আপে-ক্ষিকতাবাদে আইনস্টাইন এবং মিনকোওস্কি দেশকালের যে ফ্রেমটি ব্যবহার করলেন সেটি ইনারশিয়া বা জাড্যের সাপেক্ষে গড়া। অন্যদিকে সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদে দেশকালের ফ্রেম নন-ইনারশিয়া বা জাড্যহীনতা অথবা ত্বরণের ধারণায় গড়ে ওঠে। এই ফ্রেম গুলিতে পাওয়া যায় অবিনশ্বর বা অক্ষয় তত্ত্বের (conservation law) ইঙ্গিত। গোটেনগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী নো ইথার প্রমাণ করেছেন যে প্রতিটি সাদৃশ্যবোধ জানাবে অক্ষয় তত্ত্বের নিয়ম এবং উল্টো দিকে অক্ষয় তত্ত্ব জানায় সাদৃশ্যের ধারণা। এই শ্রীমতী নো ইথারকে গোটেনগেন প্রফেসারের পদ দিতে পারে নি ;—কারণ হিসেবে বলা হয়েছিল, সিনেট বিল্ডিং-এ আছে শুধু পুরুষের কক্ষ! এখানে পাওয়া গেল সাদৃশ্যে বৈসাদৃশ্য!

ইমপোটেন্স বা ক্লৈব্যের বিপরীত চিন্তা আধুনিক বিজ্ঞানে হানা দিয়েছে। তবুও শক্তির বৈসাদৃশ্যগুলিকে সাদৃশ্যের পটভূমিতে অক্ষয় রীতিতে, সমানছে এখনো বাঁধা যায়নি।

দেশকালের তত্ত্বের গঠনে আইনস্টাইন জ্যামিতি-গণিত ব্যবহার করেছিলেন। এই জ্যামিতির রীতির বিস্তৃতি তিনি তাঁর একীভূতক্ষেত্রতত্ত্বে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। বিভিন্নমুখী ভিন্ন ভিন্ন শক্তিগুলির প্রভাব মহাকর্ষের উপরে পড়ে—এই আইনস্টাইনীয় চিন্তায় আজ নতুন আলোকপাত ঘটেছে; শুরু হয়েছে জ্যামিতি ও এলজেব্রার মেলবন্ধনের ধারণায় এক নতুন গণিতের কাঠামো গড়ে তোলা।

কোয়ান্টাম গণিত ও আপেক্ষিকতাবাদের মিল ঘটিয়ে সৃষ্টি হয় আপেক্ষিক কোয়ান্টাম বাদ। আইনস্টাইন মহাকর্ষের ক্ষেত্রে গণিতে একটি সম্ভাবনার কথা ভেবেছিলেন। বিদ্যুৎ চুম্বক ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলার ফলে ফোটনকণা পাওয়া যায়—এ তত্ত্ব মেক্সওয়েলের তত্ত্বের আধুনিক রূপান্তর। শক্তির ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে কণার উদ্ভব হয়। সেইভাবে ভাবা হয়েছিল গ্রেভিটির ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলার ফলে পাওয়া যাবে গ্রেভিটন কণা। এই চিন্তার বিস্তৃতি ঘটিয়ে আপেক্ষিক কোয়ান্টাম তত্ত্বে বলা হলো যে কোনো ক্ষেত্রে থাকবে একটি নির্দিষ্ট বল বা ফোর্স এবং থাকে একটি বা এক জাতীয় কণার উপস্থিতি। এই ধরনের ক্ষেত্রের নাম দেওয়া হলো গেজ ফিল্ডস (Gauge Fields)। ইলেক্ট্রোউইক অন্তর্ক্রিয়ায় যে ক্ষেত্রটি ভাবা যাবে সেখানেও থাকবে কণা। গ্রেভিটন নামে যে কণাটির কথা আইনস্টাইন ভেবেছিলেন, সেই ধরনের নতুন কণার চিন্তা আধুনিক বিজ্ঞানে এই শতাব্দীর সত্তরের দশকের শেষার্ধে দানা বেঁধে উঠেছে। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের শুদ্ধতার পরিমাণের কথা ভাবা হয়। *এডিংটন প্রমাণের যে তিনটি রীতির কথা ভেবেছিলেন তারা হলো* (১) মার্কারি গ্রহের অনুসূর গতির গোলমালের কারণ; (২) সূর্যের কাছে তারার আলোর গতিপথের পরিবর্তন এবং (৩) আলোর লাল সরণ বা Red shift। এইসব পরীক্ষা আইনস্টাইনের কালেই হয়েছে—তারা তাঁর তত্ত্বটি প্রমাণিত করেছে, যদিও পরিমাপগত ভুলত্রুটি থেকে যায়। প্রাথমিক পরীক্ষার সীমাবদ্ধতাটুকু পরবর্তীকালের বিশদ আয়োজনের বিস্তৃত পটভূমিতে এড়াবার চেষ্টা হয়। পালসার অথবা রেডিও তারা অথবা যে তারাগুলি আলোক তরঙ্গের পরিবর্তে রেডিও তরঙ্গ সৃষ্টি করে, এদের আবিষ্কারের পর ফোটন কণার গতিপথের বিচ্যুতি নতুনভাবে মাপা হয়। অন্যদিকে সূর্যের কিরীট বা করোনার কাছে রেডিও তরঙ্গ স্বাভাবিকভাবে পথবিচ্যুত হয়। এই নতুন সংকট এড়াতে দুটি বিভিন্ন কম্পাঙ্কের রেডিও তরঙ্গ পাঠিয়ে দুটিরই করোনার প্রতিক্রিয়াটি পরস্পরের সাপেক্ষে জেনে আইনস্টাইনের ঘোষিত ফোটন কণার বিচ্যুতি অনেক শুদ্ধভাবে মাপা হয়েছে; তাঁর তত্ত্ব খাঁটি।

আবার লাল সরণটি মাপার সময় জানা যায় এই লালের দিকে বর্ণালির সরে যাওয়া ডপলারের নিয়মেও হয়। ডপলারের নিয়ম অনুসারে প্রতিক্রিয়াটুকু বাদ দিলেও

সেই রূপময় জগৎটিকে জানতে হবে—তার রূপের গুণে মানুষকে গুণী হতে হবে—বিজ্ঞানসমাজের কাছে এটিই আইনস্টাইনের বাণী।

একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব গঠনের পঙ্গুতা দেখে এই শতকের ষাট দশকের বিজ্ঞানীরা ভেবেছিলেন, এ শুধু কাঠকুড়োনোর পালা—অলস মুহূর্তগুলো কাজ কাজ ভান দিয়ে ভরে তোলা। এলিয়টের কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে ব্রিটিশ বিজ্ঞানসমাজ সেদিন বললেন,

> Wipe your hands across your mouth and laugh.
> The worlds revolve like ancient women
> Gathering fuels in vacant lots.
>
> মুখের উপর হাত বুলিয়ে হেসে নাও।
> পোড়োজমির উপর কাঠকুড়ুনী বুড়ীগুলোর মত
> দেখ বিশ্বজগৎ ঘুরপাক খাচ্ছে!

সেদিন আইনস্টাইন বলতে পারতেন, ঠিক কথা। হতাশা মুছে হেসে উঠতে হবে বৈকি! আজকের কুড়োনো জঞ্জালগুলো আগামী দিনে যজ্ঞের সমিধ হয়ে ওঠে, উঠতে পারে। প্রয়োজন শুধু তেজের—তাকে চিনলেই পাওয়া যায় আলো, পাওয়া যাবে তাপ!

পোড়োজমিতে বুড়ীগুলো অনেক কাঠকুটরো কুড়িয়েছে। খুঁজে পেতে হবে অরণি কাঠটিকে, যে জ্বালাবে আগুন। আইনস্টাইনের খোঁজা এখনো শেষ হয়নি।

This is not the end.

This is not even the beginning of the end.

This is just the end of the beginning.—T. S. Elliot.

এখানেই শেষ নয়! এও নয় শেষের আরম্ভের পালা। এ শুধু আরম্ভটির শেষ।

এই খোঁজা, এই অন্বেষণ, এই তো বিজ্ঞান। "জ্ঞানের যে দ্বার আজো মুক্ত হয়নি, তার সামনে আবিষ্কারকের যে ভাব সেটি যেন শিশুর,—যে শিশুটি বয়স্কের কার্য-পদ্ধতি সফলভাবে রপ্ত করার চেষ্টা করে চলেছে।"—একথাও আইনস্টাইনের।

বিজ্ঞান শিশু; প্রকৃতির কার্যধারা যে বিজ্ঞানী জানতে চায় সেই বিজ্ঞানীও শিশু। আর এই শিশু বিজ্ঞান-জগতে মহামনীষী যে বিজ্ঞানী, সেই নিঃসঙ্গ শিশু ভোলানাথের নাম—এলবার্ট আইনস্টাইন।

সংযোজন

ফিরে দেখা

এলবার্ট আইনস্টাইনের বোন মাজা একটি ছোট খেরো খাতায় দাদার স্মৃতিকথা কিছু লিখে গেছেন; নাম Albert Einstein-Beifrag fur sein Lebensbild (এলবার্ট আইনস্টাইন: তার জীবন আলেখ্য) লেখাটি 1924 সালে ফ্লোরেন্সে শেষ করেন। মূল পাণ্ডুলিপি বেসো-পরিবারে আছে। এরই একটি কপি প্রিন্সটনে আছে। প্রসঙ্গত মাজার সম্পর্কে সামান্য কিছু বলা যায়। 18ই নভেম্বর 1881 সালে এই বোনের জন্ম। তাঁর আসল নাম ছিল মারিয়া। দাদা এলবার্টেরও নাম ঠাকুর্দার নামে রাখা হয়েছিল আব্রাহাম। তবে বাবা হার্মান আর মা পলিনের ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামানো ছিলনা বলেই সহজেই প্রাচীন পন্থী, ইহুদীগন্ধী নামের বদলি সাদামাটা জার্মান নামেই ছেলে মেয়েকে ডাকেন-এলবার্ট আর মাজা। 1908 সালে ডিসেম্বর মাসে বের্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Romance language magna cum-lande বিষয়ে P. H. D ডিগ্রি পান মাজা। তার পরের বছর দাদার কপালে প্রথম অনারারি ডক্টরেট ডিগ্রি জোটে—জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে; সন তারিখ জুলাই 1909 সাল। আরাউ স্কুলে যার বাড়িতে এলবার্ট ছিলেন সেই জোস্ট উইন্টেলেরের ছেলে পলকে মাজা বিয়ে করেন। পলের ভগ্নিপতি হলেন মাইকেল (অথবা মিশেল) বেসো। মাজা নিঃসন্তানান ছিলেন। স্বামীর সঙ্গে পরবর্তী কালে মতান্তর ঘটায় 1939 সালে USA-তে দাদার সঙ্গে বসবাস করতে আসেন। এখানে 1946 সালে তাঁর স্ট্রোক হবার পর বিছানায় শয্যাগতা হয়ে থাকেন। 1951 সালের জুনমাসে তিনি মারা যান। পরের বছর 1952 সালের জুলাই মাসে বেসোর বাড়িতে মারা যান পল।

মাজার কথায় জানা যায়, এলবার্টের জন্মের সময় মা খুব কষ্ট পেয়েছিলেন। কারণ এলবার্টের মাথাটা ছিল বেটপ আর বড়। আর ঠাকুমা পরিবারের নতুন মানুষটিকে কোলে নিয়ে বলেছিলেন, Viel zu dick! Viel zu dick। (কী গাবদারে বাপু; কী গোবদা!) এমনিতে দাদা বেশ ঠাণ্ডা মেজাজী। তবে ঝোঁক উঠলেই সর্বনাশ। তখন তাঁর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে উঠত, নাকের ডগা লাল থেকে সাদা হয়ে দাঁড়াত, আর হাতের কাছে যে জিনিস পেতেন তাই ছুঁড়ে মারতেন। বোন মাজাকে পর্যন্ত রেয়াৎ করতেন না।...পাঁচ বছর থেকেই মায়ের কাছে দাদার শিক্ষা। এর আগে একটি গৃহ শিক্ষিকার কাছে পড়তে শুরু করে দুম করে হঠাৎ এমনি ক্ষেপে গিয়ে শিক্ষিকাকে চেয়ার ছুঁড়ে মারেন। ভদ্রমহিলা সেই যে গেলেন, আর ফিরে এলেন

না।—তবে মায়ের কাছে ছেলের লেখাপড়া আর বেহালা শেখাটা ভালই হয়েছিল মাজাও মায়ের কাছে বাজনা শেখেন—পিআনো। দাদাও অবরেসবরে পিআনো বাজাতেন, এমনকি নিজে সুরও করতেন। তবে ঐ পর্যন্ত। বেহালাই ছিল দাদার প্রিয়।

বাবা হার্মান বাড়িতে ছেলে মেয়েকে শিলার আর হাইনের কবিতা শোনাতেন। শুনেশুনে ছেলে হাইনের কবিতার ভক্ত হয়ে ওঠে। শিলার-গ্যেটে-হাইনের রসে সংপৃক্ত হয়ে ওঠে এলবার্টের জার্মান লেখা—যার চিহ্ন ছড়িয়ে আছে।—লেখাপড়ায় দাদা বেশ ভাল ছিল। শৈশবের স্কুলে ক্লাশে প্রথম হতেন তিনি। পরে লুইটপোল্ড মিউজিয়ামে অঙ্কে আর ল্যাটিনে প্রথম বা দ্বিতীয় হওয়া ছিল তাঁর বাঁধা।—কৈশোরেই এলবার্টের সংগে তালমুদের (Talmud) আলাপ হয়—সম্ভবত 1889 সালে। এই তালমুদ USA-তে গিয়ে নাম পালটে হয়েছেন মাক্স টালমে। ইনিই আইনস্টাইনকে লেখা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সহজ কথা, বুকনেরের ফোর্স ও মেটার আর কান্টের বই, গণিতের বইয়ের খোঁজ দেন। 1932 সালে টালমে একটি স্মৃতিকথা লেখেন, নাম The Relativity Theory Simplified and the formative years of its inventor ; এখানেই তিমি জানান হালকা বই পড়তে মোটেই পছন্দ করতেন না এলবার্ট এবং সমবয়সীছেলেদের সঙ্গে ঘোরাফেরাও করতেন কম। তাঁর অন্য আকর্ষণ ছিল সঙ্গীত। বেহালায় মায়ের সঙ্গে বাজাতেন মোৎসার্ট-বিটোফেনের সোনাটা !

মাজার লেখা থেকে জানা যায়, এই সময়ে ইহুদি ধর্মপুস্তক পড়ে দাদা হঠাৎ গোঁড়া হয়ে দাঁড়ান ; এমন কি ধর্মে বারণ বলে শুয়োরের মাংস খাওয়াও ছাড়েন। এই সময়ে তিনি নাকি নিজেই ধর্ম সঙ্গীত লিখে তাতে সুর দিয়ে স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে গাইতে গাইতে আসতেন। গডের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার সমাপ্তি টালমের সঙ্গে মেশার পর ; বিজ্ঞানের সংস্পর্শে এসে এই অধ্যায়ের ইতি ঘটে। এই বয়সে হঠাৎ হঠাৎ নিজেকে সবার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে তিনি একা থাকতেন। কেন যে—তা তাঁর বাবা মা অথবা ছোট বোনের বোধগম্য ছিল না। এই একা হওয়া আলাদা হয়ে যাওয়াটা তাঁর ছেলেবেলা থেকেই সঙ্গী।

1900 সালে E T H থেকে পাশ করে বেরোন। মূল সংখ্যা ছয়ের মধ্যে তাত্ত্বিক আর পরীক্ষা ভিত্তিক ফিজিক্স এবং এস্ট্রোনমিতে পান পাঁচ, থিয়োরি অফ ফাংশনে 5.5 আর অন্যান্য ডিপ্লোমা পেপারে 4.5 ; গ্রোসমান সমেত মোট চারজন সেবার পাশ করে। মিলেভা মারিচ পাশ করতে পারে না। পরের বছর মিলেভা আবার পরীক্ষা দেন ; সেবারও অনুত্তীর্ণ তিনি।—এই মিলেভাকে এলবার্ট বিয়ে করতে চাইলে বাবা-মা আপত্তি তোলেন। মিলেভা বয়সে চার বছরের বড়, গ্রীক কেথলিক পরিবারের

সন্তান—এ সব ছাড়াও অন্য কারণ হয়তো ছিল—মাজা ঠিক জানেন না। হয়তো মা পলিনের ছেলেকে নিয়ে অন্য স্বপ্ন ছিল। সারাজীবন দুঃখ কষ্ট সহ্য করে এসেছেন এই দম্পতী। আর তখন হার্মানের ভগ্ন স্বাস্থ্য। এরপর 1902 সালে হার্টের এ্যাটাকে শয্যাশায়ী হন। বের্ন থেকে মিলানে বাবার কাছে ছেলে আসে। আর তখনো দরবার করতে থাকেন বিয়ের সম্মতি নিয়ে। শেষমেশ বাবা মত দেন। তখন হার্মানের শেষ অবস্থা প্রায়। মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে সবাইকে সরে যেতে বলেন তিনি—একাকী মৃত্যুকে বরণ করতে চান। 10ই অক্টোবর 1902 সালে হার্মানের মৃত্যু হয়।...মিস ভুকাসের লেখায় জানা যায় বাবার এই মৃত্যুর জন্য এলবার্টের মনে অপরাধ বোধ ছিল। তবু 6ই জানুয়ারী 1903 সালে মিলেভাকে বিয়ে করেন।...মাজা জানাচ্ছেন, বিয়ের দিনই দাদা ঘরের চাবি ভুলে এলেন!—1904 সালে 14ই মে প্রথম ছেলে হান্স এলবার্টের জন্ম। 1910 সালে মাজার বিয়ের বছর 28শে জুলাই তারিখে ছোট ছেলে এড়ুয়ার্ডের জন্ম। আর মাঝখানে জন্ম তাঁর সুবিখ্যাত পেপারকটি। Annlen পত্রিকায় ঐসব পেপার প্রকাশিত হবার পর দাদা এলবার্ট অনেক কিছু আশা করে বসে আছেন। তবে কোন কিছু ঘটার মত ঘটে না। হঠাৎ বার্লিন থেকে প্রফেসার প্লাঙ্ক চিঠি লিখে তাঁর তত্ত্বের কিছু ব্যাখ্যা চান। মাজা জানাচ্ছেন, সেই চিঠি পেয়ে এলবার্ট একেবারে আত্মহারা। অন্য কারো চিঠি না—স্বয়ং প্লাঙ্কের চিঠি—কম কথা! মাজা মজা করে বললেন, ইতিমধ্যে আরো চিঠি আসে,—সেখানে ঠিকানায় লেখা—প্রফেসার আইনস্টাইন, বের্ন বিশ্ববিদ্যালয়!

ছোট ছেলে এড়ুয়ার্ডকে একটু বেশি ভালবাসতেন এলবার্ট ; তাকে ডাকতেন টেডে (Tede) বা টেডেল (Tedel) বলে। আর দুই ছেলেকে বলতেন die Barchen—ছোট্ট ভালুকছানা। (অনেকটা আমাদের দেশে আদর করে হারামজাদা ডাকার মত)। এড়ুয়ার্ডের মুখশ্রী বাবার মত, সঙ্গীতের প্রতিভাও ধরা পড়ে। তবে তার মধ্যে মায়ের মত বিমর্ষতার ছাপ দেখা যায়। অনেক পরে হেলেন ডুকাসকে আইনস্টাইন বলেন, অল্পবয়সেই ছেলের মধ্যে dementea Praecox রোগের ছায়া দেখেন। অনেক চিকিৎসার পর তাকে জুরিখের মানসিক স্যানাটোরিয়ামে ভর্তি করা হয়। সেখানেই এড়ুয়ার্ড 1965 সালে মারা যায়।

বন্ধু গ্রোসমানের ক্লাশনোট পড়ে এলবার্ট E T H এর পরীক্ষায় পাশ করেন। গ্রোসমানের দ্বিতীয় উপকার—বাবাকে ধরে এলবার্টের পেটেন্ট অফিসের কাজটি জোগাড় করে দেওয়া। 1905 সালে প্রকাশিত ডক্টরেট থিসিসটি যে আইনস্টাইন গ্রোসমানকে উৎসর্গ করেন—তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আবার 1913 সালে দুজনে সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের গঠনে নামেন। রীমানীয় জ্যামিতির টেনসার

কেলকুলাসের ব্যবহারিক দিকটা গ্রোসম্যান দেখেন, আইনস্টাইন দেখেন তত্ত্বের ফিজিক্স। পরে এই পেপারে গণিতের চিন্তায় আইনস্টাইন ভুল পান। তবু সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ প্রকাশের সময় টেন্সারের চিন্তাটি টেনে এনেছিলেন বলে বন্ধুকে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেন। 1936 সালে গ্রোসম্যান মারা গেলে তাঁর বিধবা স্ত্রীকে এক সুদীর্ঘ চিঠি লেখেন আইনস্টাইন। সেখানে স্মরণ করলেন যৌবনের কলেজের দিনগুলি, রিলেটিভিটি গঠনের উত্তেজনা ভরা মুহূর্ত কটি। সবশেষে লেখেন, 'সব কিছু ছাপিয়ে একটি মধুর কথাই শুধু মনে ভেসে থাকে, সারাজীবন দুজন দুজনের বন্ধুই ছিলাম।'…1955 সালে নিজের আত্মজীবনীর খসরাটি আবার উৎসর্গ করেন গ্রোসমানকে। লেখেন, 'মার্শাল গ্রোসমানের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ইচ্ছাতেই আমার এই আত্মজীবনীর খসরা লেখার সাহস।'

1913 সালে গ্রোসমানের সহযোগিতায় লেখা পেপারটির পর বার্লিন চলে এলেন আইনস্টাইন। এখানেই মিলেভার সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদের শুরু। মিলেভা দুই ছেলে নিয়ে জুরিখে ফিরে গেলেন, চোখের জলে ভেসে স্টেশন থেকে ফিরে আসেন আইনস্টাইন। ছেলে দুটি তাঁর কাছে আর থাকছে না। 1919 সালের 14ই ফেব্রুয়ারী ডাইভোর্স হয়। সে বছর 2রা জুন এলসাকে বিয়ে করেন। বয়সে এলসাও বড়। মিলেভার জন্ম 1875 সালে, এলসার 1876 আর এলবার্টের 1879 সালে।… জীবনের শেষ সময়টুকু জুরিখে কাটালেন মিলেভা—E T H এ পড়ে ও পড়ান হান্স, আর হাসপাতালে এডুয়ার্ড। 1948 সালে মারা যান তিনি। তাঁর সম্পর্কে আইনস্টাইন এক জায়গায় লিখেছেন, 'এই সেপারেশন আর ডাইভোর্স-দুটোকেই কোনদিন সে মেনে নিতে পারে নি। গ্রীক নাটকের মিডিআর মত চিরকাল গুমড়ে গুমড়ে গেল! ছেলে দুটোকে ভালবাসতাম, তাদের কাছে টানতে চাইতাম ;—তবু তাদের মায়ের জন্য আমাদের সম্পর্কটাও বিষিয়ে গেল। বৃদ্ধ বয়সে এই ট্রাজেডির কিছুটা কাটান বুঝি ঘটেছে।'—E T H থেকে 1936 সালে হান্স Ph. D. পায় ; সেখানে কিছুদিন অধ্যাপনার পর 1947 সালে কালিফোর্নিয়ার বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং এ প্রফেসার হয়ে আসেন। তার আগে 1938 সালে বাবার কাছে ঘুরে গেছেন হান্স।

বিবাহ জীবন কি সুখের ছিল ? মিলেভার সঙ্গে তাঁর বনিবনাও হয় নি। তাঁর মাও মিলেভাকে মেনে নিতে পারেন নি। পলিনের বৈধব্য জীবনও সুখের ছিল না। স্বামীর কাছ থেকে আর্থিক সঙ্গতি কিছু পান নি। অন্যের বাড়িতে গৃহকর্ত্রীর ভূমিকা নিয়ে এই স্বাধীনচেতা মহিলাটি সময় কাটালেন। শেষ জীবনে মেয়ে মাজার কাছে থাকতে এলেন। এইখানে 1919 সালে মে মাসে আইনস্টাইন একটি খবর কাগজের

কাটিং পাঠান—সেখানে তাঁর কাজের প্রশংসা ছিল ; সঙ্গে আইনস্টাইনের নিজের হাতে লেখা মন্তব্য 'মায়ের বিশেষ গর্বে আরো সংযোজন।' এই বছরেই টেলিগ্রামে মাকে ছেলে জানায় ইংরেজরা তাঁর তত্ত্বের প্রমাণ করে গেছে।—মায়ের খুশি সেদিন অন্য এক যন্ত্রণায় চাপা পড়ে যায়—তাঁর পেটে ক্যানসার ! এলসার একান্ত অনুরোধে 1920 সালে এলবার্টের কাছে ফিরে আসেন—মা। তাঁর ছেলে, তাঁর একান্ত বিশেষ গর্ব ! এখানেই ফেব্রুয়ারী মাসে মারা যান। সামান্য সময়, দুমাসেরও কম সময়, ছেলের কাছে ছিলেন তিনি। দেখেন এলসা তাঁর ছেলের ঠিকমত দেখভাল করছে, তাঁকে আগলে সামলে রাখছে।—এলসাই পারবে।

এই আগলানো সামলানো আইনস্টাইনের পছন্দ নয়। এও যেন এক শাসন, এক খবরদারি। বিজ্ঞানী ইশিয়ারা (Ishiwara) একটি গল্প বলেছেন। আইনস্টাইনকে অনবরত পাইপ খুঁচিয়ে পরিস্কার করতে দেখে তিনি জিজ্ঞেস করেন, ধোঁয়া টানার মজার জন্য তাঁর পাইপে আসক্তি, না পাইপ ভরা আর পরিস্কার করার ব্যাপারটা ?—আইনস্টাইনের উত্তর, 'ধোঁয়া টানার জন্যই তো পাইপ, তবে ফুটো বড় বন্ধ হয়ে যায়, এটাই এক মুশকিল। জীবনটাও যেন পাইপ টানা—বিশেষ করে বিয়ের ব্যাপারটা !' 1936 সালে এলসা মারা গেলে মাক্সবোর্নকে লিখলেন, 'এখানে বেশ আছি—গুহায় ভালুকটার মত আছি আরামে। সারাজীবনের ঘটনা ভরা দিনগুলির তুলনায় অনেক স্বাচ্ছন্দ্য পাচ্ছি। ঐ ভালুকটার আরাম আরো বেড়ে গেছে যেন। কেন জান ? আমার কমরেড, যে খুব লোকজন পছন্দ করত, তার মৃত্যু হয়েছে !' আর 1955 সালে বন্ধু বেসোর মৃত্যুর পর তাঁর আত্মীয়স্বজনকে লিখলেন, 'মানুষ হিসেবে আমার কাছে তার আকর্ষণের সেরা কারণ হলো—দীর্ঘজীবন শান্তিতে স্বস্তিতে একটি মহিলার সঙ্গে সুন্দর সমঝোতায় কাটিয়ে গেলেন তিনি। হতভাগা আমি, দু'দুবার বিশ্রি ভাবে ফেল করলাম !'

অথচ সংসারী হওয়াও তাঁর কাছে কষ্টের ! ছেলে হানস 1926 সালে বাবার কলেজ ETH থেকে ডিপ্লোমা পায়। 1928 সালে ফ্রিডা ক্রেক্ট (Frida Krecht) কে বিয়ে করেন। 1930 সালে নাতি বের্নহার্ড সিজারের (Bernhard Caesar) জন্ম হয়। হানসের আরো একটি ছেলে ছিল, তবে তার অকাল মৃত্যু ঘটে। তবে আইনস্টাইনের একটি নাতনীও ছিল ;—হানস দম্পতী U S A তে এসে ইভলীন নামে একটি মেয়েকে দত্তক নেয়।—নাতি সিজারকে খুব পছন্দ করতেন আইনস্টাইন। তাকে ডাকতেন হার্ডি (Hardi) বলে। হানসরা U S A তে চলে এলে ভারি খুশি হন তিনি। তবে ছেলেকে তিনি বাগমানাতে পারেন না। 1973 সালের 27শে জুলাই দ্যা নিউ

ইয়র্ক টাইমস্ এ হানসের একটি ইন্টারভ্যু বেরোয়; তাতে তিনি বলেন, 'শেষমেশ বাবা একটাই প্রকল্প হতাশ হয়ে ছেড়েছেন—সেটি আমি। অনেক উপদেশ দিয়েছেন; পরে দেখেন আমি আরো একগুঁয়ে! অতএব আর সময় নষ্ট করতে ভরসা পান না।' —1973 সালেই বার্কলেতে হান্সের মৃত্যু হয়।

1950 সালের 14 ই মার্চ তিনি শেষ উইল লেখেন। তাঁর বন্ধু বিখ্যাত ইকনমিস্ট ডঃ অটো নাথান উইলের একজিকুটার হন। নাথান আর ডুকাস—এই দুজন তাঁর সব কাগজপত্র, চিঠি, কপিরাইট ইত্যাদির অছি হন। পরে এসব হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠান হবে—এটিই তাঁর ইচ্ছা। তাঁর নিজস্ব সব বইয়ের মালিক হন হেলেন ডুকাস, আর বেহালাটি দেন নাতি হার্ডি—সিজারকে। 1955 সালের 18ই এপ্রিল তিনি মারা যান। সে বছর বের্ন শহরে 21শে নভেম্বর তারিখে নাতি সিজারের একটি পুত্র হয়—নাম টমাস মার্টিন (Thomas Martin)। প্রপৌত্রের নামে কোথাও জার্মানত্ব নেই; ইহুদিত্বও নেই। সম্পূর্ণ মার্কিন নাম।

[উৎস: মাজ্জা, টালমে, ডুকাস, বোর্ন, পায়াস, দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস।]

(২)

ছেলে হানস E T H থেকে P h D হলেও আইনস্টাইনের পাঠ্যজীবনে E T H এর P h D ডিগ্রি দেবার যোগ্যতা ছিল না। তিনি 1905 সালে জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট হন। আর প্রথম অনারারি Ph D (honoris causa) পান জেনেভা থেকে। এছাড়া অনারারি ডক্টরেট ডিগ্রি পান জুরিখ, রোস্টক, মাদ্রিদ, ব্রাসেলস, বুয়োনেস আয়ার্স, সোর্বন, লন্ডন, অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, গ্লাসগো, লীডস, ম্যাঞ্চেস্টার, হার্ভাড, প্রিন্সটন, নিউ ইয়ক স্টেট—আলবেনি এবং য়েশিভা থেকে। আশ্চর্য যে লেইডন বা প্রাহা তাঁকে Ph D দেন নি—যদিও এদুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। এবং কোনো জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ও নয়!

1909 সালে জেনেভা থেকে আইনস্টাইনের সঙ্গে অনারারি ডক্টরেট ডিগ্রি পান বিখ্যাত রসায়নবিদ ভিলহেলম অস্টওয়াল্ড—যার কাছে 1901 সালে সহকারী পদের চাকরির জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন আইনস্টাইন। 1909 সালে রসায়নে অস্টওয়াল্ড নোবেল পুরস্কার পান। আর এই তিনিই প্রথম আইনস্টাইনের নাম নোবেল পুরস্কারের জন্য সুপারিশ করেন 1910 সালে। সে বছর প্লাঙ্ক আর পোঁআকারের নামও তালিকায় ছিল। সবচেয়ে বেশি সুপারিশ আসে পোআঁকারের নামে। পুরস্কার কমিটি তাদের রিপোর্টে পোআঁকারের কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেও বলেন, যদি কেউ এইসব তত্ত্বের সুযোগ্য বিশদ প্রায়োগিক ব্যাখ্যাদিতে পারেন তবে তাঁর কাজকে

ফিজিক্সের ডিসকভারি বা ইনভেনশন বলা যাবে।—আর প্লাঙ্ক? 1908 সালে কমিটি তার নাম সর্ববাদিসম্মত ভাবে প্রস্তাব করলেও নোবেল আকাদমি সেই আবেদন নাকচ করলেন। সেদিন কোয়াণ্টাম তত্ত্বকে বিবেচনার যোগ্য বলে মনে করা হয়নি। 1910 সালে কোয়াণ্টাম তত্ত্বের গোলমাল বিরোধ তো আরো স্পষ্ট। কাজেই প্লাঙ্ক সোজাসুজি নাকচ হলেন। এই 1910 সালে রিলেটিভিটির প্রবক্তা আইনস্টাইনের পুরস্কার বিবেচনা তো দূরে অস্তু!

ফিজিক্সে নোবেল পুরস্কার বিবেচনার কার্যপ্রণালীটি বোঝা যাক! বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কারের জন্য নাম পাঠাতে জানান পাঁচ সভ্যের বিভাগীয় নোবেল কমিটি—যাদের সভ্যদের মধ্য থেকে নির্বাচিত করা হয়। কমিটি তাদের কাছে পাঠানো নাম ও বিষয়বস্তু খতিয়ে আলোচনা করে দেখেন, প্রয়োজনে নাম নির্বাচনে ভোটের সাহায্য নেন এবং তাদের অনুমোদনটি একটি রিপোর্টের আকারে লেখা হয়—যেখানে থাকে যে বিষয় বা কাজের জন্য অনুমোদন তার সংক্ষিপ্ত পরিচিত ও তাঁদের অনুমোদনের যথার্থ্যের ব্যাখ্যা। এই অনুমোদনটি নিয়ে আকাদমির ফিজিক্স বিভাগে বা Klass এ আলোচনা ও ভোটাভুটি হয়। তারপর সম্পূর্ণ আকাদমি (কেবলমাত্র ফিজিক্স বিভাগ নয়)। পুরস্কারের জন্য বিজ্ঞানীকে নির্বাচিত করেন। এই সম্পূর্ণ আকাদমি কিন্তু কমিটির অনুমোদন মেনে নিতে বাধ্য নয়—যেমনটি 1908 সালে প্লাঙ্কের নির্বাচনের নাকচে ঘটতে দেখা যায়।

1910 থেকে 1922 সাল পর্যন্ত আইনস্টাইনের নাম প্রতিবছর প্রস্তাবিত হয়েছে—বাদ 1911 ও 1915 সাল। কখনো গাণিতিক অথবা কখনো তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যা শাখায়—সেখানে উল্লেখিত হয়েছে তাঁর সাংখ্যায়নিক কাজ, স্পেসিফিক হীটতত্ত্ব, কোয়াণ্টামতত্ত্ব এবং রিলেটিভিটি। 1919 সালে আলোর বাঁকের প্রমাণের পর বিজ্ঞান সমাজ হইচই করেন, তাঁর নাম বিপুল সংখ্যায় কমিটিতে যায়। এবং যায় ব্রাউনিয়ান মোশনের উপর তাঁর কাজ। কমিটির সভ্য আরেনিয়াস (Arrhenius) যে রিপোর্ট তৈরি করেন তাতে বলা হয় তাঁর এই সাংখ্যায়নিক কাজটি রিলেটিভিটি বা কোয়াণ্টাম ফিজিক্সের তুলনায় খাটো। মনে করা হয়, 'তাঁর অন্যান্য দুর্ধর্ষ মৌলিক কাজের পরিবর্তে যদি স্ট্যাটিসটিকেল ফিজিক্সে আইনস্টাইন নোবেল পুরস্কার পান তবে সেটি বুদ্ধি জগতে আশ্চর্য বলে মনে হবে।' অন্যদিকে রিলেটিভিটির প্রমাণের জন্য কমিটি রেডশিফটের পরীক্ষাভিত্তিক তথ্যের জন্য অপেক্ষা করতে চান। কমিটির রিপোর্ট মোতাবেক আকাদমি আইনস্টাইন সম্পর্কে আরো কিছু সময় নিলেন। 1920 সালে বিজ্ঞান সমাজ কমিটিকে জানায় রেডশিফটের প্রমাণ অত তাড়াতাড়ি পাওয়া যাবে না—এ বড় সূক্ষ্ম পরীক্ষা। অন্যদিকে নিজেকে প্রথম সারির বিজ্ঞানীদের মধ্যে অন্যতম

আর বিশিষ্টতম স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন আইনস্টাইন। তাঁকে নির্বাচিত না করা শুধু অশোভন নয়, অন্যায়। 1920 সালে কমিটি আবার আরেনিয়াসের কাছে রিলেটিভিটি সম্পর্কে রিপোর্ট চান। আশ্চর্য, এবার আরেনিয়াস জানান রিলেটিভিটি তত্ত্বটি সম্পূর্ণ নয়, এটি খুঁতো। অতএব সেবছরও কমেটি আইনস্থাইনের পুরস্কার প্রাপ্তির বিষয়টি ধামাচাপা দিয়ে রাখে। তাদের সময় দরকার।—1921 সালে বিজ্ঞান জগৎ আইনস্টাইনের জন্য সোচ্চার হয়। প্লাঙ্ক জানালেন, নিউটন ছাড়িয়ে প্রথম পদক্ষেপ আইনস্টাইনের। এডিংটন জানালেন, নিউটনের তুলনায় সমসাময়িকদের থেকে অনেক এগিয়ে আছেন আইনস্টাইন। আর কার্ল ওসীন (Oseen) এই প্রথমবার উল্লেখযোগ্যভাবে ফোটো ইলেকট্রিক এফেক্টটিকে পাদপ্রদীপে আনলেন। কমিটি তাদের সভ্য আলভার গুলস্ট্রান্ডকে (Allvar Gullstrand) রিলেটিভিটি ও সেই আরেনিয়াসকে ফোটো ইলেকট্রিক এফেক্ট নিয়ে রিপোর্ট দিতে বললেন। গুলস্ট্রানড্ পেশায় চিকিৎসক, চক্ষু বিশেষজ্ঞ। চক্ষু নিয়ে তার কাজ বিজ্ঞান জগতে সমাদৃত। তিনি ফিজিক্সও বোঝেন। তবে রিলেটিভিটি সম্পর্কে তার জ্ঞান মোটামুটি শূন্য; —তাঁর রিপোর্টটিও সে রকম। রিপোর্টের ভিত্তিতে রিলেটিভিটিকে মোটেই বিচারযোগ্য মনে করা যায় না। অন্যদিকে আরেনিয়াস তাঁর রিপোর্টে বললেন, মাত্র 1918 সালে মাক্স প্লাঙ্ককে কোয়ান্টাম তত্ত্বে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। অতএব ঐ বিষয়ে যদি পুরস্কার দিতে হয় তবে ফোটো ইলেকট্রিক এফেক্টের পরীক্ষক বিজ্ঞানী সম্মানিত হোক। তাত্ত্বিকরা নইলে বড় বেশি প্রশ্রয় পেয়ে যাচ্ছে!—1921 সালে পুরস্কার প্রদানে মনস্থির করতে অক্ষম হয়ে আকাদমি সে বছর ফিজিক্সে পুরস্কার দিলেন না! 1922 সাল। পদার্থ বিজ্ঞান জগৎ আইনস্টাইনের নাম একযোগে সুপারিশ করলেন। সমারফেল্ড একটি অনবদ্য চিঠিতে নোবেল কমিটিকে জানালেন কেন আইনস্টাইন পুরস্কার পাবার অধিকারী। ব্রিলোয়িন (Brillouin) লিখলেন, 'একবার ভেবে দেখুন, নোবেল পুরস্কার প্রাপকদের মধ্যে আইনস্টাইনের নাম না দেখে আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পর লোকে কি ভাববে!' প্লাঙ্ক বললেন, 1921 সালের পুরস্কার পাক আইনস্টাইন, আর 1922 সালেরটি বোর! ওসীন এবারও ফোটো ইলেকট্রিক এফেক্টের কথা তুললেন। কমিটি রিলেটিভিটির উপর গুলস্ট্রান্ডকে নতুন রিপোর্ট লিখতে বললেন, এবং ওসীমকে ফোটো ইলেকট্রিক এফেক্ট নিয়ে। গুলস্ট্রান্ডের রিপোর্টে উনিশ বিশ হলো না। তবে ওসীন যিনি উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ের তাত্ত্বিক পদার্থ বিজ্ঞান শাখার অধ্যাপক—তিনি 1905 সাল থেকে 1909 সাল পর্যন্ত আলোক কোয়ান্টা নিয়ে আইনস্টাইনের কাজের একটি অসাধারণ ও অনবদ্য আলোচনা করলেন। কমিটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে 1921 সালের ফিজিক্সের পুরস্কারের

জন্য আকাদমির কাছে আইনস্টাইনের নাম প্রস্তাব করে পাঠান। আকাদমি সম্মতি দেন !—আর 1922 সালের পুরস্কারটি পান নিয়েল বোর ! কোয়ান্টাম ফিজিক্সে পুরস্কারের ধারাটি তত্ত্বের ক্রমানুসারে ঘটে—প্লাঙ্ক-আইনস্টাইন-বোর ! আব্রাহাম পায়াসের (Abraham Pais) মতে কট্টর কনজারভেটিভ নোবেল পুরস্কার কমিটি শেষমেশ যে কাজের জন্য আইনস্টাইনকে স্বীকৃতি দিলেন, সেটি বিজ্ঞানের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী কাজ ;—ইতিহাসের মজা এইখানেই !

নোবেল পুরস্কারের জন্য আইনস্টাইন পদার্থবিজ্ঞানীদের নাম পেশ করেছিলেন। প্রথম 1918 সালে—তিনি প্লাঙ্কের নাম পাঠান; সে বছর প্লাঙ্ক নোবেল পুরস্কার বিজয়ী হন। 1923 সালে তিনি একগুচ্ছ বিজ্ঞানীদের নাম পাঠান—যাদের মধ্যে তাত্ত্বিক ও পরীক্ষক বিজ্ঞানী দুদলই ছিল। এদের মধ্য থেকে ফ্রাংক ও হের্ৎস 1925 সালে পুরস্কার পান—এরা পরীক্ষক বিজ্ঞানী। 1927 সালে তিনি আবার কম্পটনের নাম পাঠান। সেবছর কম্পটন পুরস্কার পান। 1928 সালে তিনি তিন দফা নাম পাঠান। তাতে ক্রমানুসারে থাকে দ্যব্রলী-ডেভিসন-গারমারের নাম—এরা একযোগে পুরস্কার পাবার যোগ্য। তারপর হাইসেনবার্গ ও শ্রোয়েডিঙ্গার। তাঁর মতে দ্যব্রলীর দাবী আগে। অন্য একটি মতে তিনি বলেন একটি বছরের প্রাইজ পাক দ্যব্রলী ও শ্রোয়েডিঙ্গার অন্য বছরেরটি হাইসেনবার্গ-বোর্ন ও জোর্ডান। তবে তাঁর মতে শ্রোয়েডিঙ্গারের আগে হাইসেনবার্গের প্রাইজ পাওয়া উচিত। মজার ব্যাপার হলো এই সময়ে ডিরাকের কাজ প্রকাশিত হলেও, আইনস্টাইন তাঁর নাম উল্লেখ করলেন না। 1931 সালে আইনস্টাইন আবার শ্রোয়েডিঙ্গার ও হাইসেনবার্গের নাম জানালেন। একই প্রস্তাব দিলেন 1932 সালে। এবারও ডিরাক এলেন না। যাহোক 1933 সালের ঘোষণা মোতাবেক 1932 সালের প্রাইজ পান হাইসেনবার্গ আর 1933 সালে যুগ্মবিজয়ী হন শ্রোয়েডিঙ্গার ও ডিরাক। দ্যব্রলী এর আগে 1929 সালে পুরস্কার পেয়েছেন। এই প্রস্তাব থেকে বোঝা যায় 1928 সালের মধ্যেই আইনস্টাইন জানতেন কোয়াণ্টাম মেকানিক্স টি'কে থাকবে। তাঁর পছন্দসই চেহারার না হলেও সে অনেক কাজের। অতএব যারা তার জন্মদাতা তাঁদের এড়িয়ে থাকা যায় না !—1940 সালে তিনি অটোস্টের্ন ও রাবির নাম প্রস্তাব করেন। স্টের্নের নাম 1923 সালের লিস্টে ছিল। 1943 সালে পুরস্কার পান স্টের্ন আর 1944 সালে রাবি। 1945 সালে আইনস্টাইন নোবেল পুরস্কার কমিটিকে একটি টেলিগ্রাম পাঠিয়ে উলফগাঙ পাউলির নাম প্রস্তাব করে পাঠান। বয়ানে লেখা থাকে পাউলির এক্সক্লুসন প্রিন্সিপল তত্ত্ব অন্যান্য সিদ্ধান্ত বা axiom-কে বাদ দিয়েও কোয়ান্টাম তত্ত্বে একটি মূল অংশ বলে বিবেচিত হবে। এটি একটি স্বরাজ্যে-সম্রাট তত্ত্ব ! 1945 সালের পুরস্কার পান

পাউলি। 1954 সালে বর্ন ফন লাউএর প্রস্তাব সমর্থন করে বোথে (Bothe)-কে পুরস্কারের যোগ্য বলে জানান। সেবছর বোথে ও মাক্সবোর্ন যুগ্ম পুরস্কার বিজয়ী হন। বোর্নের পুরস্কার প্রাপ্তিতে আইনস্টাইন অনাবিল আনন্দ প্রকাশ করেন। অথচ 1928 সালের পর তিনি বোর্নের নাম আর উল্লেখ করেন নি। এও এক আশ্চর্য !

ফিজিক্স ছাড়া তিনি নোবেল কমিটির কাছে শান্তির জন্য নাম পাঠিয়েছিলেন। 1921 সালে প্রস্তাব করেন চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রেসিডেন্ট মাসারিকের নাম। 1925 সালে ব্রাজিলের মানবতাবাদী জেনারেল রোনডোন (Rondon) '32 সালে ইংরেজ শান্তিবাদী হার্বার্ট ব্রাউন, '35 সালে নির্ভিক সাংবাদিক ফন ওসিয়েৎস্কি, '47 সনে সুইডিশ ডিপ্লোমেট ওয়ালেনবার্গ, '51 সালে জার্মান মিলিটারিত্ব বিরোধী ভিলহেল্ম ফোস্টার—এরা হলেন আইনস্টাইনের নির্বাচিত শান্তিবাদী। তাছাড়া 1954 সালে তিনি একটি প্রতিষ্ঠানের নাম পাঠান—ইয়ুথ আলিজা (Alijah) যা U. N. হাই-কমিশনার (রিফিউজি) বিভাগের সদস্য। আইনস্টাইনের প্রস্তাব নিয়ে খুব একটা বিবেচনা হয়েছিল বলে শোনা যায় না। শুধু 1935, '47 ও '54 সালের কটি ছাড়া। '54 সালে U.N. হাইকমিশনার ফর রিফিউজির অফিস শান্তির পুরস্কার পান।

'35 সালে যে ওসিয়েৎস্কির নাম প্রস্তাব করেছিলেন, তিনি সেই সময় হিটলারের কনসেনট্রেশন ক্যামপে বন্দী। '36 সনে তিনি দুরারোগ্য যক্ষ্মা রোগের শিকার হওয়ায় তাঁকে জেল হাসপাতালে পাঠানো হয়। সে বছর তিনি শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কারটি পান। তবে ইতিমধ্যে হিটলারের আদেশ অনুযায়ী কোনো জার্মানকে নোবেল পুরস্কার গ্রহণ করতে দেওয়া হবে না বলে জারি হওয়ায় ওসিয়েৎস্কি নোবেল প্রাইজ হাতে পান না। 1938 সালে জেল হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। প্রসঙ্গত, হিটলারের ঐ আদেশের জন্য অটোহান ও সেই সময় নোবেল প্রাইজ গ্রহণ করতে পারেন নি !

1947 সালে আইনস্টাইন রাউল ওয়ালেনবার্গের নাম সুপারিশ করেন। এই সুইডিশ ডিপ্লোমেটটি হিটলারের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বুদাপেস্তের মানুষজনকে সুইডিশ লিগেশনে আশ্রয় দিয়েছিলেন। হিটলার তাঁকে ধরতে পারেননি, মারতেও পারেননি। 1945 সালে ওয়ালেনবার্গ সোভিয়েট আর্মির হাতে ধরা পড়েন, আর তারপর বেমালুম বেপাত্তা হয়ে যান। শোনা যায়, '46-'47 সালে মস্কোর লুবিয়াঙ্কা জেলখানায় 151 নম্বর সেলে তখনো তিনি জীবিত ছিলেন। '47 সালে আইনস্টাইন স্ট্যালিনকে চিঠিতে লেখেন, 'বৃদ্ধ ইহুদি এই আমি আপনাকে অনুরোধ করি, এঁকে খুঁজে তাঁর দেশে পাঠিয়ে দিন। নিজের জীবন বিপন্ন করে হাজার হাজার ইহুদিদের উদ্ধার করেছিলেন ইনি—আপনি তো তা' জানেন।' স্ট্যালিনের উত্তর জনৈক

জারাপ্‌কিন (Tsarapkin) মারফৎ আসে—ওয়ালেনবার্গের খোঁজ পাওয়া যায়নি। প্রসঙ্গত স্ট্যালিনকে লেখা এই একটি চিঠিরই খোঁজ পাওয়া যায়!

1928 সালে নোবেল পুরস্কারের জন্য ফ্রয়েডের নাম প্রস্তাব করার জন্য আইন-স্টাইনের কাছে অনুরোধ আসে। সেই সময়ে দুজনে 'কেন যুদ্ধ' বইটি লিখছেন। ফ্রয়েডকে বিচার করতে নিজেকে অসমর্থ বলে আইনস্টাইন জানান। হয়তো তাঁর বিষয়টি চিকিৎসাবিজ্ঞান (মেডিসিন) বিভাগের বিচার্য হতে পারে—তবে সে বিচারে আইন-স্টাইন অক্ষম। ফ্রয়েডের পেশা বা প্রফেসন সম্পর্কে তাঁর কোনো ধারণা নেই। তাছাড়া তাঁর তত্ত্বের সত্যতা একমাত্র সুদক্ষ প্রফেসনালরাই জানাতে পারেন।—আইনস্টাইন অপারগ।

সাহিত্য নোবেল পুরস্কারের জন্য হার্মান ব্রোখের নাম প্রস্তাব করার জন্য আইনস্টাইন 1951 সালে অনুরুদ্ধ হন। আইনস্টাইন তাঁকে চিনতেন। তাঁর বই Death of Virgil পড়েছিলেন, তাঁর ভালও লেগেছিল। তবু তিনি জানান, আধুনিক সাহিত্য বিচার করার মত অন্তর্দৃষ্টি তাঁর নেই। ব্রোখ তিনি পড়েছেন, তবে অংশত। তাঁকে পুরস্কৃত করলে অবিচার হবে না। তবে সেই সুপারিশ করার অধিকার তাঁর নেই বলেই ধারণা।

নোবেল পুরস্কার সুপারিশে আইনস্টাইন মুক্তমন। কোয়ান্টাম মেকানিকসের আবিষ্কর্তাদের নাম জানাতে তাঁর দ্বিধা নেই। অন্যদিকে শান্তির পুরস্কারে তাঁর ব্যক্তিগত টান প্রতিষ্ঠানের চেয়ে ব্যক্তির প্রতি। এ যেন তাঁর নিজের আয়নায় দেখা! আবার নিজের অধিকারে সচেতন বলে ফ্রয়েড অথবা ব্রোখের নামের প্রস্তাব করতে অস্বীকৃতি জানান। তবু ডিরাকের নাম প্রস্তাব না করাটা রহস্যজনক মনে হয়। এটি কি ভুল?

(উৎস : নোবেল আর্কাইভস, রয়েল সুইডিস একাডেমি অফ সায়েন্স, ডুকাস, পায়াস)

(৩)

ক্লাশ পড়ানোতে আইনস্টাইনের মোটেই সুনাম ছিল না, তাঁর কাছ থেকে কোনো ছাত্র Ph D ডিগ্রি পান নি। তবে আলোচনা সভায়, সেমিনারে আইনস্টাইন সার্থক-নামা। যে কোনো বয়সের বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আলোচনায় নামতেন, তাঁদের বক্তব্য খুঁটিয়ে জানতে চাইতেন, নিজের বক্তব্যও জানাতে চাইতেন। অনেক বিজ্ঞানী সহকারী হিসেবে তাঁর সঙ্গে কাজ করে গেছেন; প্রশংসনীয় তাঁদের গণিত জ্ঞান। তবু অঙ্কের জটিলতা দেখে কোনো কোনো সহকারী কাজে ইস্তফা দিয়েছেন; কেউ বা কাজের একঘেয়েমিতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে গবেষণা ছেড়ে শিক্ষকতায় ফিরে যান। অনেকে কী কাজ যে হচ্ছে তার খেই ধরতে পারতেন না। ফ্রাউলিন নোইথার এ সম্পর্কে তাঁর একটি অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। গোটেনগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনস্টাইনের জন্য তাঁরা

জটিল গণিতের সমস্যার সমাধানে নেমেছেন। তবে সেই সমাধান, নোইথার বললেন, 'কি কাজে যে লাগবে আমরা কেউ তা জানতাম না।'—নোইথারের মৃত্যুর পর আইনস্টাইন একটি মর্মস্পর্শী লেখা লেখেন। বলেন, আজকের সর্বশ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞদের ধারণায় মহিলাদের ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষার প্রচলনের পর নোইথার একটি বিস্ময়কর গণিত প্রতিভা।' —এ লেখা লেখেন জার্মান ভাষায়। বস্তুত আইনস্টাইনের জার্মান লেখা এক কথায় অনবদ্য। তাঁর লেখার সংক্ষিপ্ততা, সরসতা ছাপিয়ে ধরা পড়ে, সারল্য আর সূক্ষ্মতা, অর্থময়তা ও নুয়ানসেস্ (Nuances)। অনেকে মনে করেন তাঁর লেখা অনুবাদে পানসে হয়ে দাঁড়ায়। ঠিক এই কারণে শিল্প্ (Schilpp) আত্মজীবনীর খসরাটি সম্পাদনার কালে মূল জার্মান লেখা আর তার ইংরিজি অনুবাদটি পাশাপাশি রেখে গেছেন। তাঁর আর একটি বিশেষত্ব হলো কোনো একজনের সম্পর্কে লেখার সময় সেই লোকটির মৌলিক বিশেষত্বটুকু তিনি সহজেই চিনতে পারতেন, চেনাতেও পারতেন। অথচ কথাবার্তায়, আলোচনার কালে তিনি যে লোকচরিত্র অভিজ্ঞ—এ রকম ধারণার উলটোটাই মনে হয়েছে। স্যুয়াৎর্সচিল্ড, মাদামকুরি, লরেন্স, প্লাঙ্ক ইত্যাদি গুণীজনের বিষয়ে লেখাগুলি যেন বলিষ্ঠ তুলির সামান্য কয়েকটি টানে আঁকা পোর্ট্রেট। এ জাতীয় লেখার সবচেয়ে আশ্চর্যটি হলো বন্ধু এরেনফেস্টকে নিয়ে স্মৃতি কথাটি। মনে হয়, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রভাবতী সম্ভাষণ লেখাটির মত এ রচনারও অনুবাদ অসম্ভব!—মাঝে মাঝে চটজলদি ছড়া লিখতেন। তার কটিতো বেশ উৎকৃষ্ট। তবে এগুলি সব শরতের শিউলি।—রুজভেল্টকে লেখা ডগারেলটি এখনো সংগৃহীত হয় নি। তবে আরো একটি ছড়ার খোঁজ পাওয়া গেছে। আইনস্টাইনের জনৈক সহকর্মী ও সহকারী রুডলফ গোল্ডস্মিড্ট্ (Goldschmidt) পেশায় ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। এরা দুজন কোনো কোনো যন্ত্রের পেটেন্টও নিয়েছিলেন। আইনস্টাইনের একজন পরিচিতা সঙ্গীত শিল্পী হঠাৎ কানে কম শুনতে আরম্ভ করলে, আইনস্টাইন গোল্ডস্মিডকে একটা হিয়ারিং এড তৈরি করতে অনুরোধ করে একটি ছড়া পাঠান। সেই ছড়াটি হলো ঃ—

Ein biszchen Technik dann Und wann	একটু আধটু কারিগরিকাজ অবরসবরে এলেবেলে,—
Auch Grubler amusieren Kann,	চিন্তাবিদরা খুঁজে পায় তাতে মজার রুটিন।
Drum Kuhnlich denk ich Schon So weit	ঠ্যাঁটা আমি, তাই ভাবছি দূরে দৃষ্টি ফেলে—
Wirlegen nochein Ei zu Zueit.	আমরা দুজনা গড়ব কিছু ভাল তো একদিন!

সঙ্গীত তিনি ভালবাসতেন। তবু U S A তে থেকেও বিংশ শতাব্দীর কম্পোজারদের খুব পছন্দ করলেন না। এমন কি উনিশ শতকের কম্পোজারদেরও নয়। শুবার্ট তাঁর প্রিয় ছিল। অথচ কঠিন কঠোর ছকে বাঁধা প্রায় গাণিতিক সুষমায় ভেজানো বিটোফেনের ভক্ত নন। মিস ডুকাসের মতে তিনি ব্রাম্‌স্‌ বা হ্বাগনার খুব একটা পছন্দ করতেন না। তাঁর বেহালার সুরে ধরা পড়তো মোৎসার্ট, বাখ, ভিভাল্ডি যারা—ক্লাসিকেল-রোমান্টিক! আবার মার্গট আইনস্টাইনের কথায় জানতে পারি চিত্র-জগতে ওল্ড মাস্টারসরা তাঁর প্রিয় ছিল, তাদের তিনি বুঝতেন। অন্যদিকে কিউবিজম্‌ এবস্ট্রাক্‌ট্‌ পেন্টিং-এজাতীয় শিল্পকলা তাঁর কাছে অর্থবহ ছিলনা। তবে হঠাৎ হঠাৎ পিকাসোর খুব পুরনোদিনের ছবি চেয়ে চেয়ে দেখতেন। স্পেনিশ চিত্রকর গিয়েটোর (Giotto) ভক্ত ছিলেন। আর রেমব্রাঁ (Rembrandt)—এখানে তিনি উচ্ছ্বসিত। জার্মান কবিতা তিনি ভালবাসতেন—প্রিয় ছিল গ্যেটে, শিলার, হাইনে—যে ভালবাসাটুকু তাঁর বাবার কাছ থেকে প্রাপ্তি!

লোকে যে তাঁর নাম ব্যবহার করতেন, তিনি জানতেন। অত্যন্ত অপছন্দসই ব্যাপার। তবু সহ্য করে গেছেন। একান্তে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন; গজগজ করতেন। আব্রাহাম পায়াস একটি ঘটনার কথা বলেছেন। খবর কাগজ মারফৎ জানা প্রফেসার x নাকি আইনস্টাইনের মহাকর্ষ ক্ষেত্র গণিতের সমস্যার সমাধান করেছেন। আইনস্টাইন পায়াসকে বললেন, 'Dcr mann est ein Narr—লোকটা মুখ্যু! তাঁর মতে x মানুষটি অঙ্ক কষতে পারে, ভাবতে পারেনা। যাহোক পরে x এর সঙ্গে মোলাকাত ঘটলে আইনস্টাইন তাঁকে বলে তাঁর কাজের সমাধান গুলি খুবই কাজের হবে—যদি ঠিক হয়। আইনস্টাইনের সঙ্গে x এর আলোচনাটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়; তাতে কিন্তু 'যদি ঠিক হয়' কথাকটি থাকেনা। আইনস্টাইন চটে যান। তিনি আর x এর সঙ্গে সম্পর্ক রাখবেন না। পরে অবশ্য আইনস্টাইন বলেন, হয় তো উৎসাহে x কথাকটি অন্যকাউকে জানিয়েছে; তারা হয়তো তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম বাড়াতে ঐ ভাবে ছাপিয়েছে!—পায়াসের এই গল্প অন্য একদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে—গণিত সম্পর্কে আইনস্টাইনের ধারণা। গণিত তার কাছে ফল ফলাবার যন্ত্র নয়—গণিত ফল ফলাবার ইচ্ছা আর সুষমা। গণিত চিন্তার ভাষা!

(উৎস : ডুকাস, মার্গট, শিল্প্‌, পায়াস)

(৪)

আইনস্টাইনের সব তত্ত্ব গণিত নির্ভর। তবু গণিতের সীমাবদ্ধতার কথা তিনি জানতেন। মরিস সোলোভন (Solovine) কে একটি চিঠিতে তিনি জানান—"ফিজিক্স মূলতঃ একটি স্বজ্ঞালব্ধ মূর্ত বিজ্ঞান; গণিত সেখানে প্রপঞ্চজগতে নিয়মের ব্যাখ্যার

নিমিত্তমাত্র।' ভাব-অনুভূতি প্রকাশের জন্য যেমন দরকার মুখের ভাষার, প্রাকৃতিক জগতের নিয়মের প্রকাশের জন্য দরকার গণিতের। তবে বিজ্ঞানের সত্য কি?— এ সম্বন্ধেও 1929 সালে একবার তিনি বললেন, 'বিজ্ঞানের সত্য বলতে যে সার্বিক অর্থে কী বোঝানো হবে তা বলা মুস্কিল। সত্য শব্দটির অর্থ টানা হয় অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যকে ধরে, গণিতের উপপত্তি বিচার করে অথবা বিজ্ঞানের তত্ত্বের সাপেক্ষে। কার্যকারণের সংজ্ঞাকে মেনে নেয় বলে বিজ্ঞানের গবেষণা মানুষকে সংস্কার মুক্ত করে তুলতে উৎসাহ জোগায়। মহৎ বিজ্ঞানের গবেষণার চিন্তার পশ্চাৎ ভূমিতে আছে এই জগৎ যুক্তি সম্মত ও বুদ্ধি গ্রাহ্য-এই ধারণা সম্পর্কে ধর্মের মত এক প্রত্যয়। এই অভিজ্ঞতা ঘেরা জগৎকে প্রকাশ করে আছে একটি অতিমানস ভাবনা—এই আমার দৃঢ়বিশ্বাস—গড বা ঈশ্বর সম্পর্কে এই আমার কল্পনা, আমার মত। সাধারণ ভাষায় এই চিন্তাকে স্পিনোজার সর্বেশ্বর বাদ বা প্যানেথিইজ্‌ম্‌ বলা যেতে পারে। সম্প্রদায়গত ঐতিহ্যকে (Denominational Tradition) আমি মনস্তত্ত্ব বা ইতিহাসের বিষয় বলে ভাবতে পারি। তাছাড়া আমার কাছে এদের কোনো মূল্য নেই।'— আইনস্টাইনের এই জাতীয় চিন্তার মধ্যে দর্শনের ছাপ সুস্পষ্ট। তিনি কি দার্শনিক? তাঁর দর্শনের জ্ঞান কতটা?

1920 সালের আগে প্রকাশিত রচনার বিষয়বস্তু ছিল বিজ্ঞান অথবা বিজ্ঞানী। নিজের তত্ত্ব অথবা অন্যের বৈজ্ঞানিক কাজ নিয়ে আলোচনা। 1920 সালের পর ইতস্তত: বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের লেখা প্রকাশ হতে থাকেন—কারণ তখন তিনি বিশ্ববিশ্রুত মানুষ একজন—শুধু বিজ্ঞানী নন। এই সময়ে তিনি দার্শনিকদের—যেমন ভিন্‌টার-নিৎস্‌ ভিনবার্গ ইত্যাদির বইয়ের সমালোচনা করেন। এইখানেই প্রকাশ পায় কান্ট সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান—যে জ্ঞানের শুরু টালমের সংস্পর্শে। 1922 সালে তিনি একদা বললেন, 'কান্টের দর্শন নিয়ে আলোচনার কালে বলা যায়, প্রত্যেক দার্শনিকেরই একটি নিজস্ব কান্ট আছে।...বিজ্ঞানের গঠনে কিছুটা আর্বিটারি বা অবাধ ধারণার প্রয়োজন। তবে এই ধারণা কতটা আপ্রায়োরি (apriori) বা বিচারবুদ্ধি মূলক কতটা আর্বিটারি অথবা বিধিবহির্ভূত—তা আমি বলতে পারিনে।' আবার গালিলিও'র লেখা ডায়ালোগের (Dialogue) এর ভূমিকা, যা তাঁর লেখা—সেখানে প্লাতো যে তিনি বেশ খুঁটিয়ে পড়েছেন তা ধরা পড়ে। দর্শনে তাঁর ইন্টারেস্ট ছিল। কৈশোর থেকে তিনি নানা সময়ে কান্ট, হিউম, মিল, স্পিনোজা পড়ে এসেছেন। তবু তাঁকে প্রচলিত অর্থে দার্শনিক বলা যায় না—যেমন তাঁর সঙ্গীতে প্রভূতজ্ঞান থাকলেও তিনি মিউজিশিয়ান বা সঙ্গীতবিদ্‌ নন। জীবনের শেষ দিকে জীবন ও দর্শন নিয়ে তিনি মনে মনে যে ভাবতেন তাঁর ইশারা শেষদিকের লেখায় ছড়িয়ে আছে। 1944 সালে বেনেদেত্তো

ক্রোচে (croce) কে লেখেন, 'অদূরভবিষ্যতে দর্শন আর যুক্তি বোধ যে মানুষের দিশারী হবে এমন ভাবনা আমার নেই। তবু যেমন চিরকাল হয়ে এসেছে, এরা হবে সামান্য কজন বাছাই মানুষের মহৎ সুন্দর এবং নিভৃত আশ্রয় (Sanctuary)'—এটিকে সার্থক ভুয়োদর্শন বলা যায়।"

1915 সালে প্রকাশিত তত্ত্বের পর বিজ্ঞান সমাজ দেখে ক্লাসিকেল নিদের্শনাময় নিরবচ্ছিন্ন বিজ্ঞান জগৎ শীর্ষ বিন্দুতে যেন পেঁছে গেছে। আইনস্টাইনের সৃষ্টি কর্মের সেটিই যেন শীর্ষবিন্দু। তার পরেও তাঁর সৃষ্টি কর্মের উচ্চাবচ রূপ ধরা পড়েছে। 1916 সালে তিনি অসুস্থ। তবু 1916-20 এই চারবছরে রিলেটিভিটি ও কোয়ান্টাম ফিজিক্সে তাঁর কাজের ধারা অক্ষুণ্ণ। 1920 সালের পর হঠাৎ যেন বিজ্ঞান থেকে তিনি মুখ ফিরিয়ে জগৎ দেখেন। আবার সত্যেন বসুর থিসিসটি পাবার পর 1924 সালে তিনি যেন তেড়ে ফুঁড়ে ওঠেন—পাওয়া যায় মনোএটমিক গ্যাসে কোয়ান্টাম তত্ত্বের প্রয়োগ। এটিই তাঁর শেষ সৃষ্টির যুগ। তারপরেও বিজ্ঞানে যত্ন আর চেষ্টা ধরা পড়েছে। তবু কোনো নতুন তত্ত্ব, নতুন চিন্তা আর পাওয়া গেলনা। 1920 সালে প্রজাপতি হয়ে তিনি বাইরে এসেছেন। আর দেখেছেন ভাইমার যুগের জার্মানিতে হানাহানি, হিটলারের আবির্ভাব, এবং নিজেকে আঘাতের টার্গেট বনে যেতে! যশোলাভের খেসারত দিতে তাঁকে জনগনেশের মানুষ হতে হয়েছে; বক্তৃতা ভাষণ দিতে হয়েছে; রাজনীতিবিদদের কাছাকাছি গেছেন তিনি। সেদিন তিনি সামাজিক মানুষ। এইদিকে তাঁর টান যতই বেড়েছে বিজ্ঞান ততই বঞ্চিত হয়েছে। তবু, সৃষ্টির একটি কাল থাকে। মনে হয় 1904 থেকে 1924—এই কুড়ি বছরই তাঁর বিজ্ঞান সৃষ্টির কাল। তারপরও বিজ্ঞান ছিল—তবে তখন তিনি বন্ধ্যা।

1924 সালে তাঁর আবেগ-আসক্তিরও যেন শেষ। কার্স্টেন (Kirsten) ও ট্রেডার (Treder)-এর লেখা এলবার্ট আইনস্টাইন ইন বার্লিন নামে 1937 সালে প্রকাশিত বইটিতে প্রুসিয়ার সায়েন্স আকাদমিতে রাখা নানা পুস্তক-পত্রিকার বক্তব্য মন্তব্যসহ প্রকাশ করা হয়েছে। আব্রাহাম পায়াস এরই অনেক তথ্য মিস ডুকাসের সঙ্গে আলোচনা করে তাঁর বইটিতে (Subtle is the Lord) জানিয়েছেন। বার্লিনে মিলেভার সঙ্গে আইনস্টাইনের বিচ্ছেদ—আর এলসার সঙ্গে বিবাহ—1913 থেকে 1920 সাল। এরই মাঝখানে একটি অল্পবয়সী মহিলার সঙ্গে তাঁর হার্দিক অনুভূতির আসক্তি, আকর্ষণ ও অনুরক্তি গড়ে ওঠে। চিঠির মাধ্যমে মহিলাটিকে আইনস্টাইন তাঁর অন্তরের আবেগ জানিয়েছেন। আবার এই মহিলাটিকে নিয়ে লেনার্ডের দল মুখরোচক গল্পও তৈরি করেছিলেন। বিবাহে-সংসারের বন্ধনে, যে আবেগ বা অনুভূতি মিলেভা বা এলসার কাছে তিনি প্রকাশ করতে পারেন নি—এই মহিলাটির কাছে তা

উদ্ধার করতে পেরেছিলেন। ইনিই তাঁর অন্য এক বেসো ! 1924 সালে এই সম্পর্কের শেষ হয়। মহিলাটিকে শেষ চিঠিতে লেখেন,—সংসার যা তাঁকে দিতে পারেনি, দূরের নক্ষত্রলোকে তাই তিনি খুঁজবেন। -তিনি ধীরে ধীরে নিরাবেগ, নিরাসক্ত হয়ে দাঁড়ালেন। বিজ্ঞানের মূল প্রবাহ থেকে সরে দাঁড়িয়ে খুঁজে চললেন একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব ! অন্যদিকে তাঁর এই শেষ চিঠিটি লেখার কয়েক মাস পরে নতুন দিনের বিজ্ঞানীরা খুঁজে আনলেন কোয়াণ্টাম মেকানিক্স। তিনি সেই পথ থেকে অনেক দূরে তখন সরে এসেছেন ! তিনি নিশ্চিতকে জানতে চেয়েছিলেন—নির্দিষ্টকে আবেগভরে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। কার্যকারণ সম্পর্কবোধে তাঁর যে আসক্তি—সেটিই তাঁর নিজের হাতে গড়া কোয়াণ্টামতত্ত্বে অবিশ্বাস জুগিয়ে গেল। 1928 সালে বন্ধু এরনফেস্টকে লিখলেন, 'এজগতে যা কিছু ঘটছে তা সবই যে সম্ভাবনার শর্তে নিহিত সেই বিশ্বাস আমার ক্রমশঃ দ্রুত কমে যাচ্ছে। বর্তমানের হইচই কর্মব্যস্ততাকে এড়িয়ে যে পথ, সে পথে আমার অবশেষ শক্তিটুকু নিয়ে যাব—এটিই আমার সংকল্প।'—

1924 সালের পর তাঁর অন্য এক জন্ম। নিয়মের নির্দেশনা খোঁজার পথিক তিনি। অথচ এরনফেস্টের সঙ্গে আলোচনার সময় তিনি জানেন, এজগতে বিরোধ আছে বৈপরীত্য আছে। এজগৎ কখনো আহুর মাজদা, কখনো বা আহুর আহুজার তাঁবে থাকে। ভালোমন্দ মিলিয়ে জগৎ—সে জগৎ প্রাকৃতিক বা মানবিক হোক। তবু তিনি বৌদ্ধ দর্শনের গোঁড়া সমর্থকের মত জগৎকে ভাল আর মন্দ দুটি নির্দিষ্ট ভাগে ভাগ করে চিনতে চাইলেন। মাক্স বোর্নকে লিখলেন, 'তোমার বোধহয় পাশা খেলোয়ার গডে বিশ্বাস। আর আমার বিশ্বাস বাস্তব বস্তুভরা অস্তিত্বময় নিয়মের রাজত্বে গড়া বিশ্ব জগতে—সেই নিয়ম বোঝার জন্য আমি বড় বাজির ফাটকা খেলছি।' একা একা সেই খেলা ! মরিস সলোভিনকে লিখলেন, 'তুমি হয়তো ভাবছ, সারা জীবনের কাজের হিসেবটা বেশ শান্তমনে খুশিতে বসে কষছি। তবু কাছ থেকে এ দেখা কত যে আলাদা। আমি যাতে প্রত্যয়ী—তাদের কোনো একটাও যে টিঁকে থাকবে এমন মনে হয় না। আমি যে সঠিক পথে যেতে পেরেছি—সেখানেও আমার সংশয়।···আমি সঠিক হতে চাইনি···শুধু জানতে চেয়েছিলাম আমি কি ঠিক !'

এই সংশয় তাঁকে দর্শনের ছাত্র করে তুলেছে। আর আশ্চর্য, জীবনের শেষ পর্বে তিনি দেখেন তিনি কর্তৃত্বের অধিকারী হয়ে দাঁড়িয়েছেন—সেই তিনি যিনি কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে জেহাদ তুলেছিলেন। 'কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে আমার ঘৃণা প্রকাশের শাস্তি হিসেবে আমার নিয়তি আমাকেই যেন শেষ কর্তৃত্বের অধিকারী করে তুললো।'—এটাই বুঝি ট্রাজেডি। আবার এও যে মজার !

(উৎস : মরিস সোলোভিন, মাক্সবোর্ণ, ডুকাস, পায়াস, আইনস্টাইন ইন বার্লিন, হফমান, তাতিয়ানা এরনফেস্ট)

(৫)

1939 সালের পর কাগজপত্র ঘেঁটে মিস ডুকাস কিছু কিছু নতুন তথ্য জানিয়েছেন। আবার অন্যরাও তথ্য সংগ্রহ করেছেন। প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গবেষণার জন্য আব্রাহাম পায়াসকে সাহায্য করা হয়েছে। এদেরই সাহায্যে প্রচলিত ও প্রকাশিত তথ্যগুলির পুনর্বিচার করা চলে। যেমন জার্মানি থেকে আইনস্টাইনের মালপত্র, কাগজবই, ফার্নিচার ইত্যাদি আমেরিকায় আসা। না—এখানে হিটলারের কোনো হাত নেই। 1932 সালের 10ই ডিসেম্বর আইনস্টাইনরা ক্যালিফোর্নিয়ায় রওনা হন—সঙ্গে কমসম তিরিশটি মোট। তার আগে কাপুথকে, জার্মানিকে বিদায় জানিয়ে এসেছেন। জার্মানির সঙ্গে এই তাঁর সম্পর্কচ্ছেদ। 30শে জানুয়ারী 1933 সালে হিটলার ক্ষমতায় এলেন ; আর তারপরই তাঁর কাপুথ বাড়ি সার্চের নামে তছনছ করা হলো। 1933 সালের মার্চ মাসের শেষাশেষি ইউরোপে ফিরে এসে ব্রাসেলস-জুরিখ-অক্সফোর্ড-গ্লাসগো ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচার দিয়ে ঘুরে তিনি বেড়াচ্ছেন। বিভিন্ন রাষ্ট্র এসময়ে তাঁকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ারে নিয়োগ করতে চাইছে। ইতিমধ্যে ইনি কিন্তু ঠিক করে ফেলেছেন U S A-তে যবেন। এলসার বড় মেয়ের স্বামী রুডলফ কাইজার, যিনি আন্তন রীমার ছদ্মনামে আইন-স্টাইনের জীবনী লিখেছিলেন, তিনি চুপিসারে বার্লিনে তাঁর কাগজ পত্র সামলান আর ফরাসী দূতাবাসের সাহায্যে পাচার করেন। তাঁর ফার্নিচার আর অন্যান্য মালপত্রও জাহাজে তোলা হয়। নানা পথ ঘুরে সবকিছু প্রিন্সটনে জমা হয়। হিটলারকে লুকিয়ে, নাৎসিদের টের না পাইয়ে রীমার আর তাঁর বিদেশী বন্ধুরা সব কিছু করেন।

আইনস্টাইনের শেষদিন সম্পর্কেও বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। 1934 সালের শেষাশেষি ডাক্তার ডলফ নিসেন (Nissen) তাঁর হৃৎপিণ্ডে অস্ত্রোপচার করেন। ভাবা হয় তাঁর যন্ত্রণার বুঝি উপশম ঘটবে। দেড় বছরের মধ্যেই জানা যায় অপারেশনে সুবিধে হয় নি। মিস ডুকাস জানতেন, ডিমোক্লিসের খাঁড়া মাথার উপরে ঝুলছে—যে কোনো সময়েই পড়তে পারে। আইনস্টাইনও জানতেন। শান্ত হাসিতে প্রতীক্ষাকে মেনে নিয়েছিলেন তিনি। সেই প্রতীক্ষার শেষ এল 13ই এপ্রিল বুধবার 1955 সাল। হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যান। তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডীন (Dean) কে খবর দেওয়া হয়। প্রিন্সটন-নিউইয়র্ক থেকে আসেন বড়বড় সার্জেন-স্পেশালিস্টরা। তাঁদের মতামত নাকচ করে আইনস্টাইন স্পষ্ট জানান তিনি অপারেশন চান না। শুক্রবারে তাঁকে প্রিন্সটন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সন্ধ্যের সময় ছেলে হানসকে ট্রাঙ্ককলে

খবর দেওয়া হলো। পরদিন বিকেলে হানস আসে। শনি আর রবি-এ দুদিন ছেলের সঙ্গে গল্প গুজব করলেন। শনিবার দিন চশমা চাইলেন, রবিবার দিন কিছু লেখা-লেখি করলেন। সন্ধ্যেয় শান্ত হয়ে ঘুমুলেন। নাইট নার্স আলবার্ট রোজেল (Rozsel) তাঁকে শেষ জীবিত দেখে। রাত্রি 1.10 মিনিটে হঠাৎ শ্বাস কষ্ট শুরু হয়। রোজেল অন্য আরেকটি নার্সের সহায়তায় তাঁর মাথাটি উঁচু করে দেন। অন্য নার্স চলে যায়। তারপর আইনস্টাইন বিড় বিড় করে জার্মান ভাষায় কি যেন বলেন। দুটি দীর্ঘনিঃশ্বাস—তারপর নিঃশেষ হয়ে যান। তখন 18ই এপ্রিল 1-15 মিনিট।—লোকে এই খবর জানে সকাল আটটায়। সকালেই অটোপ্সি হয়;—ব্যবচ্ছেদ কারণ ডাঃ টমাস হার্ভে (Harvey)-যিনি হাসপাতালের প্যাথলজিস্ট। জানা যায় মৃত্যুর কারণ ধমনীর ত্বক ফেটে যাওয়া। সকলে প্রেস কনফারেন্সে আইনস্টাইনের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডাঃ ডীন সর্বকিছু জানান—সেখানে উপস্থিত ছিলেন প্রিন্সটন এডভান্স স্টাডিইনস্টিটুটের হার্মান ভিল (Weyl)। পরদিন দ্য নিউইয়র্ক টাইমসে ডাঃ ডীনের লেখা একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়—সেখানে আইনস্টাইনের শেষ সময় ও শেষ কাজের বর্ণনা থাকে। 18ই এপ্রিল দুপুর দুটোর সময় শবদেহ প্রিন্সটনের Mather Funeral Home এ শেষ সম্মান জানানোর জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। নব্বুই মিনিট পর ট্রেনটন (Trenton) ক্রিমেটোরিয়ামে স্থানান্তরিত করা হয়। আইনস্টাইন চেয়েছিলেন অনাড়ম্বর নিভৃত অনুষ্ঠানহীন শেষকৃত্য। চেয়েছিলেন তাঁর মৃতদেহ যেন পুড়িয়ে, অবশেষ ছাই অজানা জায়গায় যেন ছড়িয়ে দেওয়া হয়। তিনি চাননি কোনো স্মৃতি সৌধ তাঁর দেহের চিহ্ন নিয়ে গড়ে উঠুক। এই তাঁর উইলে ছিল।—তাই হয়। ক্রিমেটোরিয়ামে তাঁর একান্ত প্রিয় আত্মীয়স্বজন মাত্র বারোজন হাজির ছিলেন। এঁদেরই একজন পাঠ করেন গ্যেটের Epilog zu Scheller's Glocke ; তারপর মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলা হয়। তখন অপরাহ্ণ চারটে। সংগৃহীত ছাইনিয়ে হেলিকপ্টারে হাডসন নদী ধরে উড়েযান তাঁর উইলের একজিকুটার ডাঃ অটোনাথান ও প্রিন্সটনের পল ওপেনহাইম (Oppenheim)। অন্য সকলে মাথানত করে ফিরে আসেন—অজানা জায়গায় ছাই ছড়িয়ে দেবার ইচ্ছা যে আইনস্টাইনের !

1955 সালের প্রেস কনফারেন্সে ডাঃ ডীন কী ঘটেছিল এবং কী ঘটতে চলেছে তার একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন—যার প্রমাণ আছে নিউ ইয়র্ক টাইমসের পাতায়। তাঁর মস্তিষ্ক যে সরিয়ে রাখা হয়েছিল সে ঘোষণা সেদিন কেউ করেন নি। আইনস্টা-ইনের শতবর্ষ পূর্তীকালে তাঁর ব্রেন নিয়ে কথা শোনা যায়। রোনাল্ড ক্লার্কের লেখা আইনস্টাইনের জীবনীতে জানানো হয়, তাঁর অবশেষে দেহ পুড়িয়ে ফেলা হলেও, তাঁর

মস্তিষ্ক, তাঁরই ইচ্ছানুসারে গবেষণার জন্য সরিয়ে রাখা হয়েছে। 1955 সালে Harper's পত্রিকার সম্পাদক মাইকেল আরন (Aron) ব্রেনের মেকানিজম্ নিয়ে একটি প্রবন্ধে লেখেন—সেখানে তিনি প্রশ্ন তোলেন—আইনস্টাইনের ব্রেন কোথায় আছে ? ব্রেনের খোঁজ পাওয়া যায় না—শুধু আরন জানান অটোপসি কালে ডাঃ হার্ভে ব্রেনটি সরিয়ে রেখেছিলেন। দুবছর চলে যায়। হঠাৎ সায়েন্স (Science) পত্রিকার 1958 এর আগস্ট সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশ হয়। নিউজার্সি মান্থলি পত্রিকা—যার সম্পাদক সেই সময়ে ছিলেন সেই মাইকেল আরন—তাঁরই আদেশে পত্রিকার রিপোর্টার স্টিভেন লেভি (Steven Lavy) আইনস্টাইনের ব্রেনের তালাশ করতে গিয়ে খোঁজ পান এই ব্রেনের অংশবিশেষ একটি বোতলে রাখা আছে। বোতলটি একটি কার্ডবোর্ড বাক্সে বন্ধ করা! বাক্সের গায়ে লেবেল সাঁটা COSTA CIER; গোটা বাক্সটি একটি বিয়ার কুলারে ঠাণ্ডায় রাখা। বাক্সটি আছে কানসাসের উইচিটা (Wichita) শহরের একটি অফিসে যার মালিক সেই ডাঃ টমাস হার্ভে। লেভি জানান, ডাঃ হার্ভে ব্রেনের অধিকাংশ অংশই বিভিন্ন বিশেষকদের কাছে পরীক্ষা নিরীক্ষা অথবা স্টাডির জন্য পাঠিয়েছিলেন। তাঁরা পরীক্ষায় কী যে পেয়েছেন সে বিষয়ে কোনো কিছু প্রকাশ হয়নি। কোনো স্টাডি রিপোর্ট পাওয়া যায়নি। তবে ডাঃ হার্ভে মনে করেন আর বছর খানেকের মধ্যে তিনি রিপোর্ট প্রকাশ করতে পারবেন। সায়েন্স পত্রিকায় প্রকাশিত এই প্রবন্ধটি নিয়ে সেদিন খুব একটা হইচই হয়নি। এককথায় লেভির বক্তব্যটি আইনস্টাইন এস্টেদের কাছে কোনো পাত্তা পায়না!

তারপর আরো তিনবছর কেটে গেল। ডাঃ হার্ভের কাছ থেকে কোনো রিপোর্ট পাওয়া গেল না। ইতিমধ্যে মার্ক ওলশাকর (Olshaker) একটি পপুলার সায়েন্স ফিকশন লিখেন—নাম আইনস্টাইনের ব্রেন।—উপন্যাস পাওয়া যায়;—পাওয়া যায়না যে মানুষটি আধুনিক বিজ্ঞানের ভিতটি গড়ে তুললেন, তাঁর ব্রেনের খবর! ইতিমধ্যে 1951 সালের সায়েন্স পত্রিকার জুলাই সংখ্যায় নিকোলাস ওয়েড (wade) একটি ছোট নিবন্ধ লেখেন। জানা যায়, ডাঃ হার্ভে কানসাস ছেড়ে মিসৌরির ওয়েস্টানে (Weston) চলে এসেছেন; সঙ্গে বুঝি সেই বোতল;—তবে এখন কোনো লেবেল সাঁটা নেই। ডাঃ হার্ভে এখনো জানেন না কবে রিপোর্ট প্রকাশিত হতে পারবে। তাঁর কাছে ব্রেনের যে অংশ আছে তা প্রায় অপরিবর্তিত আকারেই আছে; তবে কোথায় তা রাখা আছে সে কথা জানাত তিনি অস্বীকার করেন। এবং তিনি জানান, আইনস্টাইন এস্টেটের তাঁর কাছে রাখা ব্রেন সম্পর্কে কোনো আগ্রহই নেই!—নিকোলাস ওয়েড তাঁর নিবন্ধে আইনস্টাইনের ব্রেনের অডিসির বর্ণনা দিলেন। জানা গেল, তাঁর শেষ কটি কথার মত, আইনস্টাইনের ব্রেনের অর্থও বোধগম্য নয় এবং। আইনস্টাইনের

মতই তাঁর ব্রেন ঠিকানা হারা! ওয়েড শুধু বললেন, এই ব্রেন বুঝিবা আছে মিসৌরির ওয়েস্টনে।

এই সময়ে কটি প্রশ্ন তোলা হয়।—তাঁর ব্রেনকে বিজ্ঞানের পরীক্ষায় ব্যবহার করার জন্য সরিয়ে রাখা হবে একথা আইনস্টাইন কোথায় জানিয়েছেন?—তাঁর উইলে তো একথা নেই। শোনা যায়, কথাপ্রসঙ্গে বিখ্যাত গণিতবিদ ফ্রিডরিখ গাউসের (Gauss) ব্রেন নিয়ে আলোচনা হয়। আইনস্টাইন শোনেন, মৃত্যুর পর গাউসের ইচ্ছামত তাঁর ব্রেন নিয়ে পরীক্ষা করেন ডাঃ রুডলফ ভ্যাগনার (Wagner); আর জানা যায় ওজনে, আকারে, প্যাটার্নে গাউসের ব্রেন আর একটি সাধারণ দিনমজুরের ব্রেনে কোনো তফাৎ নেই। শোনা যায় এই গল্প শুনে আইনস্টাইন তাঁর ব্রেনটি নিয়েও গবেষণার কথা বলেছিলেন। এই গল্পটি তাঁর কাছে মজার লেগেছিল; তাই সেই সময়ে ও পরবর্তীকালে হেসে তাঁর ব্রেন নিয়ে গবেষণার কথা বলতেন। তাঁর ব্রেনও যে দিনমজুরের ব্রেনেরই মতন—সেটাই তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল। এই গবেষণা করার কথা—এ শুধু তো কথার কথা—এতো তাঁর ইচ্ছে নয়। রোনাল্ড ক্লার্ক জীবনীতে লিখেছেন, গবেষণার কাজের জন্য তাঁর ব্রেন ব্যবহার হোক—এ নিয়ে পিড়াপিড়ি (insisted) করেছিলেন—সে কথার প্রমাণ কোথায়? যে মানুষটি অনাড়ম্বর শেষ অনুষ্ঠান চাইলেন, নিজের ব্রেন নিয়ে তাঁর কি এত দম্ভ ছিল? বরং উইলে লেখা আছে দেহ পুড়িয়ে ছাই করে সে ছাই অজানা জায়গায় ছড়িয়ে যেন দেওয়া হয়। তিনি কোনো স্মৃতি সৌধও চান নি। ডাঃ হার্ভেকে ব্রেন সরাবার অনুমতি কে দিয়েছিল? তাছাড়া ডাঃ ডীনের রিপোর্টে অটোপসির কথা আছে, ব্রেন সরাবার উল্লেখ নেই। এবং আইনস্টাইনের ব্রেন সম্পর্কে তাঁর এস্টেটর কেন এত অনীহা? ডাঃ হার্ভের কাছে যে ব্রেন আছে বলে জানানো হচ্ছে—সেটি কি সত্যিই আইনস্টাইনের ব্রেন?

এইসব প্রশ্নের যিনি উত্তর দিতে পারতেন সেই মিস হেলেন ডুকাস 10ই ফেব্রুয়ারী 1958 সালে মারা যান। ইতিমধ্যে প্রশ্নকটির নীরব তিরস্কারে সন্ত্রস্ত হয়ে U S A অথরিটির কোনো কোনো মুখপাত্র জানান, আইনস্টাইনের ব্রেন সম্পর্কে তাঁরা কিছু জানেন না। যদি এটি থেকে থাকে, তবে এটিযে আইনস্টাইনের ব্রেন সে প্রমাণের দায়িত্ব যারা দাবী করছেন তাদের। যারা জানাচ্ছেন এটি আছে—তবে সেই অস্তিত্বটি তাঁর শেষ ইচ্ছার অসম্মান—এটি একটি গর্হিত অপরাধ। এই অপরাধ প্রমাণিত হলে উপযুক্ত প্রতিবিধান করা হবে।—1952 থেকে 1958; ডাঃ হার্ভে কোনো রিপোর্ট প্রকাশ করেন নি; ব্রেন সম্পর্কে কোনো প্রবন্ধ বা গবেষণা আর কোনো সাংবাদিক সায়েন্স বা অন্য কোনো পত্রিকায় মুদ্রিত করেন নি। তবে 1952 সালে প্রকাশিত

আব্রাহাম পায়াসের প্রিন্সটন রিসার্চ স্কলারের কাজটি Subtle is the lord নামে বই আকারে প্রকাশ পেয়েছে। তারই শেষ অংশে The Final decade অধ্যায়ে ছোট করে ফুটনোটে বলা আছে, অটোপসিকালে ডাঃ হার্ভে ব্রেনটি সরিয়েছেন—তার অংশ বিশেষ আছে মিসৌরির ওয়েস্টনে।

পায়াস 1946 সাল থেকে 1954 সাল পর্যন্ত আইনস্টাইনের সংস্পর্শে এসেছিলেন; তাঁর বইয়ের কোনো জায়গায় ব্রেনটিকে সরিয়ে রাখার ইচ্ছার কথা আইনস্টাইনের মুখে দেওয়া হয়নি। পায়াসের সঙ্গে আইনস্টাইনের শেষ সাক্ষাৎ ঘটে 1954 সালের ডিসেম্বর মাসে যার বর্ণনা তাঁর বইটিতে আছে। আইনস্টাইন শেষ উইল লেখেন 1950 সালে। পরবর্তীকালে উইলে কোনো সংযোজন করেন নি। পায়াসের ফুট-নোটের উৎস সায়েন্স পত্রিকায় নিকোলাস ওয়েডের নিবন্ধ—যার উল্লেখ তিনি রেফারেন্সে জানিয়েছেন। তাঁর বইটি লেখার সময় পায়াস সবসময় মিস ডুকাসের সঙ্গে সংযোগ রেখেছিলেন—একথা তিনি মুখবন্ধে জানিয়েছেন। এমন কি মিস ডুকাসের মৃত্যু হওয়ায় এই মুখবন্ধটুকুও অসমাপ্ত অবস্থায় যে তিনি রেখে যাচ্ছেন—তাও জানিয়েছেন। আইনস্টাইনের ব্রেন নিয়ে মিস ডুকাসের সঙ্গে তিনি যে কোনো আলোচনা করেননি তা বোঝা যায়, জানাও যায়।—তবে Science Digest জুলাই '৮৫ সংখ্যায় জানানো হলো যে ক্যালিফোর্নিয়া বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউরো এনাটমির অধ্যাপক M. Diamond তিন বছরের চেষ্টায় ডাঃ হার্ভের কাছে রাখা ব্রেনের তিনি কুচি '৮৪ সালে পেয়ে পরীক্ষা করে দেখেন এই ব্রেনের Neuron-এর সাপেক্ষে Glialcell-এর সংখ্যা সাধারণ গড়ের চেয়ে অনেক বেশি। ব্রেনের ঘটনা কি সত্যি? এটি কি গল্প? অথবা হঠকারী কাজের জন্য এখন মুখ ফিরিয়ে থাকা?—ব্রেন যদি সত্যি সরিয়ে রাখা হয়ে থাকে—তবে?

এই শতকে যে দুজন মানুষ আমাদের জ্ঞান ও রুচির উন্নতি ঘটিয়ে গেলেন, মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হলেন, তাঁরা দুজনই উনিশ শতকের সন্তান; একজন রবীন্দ্রনাথ, অন্যজন আইনস্টাইন। আমাদের ঝুলি ভরিয়ে গেলেন তাঁরা। আর আমরা তাঁদের মৃত্যুর পর তাঁদের শবদেহের অসম্মান করেছি; রবীন্দ্রনাথের দাড়ি কেশ ছিঁড়ে নিয়েছি, আইনস্টাইনের মস্তিষ্ক! এই ঘটনা মানুষের অকৃতজ্ঞতার চিহ্ন; ক্ষুদ্রতা আর আত্মম্ভরিতার নিদর্শন। সময়ের পরমত্বকে, প্রবলমহিমাকে খাটো করে আইনস্টাইন তাঁর তত্ত্বে আনলেন দেশকাল। এই দেশকালের পটভূমিতে এতবছর পথ-পরিক্রমার পরেও নিজেকে সংস্কৃত, শোভন বা শালীন করতে যে পারেনি মানুষ—এই জানাটি বড়ই দুঃখের, ক্ষোভের এবং নিশ্চয় লজ্জার!

আইনস্টাইন এস্টেট এই লজ্জায় বুঝি ব্রেন নিয়ে আলোচনায় নামতে চায়নি!

(উৎস, দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস, সায়েন্স, ক্লার্ক, ডুকাস, পায়াস)

স্বীকৃতি

—ঃ-ঃ-ঃ—

এলবার্ট আইনস্টাইনের উপর লেখার ইচ্ছা অনেক দিনের ; দীর্ঘকাল এই আকাঙ্ক্ষাটিকে পুষে এসেছি। নব বিজ্ঞানের ভাগীরথীটিকে পরিচিত করতে চেয়ে উপক্রমণিকা হিসেবে আধুনিক বিজ্ঞানের এনার্জি ও মোটরের উপর দুটি বই লেখা, হলো, "আলো আরও আলো" এবং "রোমাঞ্চকর রসায়ন।" বই দুটিতে আইনস্টাইন ও সমকালীন বিজ্ঞানী-দের হাতে গড়া পদার্থ ও রসায়নবিদ্যার তাত্ত্বিক দিকের কয়েকটি ধরা হয়েছিল। বিজ্ঞানী আইনস্টাইন এই বই দুটিতে এলেও, পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ্য হননি। এই মহামনীষীর জন্মশতবার্ষিকীতে গঙ্গা জলে গঙ্গা পুজো করতে পেরে আমি কৃতার্থ।

এই বইটির বিভিন্ন উপকরণের জন্য বিবিধ পত্র-পত্রিকা-পুস্তকের সাহায্যে নেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে বিশিষ্ট ও বিশেষ ক'টির উল্লেখ করা হলো। এছাড়া, The Times, The New York Times, Span. American Journal of Physies প্রভৃতি পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত প্রবন্ধের ঋণ স্বীকার করি। জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রিন্সটনের ইনস্টিট্যুট ফর এডভানসড্ স্টাডিস যে সব পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন, সেগুলির সাহায্যে বিভিন্ন ঘটনা ও বক্তব্যের যাথার্থটি স্থির করার প্রয়াস পেয়েছি।

যাঁরা এই বইটি লিখতে প্রতি মুহূর্তে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন, তাঁদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই—তাঁদের নাম উল্লেখ বাহুল্যমাত্র কারণ তাঁরা জানেন এই বইটি তাঁদেরও রচনা—এলবার্ট আইনস্টাইন তাঁদেরও প্রিয় নাম, তাঁদেরও স্বজন। তবুও শ্রীঅধির চক্রবর্তী ও শ্রীঅশোক দাস মহাশয়ের নাম উল্লেখ না করা আমার পক্ষে অকৃতজ্ঞতার পরিচয় হবে।

তথ্য নির্ভর বিজ্ঞানের তত্ত্ব গড়ে তোলেন পথ থেকে দূরে সরে গিয়ে আইনস্টাইন বিজ্ঞানের তত্ত্বানুসন্ধানে এক নতুন ধারার প্রবর্তন করেন—গেডাঙ্কে বা চিন্তা সমীক্ষা। এই চিন্তা ভারতীয় উপনিষদ-ভাবনার কাছাকাছি—বর্তমান বিজ্ঞান এই পথ অনুসরণ করে চলেছে। এই নতুন চিন্তার কথা 'আলো আরও আলো" বইটির 'কথা শেষ'

অধ্যায়ে এবং "রোমাঞ্চকর রসায়ন" পুস্তকটির "ঝড়" পর্বে ইঙ্গিতে জানান হয়েছে। এই নতুন ধারা চিন্তা-সমীক্ষার ভগীরথ আইনস্টাইনের ভাবনায় অনুরণিত এবং বিশিষ্ট। এই পর্বটির আলোচনা আমার পরম পূজনীয় ও শ্রদ্ধেয় ডক্টর সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায় বইটির ভূমিকায় করেছেন ; বাংলা-বিজ্ঞান সমাজ এইজন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে—এই আমাদের বিশ্বাস।

১৯৫৫ সালে আইনস্টাইন সম্পর্কে লেখার জন্য যাঁর কাছে প্রতিশ্রুত হয়েছিলাম, আমার পিতৃদেবকে প্রকাশনার মুহূর্তে স্মরণ করছি।

দ্বিতীয় সংস্করণের স্বীকৃতি

এই বইটি প্রায় দু'বছর আগে নিঃশেষিত হওয়া সত্বেও অনেক তাপিদ উপেক্ষা করে এতদিনে শেষ হয়—কারণ প্রিন্সেটন থেকে অনেক নতুন তথ্যের খোঁজ। বইটির সংস্করণের জন্য যে সব পাঠক—সমালোচক প্রশ্ন তুলেছিলেন, তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। তাঁদের অনেক প্রশ্নেব জবাব 'ফিরেদেখা' নামের নতুন অধ্যায়ে দেওয়া হলো। আর কৃতজ্ঞ Amercan centre-এর শ্রীসুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ও সংবেদনশীল শ্রীমধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে।